নবকল্লোলে
শীর্ষেন্দু
৩
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

নবকল্লোল শীর্ষেন্দু ৩

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা

রূপক চট্টরাজ

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাঃ লিমিটেড

Nabokallol-e Shirshendu 3
by : Shirshendu Mukhopadhaya
(A collection of Novels & Short Stories)
Code : 53N31

ISBN. 978-81-941464-6-9

Dev sahitya Kutir (Pvt.) Ltd.
21, Jhamapukur Lane, Kolkata-700 009
www.Devsahityakutir.com
E. Mail : dev_sahitya@rediffmail.com
Tel : 2350-4294/4295/7887
Email : dev_sahitya@rediffmail.com

প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪২৮, এপ্রিল ২০২১

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ২১, ঝামাপুকুর
লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে শ্রী রাজর্ষি মজুমদার ও রূপা মজুমদার
কর্তৃক প্রকাশিত এবং বি. সি. মজুমদার কর্তৃক
এ. টি. দেব প্রাঃ লিঃ
থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ : রঞ্জন দত্ত

‘রা-স্বা’
বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

উৎসর্গ

শ্রী সুজয় দত্ত

(পুরুলিয়া)

করকমলেষু

''নবকল্লোলে শীর্ষেন্দু'' সংকলনের তৃতীয় খণ্ডটি প্রকাশিত হচ্ছে। নবকল্লোলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। নানাসময়ে বিশেষ সংখ্যায় লিখেছি। এখনও লিখি। যদিও পুরোনো মানুষেরা অনেকেই এখন নেই। তবু সম্পর্কে ভাটা পড়েনি।

এই গ্রন্থে পাঁচটি ছোটো উপন্যাস এবং পাঁচটি ছোট গল্প সংকলিত হয়েছে। এর মধ্যে 'ঈগলের চোখ' উপন্যাসটি নিয়ে একটি চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়। অন্যান্য রচনাগুলিও বিভিন্ন সংকলনে বোধহয় প্রকাশ পেয়েছে। দেব সাহিত্য কুটীর যত্ন নিয়েই বই প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থেও তার অন্যথা হয়নি। এখন পাঠকের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

সম্পাদকের নিবেদন

'...আমার মনে আছে, দেব সাহিত্য কুটীরের একটা পূজাবার্ষিকী আমাকে বোধহয় কেউ কিনে দিয়েছিলেন। কিন্তু ওই একটাই। দ্বিতীয় কোনো ওরকম মোটাসোটা বই আমার কপালে জোটেনি। সেটা বোধহয় একশোবার পড়েছিলাম।...'

পাঠক হিসাবে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেব সাহিত্য কুটীরের সেই যোগাযোগ যে স্থাপিত হল তা যে পরবর্তীকালে এমন সুবর্ণশস্যময় হয়ে উঠবে তা কে জানত! সে সম্পর্কের অন্যতর যে মাত্রা স্থাপিত হল পরবর্তীকালে, তা তিনি অর্জন করেছেন নিজ কৃতিত্বে, তাঁর প্রবল পাঠ-আগ্রহ, অধ্যবসায় এবং শিল্পীসত্তার প্রসাদে। দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশিত পূজাবার্ষিকীর পাঠক হিসাবে যে সম্পর্কের সূত্রপাত, বিশ শতকের প্রথমার্ধে, বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সেই সম্পর্ক বদলে গেল দেব সাহিত্য কুটীরের পত্রপত্রিকার নিয়মিত লেখক হিসাবে। ততদিনে কথাকার হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা অবিসংবাদী।

দেব সাহিত্য কুটীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ থেকে প্রতিমাসে প্রকাশ করে চলেছে বাংলা সাহিত্যপত্র 'নবকল্লোল'। নবকল্লোল-এর পৃষ্ঠাকে যে সকল গুণী লেখক সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের অন্যতম শিরোমণি শ্রী শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। বস্তুত তাঁর কথাসাহিত্য এই পত্রিকার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় উন্মোচন করেছেন কথাসাহিত্যে তাঁর আদিগুরু বঙ্কিমচন্দ্র। ছোটোবেলা থেকেই বড়োদের সাহিত্যে তাঁর প্রবেশ : '...তাই আমি যখন ক্লাস টু-থ্রি-তে পড়ি, তখন থেকেই বড়োদের বই পড়তে শুরু করেছিলাম। তাতে অবশ্য আমার মা-বাবা কখনও বাধা দেননি।...'

ওই প্রবেশাধিকার সূত্রেই : '...ওই সময় থেকেই আমি বঙ্কিমচন্দ্রও পড়তে শুরু করেছিলাম। সেই বঙ্কিম পড়ার নেশা থেকেই বলা যেতে পারে আমার লেখালেখির সূত্রপাত। বঙ্কিম আমার অত্যন্ত প্রিয় লেখক। তাঁর লেখা আমাকে প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। বঙ্কিমের গদ্য আমার ওপর ম্যাজিকের মতো কাজ করেছিল। বঙ্কিম আমাকে প্রায় পাগল করে দিত। ওরকম ধ্রুপদি ভাষা, সমাসবদ্ধ পদ, তৎসম শব্দের ব্যবহার আমাকে অভিভূত করেছিল। আমি যে সবটা বুঝতাম তা কিন্তু নয়। কিন্তু ভাষার ওই সমৃদ্ধি আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখত। বঙ্কিমের লেখায় একটা অসম্ভব দার্ঢ্য আছে, এক ধরনের ক্লাসিক গ্র্যাঞ্জার আছে, যেটা আমাকে ভীষণভাবে আকর্ষণ করত। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে লেখালেখির ক্ষেত্রে বঙ্কিমই আমার প্রথম গুরু।...'

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রত্যক্ষ প্রভাব নিশ্চয় তাঁর কথাকৃতিতে স্পষ্ট নয়। তাঁর মতো স্বনামখ্যাত কথাকারের সাহিত্যে তেমনটা ঘটারও কথা নয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে তিনি গ্রহণ করেছেন তাঁর সৃষ্টিচেতনার গভীরে। সেই পরিগ্রহণ নিত্য নতুন ফলনে সমৃদ্ধ করেছে তাঁর নিজের সৃষ্টিকে। ভাষার নিজস্ব কারুকৃতিতে মনোবিকাশের নানান গতিপথের অসামান্য বর্ণনে, কাহিনির বাঁকে ও রেখায় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য বাংলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে অদ্যাবধি বাংলা কথাসাহিত্যের যে সমৃদ্ধ সংসার সেখানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় অন্যতম এক কৃতী সদস্য।

নবকল্লোল পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সমস্ত রচনা খণ্ডে খণ্ডে 'নবকল্লোলে শীর্ষেন্দু' শিরোনামে গ্রন্থিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে দেব সাহিত্য কুটীর।

ইতিপূর্বে 'নবকল্লোলে শীর্ষেন্দু'-র দুটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ৫টি করে উপন্যাস ও ২০টি করে গল্প গ্রন্থিত হয়েছে। এবার, তৃতীয় খণ্ডে তাঁর ৫টি উপন্যাস ও ৫টি গল্প সংকলিত করা হল। আগের দুটি খণ্ডের তুলনায় এই খণ্ডটি কলেবরে ক্ষীণকায় হলেও সৃষ্টি সম্ভারের বৈচিত্র্যে, বৈশিষ্ট্যে এর মহার্ঘতা কোনো অংশে কম নয়। আমরা গৌরবান্বিত কথাসাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বহু গল্প-উপন্যাস খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করতে পেরে।

বিগত খণ্ড দুটির মতো বর্তমান খণ্ডটি প্রকাশে দেব সাহিত্য কুটীরের অন্যতম কর্ণধার শ্রীমতী রূপা মজুমদার তাঁর উৎসাহ-উদ্দীপনার ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রকাশনা প্রকল্পে উদ্যমী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁর সুস্বভাব অনুযায়ী। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। আর বাঙালি পাঠকের আবহমানতার প্রতি, রুচি ও বোধের প্রতি রইল আমাদের শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা।

রূপক চট্টরাজ

১লা বৈশাখ, ১৪২৮

সূচি

একটি করুণ রাগিণী

আজ পুন্নিমে নাকি রে সাজু?

পুন্নিমে! কী যে বলো মুকুন্দদা। পুন্নিমে কি রোজ রোজ হয়? আজ হচ্ছে নিকষ্যি অমাবস্যে। কষ্টিপাথরের মতো অমাবস্যে।

তাহলে চাঁদ দেখছি যে! ওই তো উঠি-উঠি করতেছে।

সাজু তার ভাঁড়ে চুমুক দিয়ে অম্লানবদনে বলল, তা পুন্নিমেও হতে পারে। অমাবস্যে-পুন্নিমে দিয়ে আমাদের হবেটা কি বলো। একটু বাদে নেশা জমলে তো সবই ভেসে যাবে। নাকি!

তা বটে। তবে পুন্নিমে-টুন্নিমে হলে একটু ভাল লাগে। চাঁদ হল ভগবানের জিনিস, বুঝলি না!

সে আমিও শুনেছি বটে। চাঁদ-সুয্যি ভগবানের জিনিস। তবে বিরিঞ্চি সাধুখাঁর নাকি একখানা চাঁদ ছিল।

বটে! সে কীরকম?

তা কে জানে। সোনারুপো দিয়েই তৈরি বোধ হয়। ফুটু মিস্তিরি নাকি অমাবস্যের রাতে মস্ত মই বেয়ে উঠে আকাশের গায়ে চাঁদটা ফিট করে দিত।

সে তো বিপদের কথা। পেরেক খুলে চাঁদখানা মাথায় এসে পড়লে কী হত?

ফুটু মিস্তিরি কি আর যে-সে। তার হাতে টাইট-করা স্ক্রু খোলে কার সাধ্যি! স্ক্রু এমন টাইট দিত ফুটু মিস্তিরি, ইহজন্মে যা আর খোলার নয়।

পাঁচ নম্বর ভাঁড় চলছে। দু' পাঁইট ফাঁকা। দুজনেরই বেশ নেশা হয়েছে। তবে কিনা তারা পুরনো নেশাখোর। মাতাল হলেও বেহেড নয়। দুজনের হাতেই গুরুতর কাজ। ঠাকুরমশাই নবাবগঞ্জে গেছেন, ফিরতে রাত হবে। ঘরে যুবতী বউ। তারা বাইরে বসে ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ি পাহারা দিচ্ছে।

মুকুন্দ পাঁচ নম্বর ভাঁড় শেষ করে বলল, চ, একটা পাক মেরে দেখি।

চলো।

দুজনেই বাড়ির চারদিকটা টলমল পায়ে পাক মেরে দেখে এল। না, কোথাও কোনও বিপদের সম্ভাবনা নেই। চোর-ডাকাত-গুন্ডা-বদমাশ কারও ছায়াও দেখা যাচ্ছে না। বামনী বোধহয় ঘুমোচ্ছে। তা ঘুমোক।

দুজনে বসে ছ' নম্বর ভাঁড় মুখে তুলল।

সাজু, কত রাত হল রে?

বেশি হবে না। একটু আগেই চাঁদ উঠল যে।

সে তো দু’ নম্বর ভাঁড়ের সময়। তখন অ্যাত্ত বড় ছিল। এখন দেখ, কেমন ছোট্টোটি হয়ে গেছে। রাত হয়েছে রে।

হতে দাও না। রাত আর কতই বা লম্বা হবে! বেশি লম্বা হতে গেলে ফস করে ভোর এসে ভো-কাট্টা করে দেবে রাতকে।

তা বটে। সব ঠিকঠাক আছে তো! চারদিকে নজর রাখছিস?

হ্যাঁ হ্যাঁ। সব ঠিক আছে। তুমি আর আমি দুজনে আছি, কে ঘেঁষবে এদিকে? এ তল্লাটে তো কারও ঘাড়ে একটার বেশি দুটো মাথা দেখিনি।

তবু ঠাকরোনকে ডেকে একটু সাড়া নে।

তুমিও যেমন। ঠাকরোন হল সাঁঝ-ঘুমুনি। ঘুমিয়ে কাদা হয়ে আছে।

এদিকটায় গরিব লোকেদের বাস। গাঁয়ের প্রান্তে, একটেরে জায়গা। সামনে একটা ফুটবল খেলার মাঠ আছে। মাঠের ধার ঘেঁষে কাঁচা রাস্তা। তার পাশেই ঠাকুরমশাইয়ের তিন কাঠা জমিতে দুখানা টিনের চাল আর বেড়ার ঘর। ভিটেটা ইটে বাঁধানো বটে তবে ইটের ওপর আর পলেস্তারা দেওয়ার পয়সা জোটেনি। ঠাকুরমশাইয়ের অবশ্য তাতে অসুবিধে নেই। যেমন তেমন থাকতে পারেন।

সাজু হঠাৎ নেশার মধ্যেও সিধে হয়ে বসে বলল, লোকটা কে আসছে বলো তো! হাঁটা দেখে তো চেনা লোক মনে হচ্ছে না।

মুকুন্দ খেঁটে লাঠিটা খপ করে তুলে নিয়ে বলল, খারাপ মাল মনে হচ্ছে?

আরে না। ভদ্দরলোকই। তবে চেনা নয়। কার বাড়ি যাচ্ছে বলো তো!

কে জানে! যেতে দে।

লোকটা গেল না। বরং বাড়ির সামনে এসে হাঁটায় ব্রেক কষল। ফটফটে জ্যোৎস্নায় তারা দুই মূর্তিমান সদর আগলে বসে। লোকটা তাদের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করছে।

মুকুন্দ খুব মায়াভরা গলায় বলল, কার বাড়ি খুঁজছেন?

লোকটা দ্বিধান্বিত গলায় বলল, এটা শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ি না?

নিয্যস। কোথা থেকে আগমন হচ্ছে বলুন তো!

কলকাতা থেকে। বিশেষ দরকার। উনি নেই?

মুকুন্দ থুতনিতে চার দিনের না কামানো দাড়ি চুলকে বলল, বিষয়কর্মে গেছেন। এসে পড়বেন টক করে।

লোকটা ক্লান্ত গলায় বলল, বাড়ি নেই? তাহলে তো মুশকিল। আমাকে আজ রাতের গাড়িতেই ফিরতে হবে।

সাজু বলল, শেষ গাড়ি এগারোটায়। দেরি আছে।

লোকটা ঘড়ি দেখে বলল, পৌনে আটটা বাজে। স্টেশনটাও তো মাইল খানেক দূর। কখন ফিরবেন জানেন?

সাজু মাথা নেড়ে বলে, সে কেউ জানে না।

আপনারা কারা?

এই গাঁয়েরই লোক। বসে যান এখানেই।

লোকটা অবস্থাটা চেয়ে দেখল। শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ির একটুখানি দাওয়ায় দুজন বসা। চেয়ার বা টুল পর্যন্ত নেই। কার্তিকের হিম পড়তে শুরু করেছে। গ্রামদেশ বলে বেশ ঠান্ডাও। ইটের দাওয়ায় বসাটা ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে। তাছাড়া লোক দুটোকেও তার পছন্দ হচ্ছে না। দিশি মদের উৎকট গন্ধ আর বোতল আর ভাঁড় থেকে অনুমান করতে এক লহমাও দেরি হল না যে, এরা তুরীয় মার্গে রয়েছে। শাসন ভট্টাচার্যের চেনাজানার পরিমণ্ডলটি বড়ই বিচিত্র।

লোকটা বড়ই পরিশ্রান্ত। তাই এগিয়ে এসে একটু দূরত্ব রেখে দাওয়ায় পা ঝুলিয়ে বসল।

মুকুন্দ একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। বলল, মশা আছে কিন্তু।

জানি। মাস ছয়েক আগে একবার এসেছিলাম। শাসনবাবুর স্ত্রী বাড়িতে নেই?

খুব আছেন। আপনি কি তাঁর কেউ হন?

আত্মীয় নই, তবে চেনা।

তবে উঠে ডাকুন না। ঠাকরোন বোধহয় ঘুমোচ্ছেন।

দরকারটা তাঁর সঙ্গে নয়, শাসনবাবুর সঙ্গে। ঘরে ঢোকার দরকার নেই। বাইরে থেকে কথা বলেই বিদায় নেবো।

তাহলে চেপে বসে থাকুন। ঠাকুরমশাই এসে পড়বেন। তা বাবু, কী করা হয় আপনার?

চাকরি।

মোটা মাইনের চাকরি নাকি?

না না। সামান্য চাকরি। আপনারা?

মুকুন্দ ছ' নম্বর ভাঁড় সবে মুখে তুলে বলল, গাঁয়ের লোক, চাষবাস করি আর কি। গতিক সুবিধের নয়। চাষের যা খরচা, টাকা তুলতে জিভ বেরিয়ে যায়। একটা চাকরি পেলে দিতাম সব ছেড়েছুড়ে।

সাজু আবছা গলায় বলল, নিয্যাস। গাঁয়ের লোকের বড়ই দুর্গতি। কলকাতায় দেখুন তো কচি সিম চল্লিশ টাকায় বিকোচ্ছে, এখানে ছ'টাকা। চাষ করে আর লাভ কী বলুন!

লোকটার যেন এসব কথায় গা নেই। কেমন উশখুশ ভাব। প্যান্টের পকেট থেকে এক প্যাকেট সিগারেট বের করে একটা ধরাল। কী ভেবে প্যাকেটটা তাদের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, খাবেন?

মুকুন্দ খুব লজ্জার হাসি হেসে বলল, বিড়িই চলে আমাদের। তা দেন খাই।

তিনজন সিগারেট ধরানোর পর সাজু হঠাৎ বলল, বাবু, একটা কথা।

লোকটা বলল, বলুন।

বোতলটা তুলে ধরে সাজু বলল, আপনার চলবে?

লোকটা হাসল। বলল, না। আপনারা খান।

ভাল জিনিস ছিল কিন্তু। দিশি বটে, কিন্তু দু' নম্বরি নয়।

আমি খাই না। দিশি-বিলিতি কোনওটাই না।

সাজু ভারী লাজুক গলায় বলল, আমরা সারাদিন খেটেপিটে এই সাঁঝবেলায় একটু না খেলে গায়ের ব্যথা মোটেই মরতে চায় না।

তাতে কি? খান।

মুকুন্দ চাঁদের আলোয় যতদূর দেখল, লোকটা বেশ লম্বা, ফর্সাই মনে হচ্ছে, আর রীতিমতো বাবুগোছের। প্যান্ট, শার্ট আর বুকখোলা একটা হাফ সোয়েটার থেকে আর কিছু বোঝার জো নেই।

ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে চেনাজানা আছে নাকি বাবু?

তা আছে।

কতদিনের?

বছর দুই হবে।

ঠাকুরমশাই খুব বিচক্ষণ লোক। মেলা মানুষ তার কাছে বুদ্ধি-পরামর্শ নিতে আসে।

হ্যাঁ। শাসনবাবু খুব বুদ্ধিমান মানুষ।

লোকটা ঘড়ি দেখছে।

রাত এগারোটার গাড়ি ধরবেন তো?

হ্যাঁ।

দেরি আছে।

কিন্তু উনি যদি দেরি করেন তাহলে মুশকিল হবে। কোথায় গেছেন তা কি জানেন?

আজ্ঞে না। ঠাকুরমশাইয়ের কি কাজের অভাব?

সাজু বলল, জয়নগর যাবেন বলে একবার শুনেছিলুম যেন। ঠিক জানি না।

লোকটা একটা বড় শ্বাস ছেড়ে বলল, কিছুক্ষণ বসি তাহলে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, বসুন আরাম করে।

মশা কামড়াচ্ছিল। লোকটা উশখুশ করছে, বারকয়েক নিজের গায়ে চড়চাপড় দিল কয়েকটা। পা আর হাত চুলকোল।

মুকুন্দ মোলায়েম গলায় বলল, মশা আছে কয়েকটা। আমাদের তেমন কামড়ায় না, নতুন লোক দেখে আপনার পেছুতে লেগেছে।

তাই দেখছি।

কিছুক্ষণ বাদে সয়ে যাবে, দেখবেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। মুকুন্দ আর সাজুর নেশা বেশ উঁচুতে উঠেছে। এসময়ে মুকুন্দর গান আসে আর সাজুর বুকটা হু-হু করে।

মুকুন্দ সবে গুনগুন শুরু করেছিল, সাজু হঠাৎ বলে উঠল, ওই আসছেন।

একটা সাইকেল ঘচাং করে এসে থামল সামনে। শাসন নেমে পড়ল। লোকটা ঘড়ি দেখল, নটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

সাজু আর মুকুন্দ উঠে দাঁড়াল টপ করে। গ্যালগ্যালে একটু হেসে মুকুন্দ বলল, এসে গেলেন ঠাকুরমশাই? এই যে ইনি বসে আছেন অনেকক্ষণ ধরে।

শাসন সামান্য বিস্মিত গলায় বলল, অভিসারবাবু নাকি?

আজ্ঞে।

কী আশ্চর্য! এত রাত্রে?

জরুরি কথা আছে শাসনবাবু।

বলিবেন। আগে অভ্যন্তরে চলুন।

যাবো? আপনার স্ত্রীর অসুবিধে হবে না?

না মহাশয়। আমার ব্রাহ্মণী এক লক্ষ্মী ছাড়ার সংসার করিয়া থাকে। তাহার সর্বপ্রকার অভ্যাস আছে। ওহে মুকুন্দ, ওহে সাজু, তোমরা এইক্ষণে গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পার।

পেন্নাম হই ঠাকুরমশাই। বলে দুজনে চটপট সরে পড়ল।

শাসন কড়া নাড়ল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিল তার ঘোমটা টানা বউ।

মহাশয়, কিছু আহার করিয়াছেন কি?

আমার জন্য ব্যস্ত হবেন না। আমি ভরপেট খেয়ে এসেছি। আপনি জামাকাপড় বদলে নিন তাড়াতাড়ি। আমি এগারোটার ট্রেনে ফিরে যাবো।

অদ্য প্রত্যাবর্তনের প্রয়োজন কি? আমার একটি অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ আছে। স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন।

না, উপায় নেই।

যথা আজ্ঞা। আসুন।

সামনের ঘরের আসবাবপত্র সামান্যই। একটি নীচু তক্তপোশে শতরঞ্চি বিছানো, দুটি জলচৌকি।

মহাশয়, উপবেশন করুন।

অভিসার বসল।

সাইকেলটা ভিতরের দিকে রেখে এসে মুখোমুখি শাসনও বসল। বলল, এইবার বলুন কী এত গুরুতর কারণ।

কাল বাদে পরশু আমার বিয়ে।

নাকি মহাশয়? ইহা তো জানা ছিল না।

হঠাৎ ঠিক হয়েছে। বিয়ের পরই মেয়েটি আমেরিকায় চলে যাবে। গিয়ে আমাকেও কয়েকমাস পরে নিয়ে যাবে বলে কথা।

ইহা তো অতি উত্তম প্রস্তাব মহাশয়। গুণবতী কন্যালাভ ভ্যাগ্যের কথা।

হ্যাঁ, সেই লোভেই আমার মা-বাবা বিয়ের প্রস্তাবটা লুফে নিয়েছিল। মেয়েটি যে খুব ব্রিলিয়ান্ট তা কিছু নয়। ওর এক দাদা আমেরিকার সিটিজেন, সে-ই গ্রিন কার্ড করে দিয়েছে। সায়েন্সের মোটামুটি ভাল ছাত্রী। মিনেসোটায় একটা স্কলারশিপ পেয়ে যাচ্ছে।

সকলই তো অতি শুভ সংবাদ মহাশয়। বিঘ্নটা কোথায়?

আসলে বিয়ের প্রস্তাব আসার পর আমার মা-বাবা অতি উৎসাহের চোটে বেশি খোঁজখবর নেয়নি। পাত্রীপক্ষেরও বিয়ের তাড়া আছে। আর দিন পনেরো পরই মেয়েটা আমেরিকায় চলে যাবে। তাই একটু হুড়োহুড়ি করেই বিয়েটা হচ্ছে। কিন্তু তিন দিন আগে আমার কাছে একটি চিঠি আসে। ইংরিজিতে যাকে বলে পয়জন লেটার এটা হল তাই।

তবে তো ধন্ধে পড়িয়াছেন মহাশয়।

ঠিক তাই।

পত্রটি সঙ্গে আনিয়াছেন কি?

আপনাকে দেখানোর জন্যই এনেছি। পাত্রী আপনার কাছাকাছিই থাকে। জয়নগর। আপনার পরামর্শ এখন আমার খুবই দরকার।

পরামর্শ ছাড়া মানুষকে আমার কীই বা দেওয়ার আছে! পত্রটি গোপন রাখিতে ইচ্ছা হইলে রাখিতে পারেন। মোদ্দা কথাটা মুখে বলিলেই হইবে।

না, চিঠিটা আপনি দেখুন।

হিপ পকেট থেকে একটা দোমড়ানো খাম বের করল অভিসার। শাসনের হাতে দিয়ে বলল, পড়ে দেখুন।

শাসন চিঠিটা হাতে নিয়েই খুলবার চেষ্টা করল না। চিঠিটা হাতে ধরে রেখে অভিসারের মুখের দিকে চেয়ে বলল, মহাশয়, চিঠিটা পড়িবার আগে আমার গুটিকতক প্রশ্ন আছে।

বলুন।

কন্যাটি কি সুন্দরী?

আমি তাকে চাক্ষুষ দেখিনি। মেয়ের দাদু একটু গোঁড়া প্রাচীনপন্থী। তাঁরা নাকি পাত্রকে মেয়ে দেখান না, অভিভাবকদের দেখান। তবে মেয়ের ফটো দেখেছি।

ফটো কেমন দেখিলেন?

সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে না। একটু মোটা।

আপনার পছন্দ হয় নাই?

চেহারা পছন্দ হওয়ার মতো নয়। তবে চেহারা তো বহিরঙ্গ মাত্র। মেয়ের অন্যান্য গুণ বিচার করে অপছন্দ হয়নি।

মুখশ্রী কীরূপ?

ভাল নয়। তবে হ্যাক ছিঃ বলা যাবে না।

লাবণ্যময়ী?

অভিসার একটু হাসল, আপনি যে কেন মেয়েটার চেহারা নিয়ে এত ভাবছেন বুঝতে পারছি না।

তাহার কারণ আছে। আপনার জন্মপত্রিকা আমি দেখিয়াছি। আমার বিদ্যা কহিতেছে,আপনি কুরূপা নারীকে বিবাহ করিলে অনিষ্ট হইবে।

মালিকা কুরূপা নয়, সুরূপাও নয়।
বুঝিলাম। এখন বলুন, পাত্রীর আর্থিক অবস্থা কীরূপ?
ভাল।
কতটা ভাল?
ওর বাবার বিরাট ব্যবসা।
ভাঙিয়া বলুন। কিসের ব্যবসা?
কলকব্জার পার্টস তৈরি করার কারখানা আছে। বলবিয়ারিং আর কী সব যেন। ভদ্রলোক সেই সুবাদে বছরের ছ' মাস ব্যাঙ্গালোর আর দিল্লিতে থাকেন।
তাহার অর্থ কয়েক কোটি টাকার লগ্নি।
তা হবে। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। চিঠিটা পড়ুন।
শাসন খাম খুলে চিঠি ও তৎসহ একটা জেরক্স কপি বের করে কিছুক্ষণ হ্যারিকেনের আলোয় পড়ে দেখল। জেরক্স কপিটাও উল্টে-পাল্টে দেখল। তারপর সযত্নে ভাঁজ করে খামে ভরে খামটা অভিসারের হাতে দিয়ে বলল, এই রামচরণ লোকটি কে?
মালিকার কাকা। এঁরও বড়বাজারে আড়ত আছে। মালিকার বাবার সঙ্গে খুবই রেষারেষি। মুখদর্শন অবধি নেই।
তাহা হইলে তো পত্রে যাহা বলা হইয়াছে তাহা সত্য বলিয়াই ধরিতে হয়।
সেইজন্যই আপনার কাছে আসা।
বলুন কী করিতে হইবে।
চিঠিতে লিখেছে মালিকার বছর দুই আগে একবার অ্যাবরশন হয়। ধরেই নিচ্ছি ঘটনাটা সত্যি।
ধরিতে হইবে না। রামচরণ পাকা লোক। নার্সিংহোমের এন্ট্রি এবং কেস হিস্ট্রি জেরক্স করিয়া পাঠাইয়াছেন।
তবু বলি, টাকার জোরে এসবও করা যায়। রামচরণ বিয়েটা ভণ্ডুল করতে চাইছেন।
আপনি চাইতেছেন না?
বলছি। মেয়েটা যদি একটু ভুল করেই থাকে সেটাকে বড় করে ধরে পিছিয়ে আসাটা ঠিক হবে কি? আমি উদার মনের মানুষ। এসব ব্যাপারকে মূল্য দিতে চাই না।
উত্তম প্রস্তাব। তবে অগ্রসর হউন।
চিঠিটা তো পড়লেন। রামচরণ আমাকে নিষেধ করছেন এবং নিষেধ না মানলে বাধা দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কী করা?
তিনি বাধা দিবেন, সেই বাধা আপনি নস্যাৎ করিবেন। তাহা হইলেই আর গোল থাকে না।
উনি যদি বিয়ের আসরে গোলমাল পাকান তাহলে তো লোক জানাজানি হয়ে যাবে।
লোক জানাজানিকে ভয় পাইলে আর উদারতার কী পরিচয় দিলেন! যাহা উচিত বলিয়া মনে করিবেন তাহা তো বক্ষদেশ স্ফীত করিয়াই করা উচিত।
আপনি এই বিয়ে সমর্থন করছেন কি?
অগ্রে বলুন, এই পত্রের কথা আপনার অভিভাবকেরা জানেন কি?
না। চিঠিটা অফিসের ঠিকানায় এসেছে। আমি কাউকে দেখাইনি।
আমি বলি, তাঁহাদের মতামত গ্রহণ করুন।
মা রাজি হবে না। বাবা হয়তো—
মাকে বুঝাইয়া বলুন।
মা হয়তো বুঝতে চাইবে না।

বুঝিবেন। কোটি কোটি টাকার তলায় অনেক কিছু চাপা দেওয়া যায়।

আপনি কি বলতে চান আমরা লোভে পড়ে এই বিয়েতে রাজি হয়েছি?

কথাটি কঠিন বটে, কিন্তু মনে হয় অযৌক্তিক নহে।

আপনি আমাকে কী করতে বলেন? বিয়ে ভেঙে দেবো? নিমন্ত্রণের চিঠি বিলি হয়ে গেছে, বন্ধুবান্ধবকে আমেরিকা যাওয়ার কথাও বলেছি। কেনাকাটা, কেটারারকে অর্ডার দেওয়া সব হয়ে গেছে। এখন বিয়ে ভেঙে দিলে প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকবে?

আপনি আমার নিকট কেন আসিয়াছেন তাহা এখনও কহেন নাই।

অভিসার একটু চুপ করে থেকে নিজের উত্তেজনা প্রশমনের চেষ্টা করল। তারপর মোটামুটি শান্ত গলাতেই বলল, আমি রামচরণের চিঠিটাকে বিশ্বাস করি না। আমি চাই আপনি ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

এই কথা! ছাই ফেলিতে ভগ্ন কুলা!

আমি সেইজন্য আপনার ন্যায্য পারিশ্রমিক দেবো।

শাসন হাসল, মহাশয়, আমার উঞ্ছবৃত্তি আর ঘুচিল না। দক্ষিণা পাইলে বোধহয় চণ্ডালের জুতাও বহন করি। যাহা হউক, পারিশ্রমিকটা বড় কথা নহে। আপনার সঙ্গে আমার প্রীতির সম্পর্ক। সেই কারণেই খবরাখবর আমি লইব।

দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করবেন। পরশুই বিয়ে।

মহাশয়, যদি দেখা যায় পত্রোক্ত অভিযোগ সত্য তাহা হইলে আপনি কী করিবেন?

তাহলেও বিয়েটা হবে।

তাহা হইলে সত্য জানিয়াই বা কী হইবে। আমি কহি, আপনার আর এ বিষয়ে আন্দোলন না করাই সমীচীন। বিবাহ যখন মালিকাকে করিবেনই তখন জল ঘোলা করিয়া কী হইবে?

আমি জানতে চাই।

কী কারণে মহাশয়? স্ত্রীর দুর্বলতা জানিয়া তাহাকে ব্ল্যাকমেল করিবার ইচ্ছা নাকি?

ছিঃ শাসনবাবু! আপনি আমাকে এত নীচ ভাবলেন?

না অভিসারবাবু, আপনাকে কদাপি নীচ বলিয়া মনে হয় নাই। দুর্বলচিত্ত হইতে পারেন, কিন্তু নীচ ছিলেন না। কিন্তু মনুষ্যচরিত্র অতীব দুর্জ্ঞেয়।

তার মানে?

মনুষ্য যখন প্রবৃত্তির হস্তে পতিত হয় তখন সাধুও রাক্ষসের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকে।

আমি কি সেরকমই করছি?

মহাশয়, কন্যাটি সুন্দরী নহে, তদুপরি কলঙ্কের ইতিহাস রহিয়াছে। তাহা হইলে ইহাকে বিবাহ করিবার জন্য আপনি এত উদগ্রীব কেন? ধনী শ্বশুরের ছত্রছায়ায় থাকিবেন এবং স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়া আমেরিকায় থানা গাড়িবেন এরূপ ইচ্ছাই কি বলবতী বলিয়া মনে হইতেছে না?

অভিসার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কটুকাটব্য করলেও আপনি যে আমার প্রকৃত ভাল চান তা আমি জানি। আপনি স্পষ্টবাদীও বটে। স্বীকার করছি আমেরিকায় যাওয়ার লোভ আমার অনেক দিনের। বহু চেষ্টা করেও কোনো সুযোগ হচ্ছিল না। এই সুযোগটা হাতে এসে যাওয়ায় আমার বহুকালের একটা সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

মহাশয়, আমেরিকা অত্যাশ্চর্য দেশ, শুনিয়াছি। সকলেই সেখানে যাইতে চায়। তাহাতে অস্বাভাবিক কিছু নাই। কিন্তু ইহা যে মোহ তাহা স্বীকার করিবেন কি?

না শাসনবাবু, আপনি জানেন না, আমেরিকায় গিয়ে ভাল থাকব বলে যেতে চাইছি না। আমি সেখানে হায়ার স্টাডিজ-এর জন্যই যেতে চাই। ফিরে এসে দেশেই কাজ করব।

সকলেই ওরূপ কহিয়া থাকে। কিন্তু আমেরিকা এক রূপকথার কুহক বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। যাহারা গিয়াছে তাহারা আর আইসে না।

আমার ক্ষেত্রে তা হবে না।

আপনার ক্ষেত্রে না হইলেও আপনার স্ত্রীর ক্ষেত্রে হইতে পারে। তখন কী করিবেন? স্ত্রীকে ত্যাগ করিয়া আসিবেন কি?

পরের কথা পরে। ভবিষ্যতে কী হবে তা বলতে পারি না।

মহাশয়, আপনাকে ভবিষ্যদ্বাণী করিতে হইবে না। আমি কেবল আপনার মনোভাবটি জানিতে চাই। আপনার নিজের মনকে প্রশ্ন করিয়া জানুন আপনি প্রকৃতই কী ভাবিতেছেন। কন্যাটির প্রতি আপনার দ্রব মনোভাব এবং সীমাহীন ক্ষমার প্রবণতা কতখানি সত্য তাহাও বিচার করিবেন।

আমি অনেক ভেবেই আপনার কাছে এসেছি।

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কাজ করিলে অনেক অনভিপ্রেত পরিণতি এড়াইতে পারা যায়।

বুঝেছি।

শাসন হাসল, বুঝিয়াও বুঝিতেছেন না। আমার নিকট পরামর্শ লাভের আশায় আসিয়াছিলেন বলিয়া ভূমিকা করিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে পরামর্শ গ্রহণ নহে, আপনার একটি কার্যনির্বাহের জন্যই আমাকে আপনার প্রয়োজন।

আপনি এই বিয়েতে আপত্তি করছেন, কিন্তু আমার অবস্থাটা বুঝতে চাইছেন না।

বুঝিয়াছি। একটা কথা, আপনি স্বয়ং কেন রামচরণবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেছেন না?

অসুবিধে আছে।

কিসের অসুবিধা? খুলিয়া বলুন।

রামচরণ ধূর্ত লোক বলে শুনেছি।

তাহাতে কী হইল? দুনিয়ার সকল সফল পুরুষই অল্পবিস্তর ধূর্ত। আপনার শ্বশুরমহাশয় কীরূপ মানুষ?

তা জানি না। দেখে তো ভালই মনে হয়।

অনুসন্ধান করিলে হয়তো জানিতে পারিবেন তিনিও ধূর্ত কম নহেন।

স্থানীয় লোকেরা বলে রামচরণ গুন্ডামি করতেন। তাঁর নামে বেশ কয়েকটি খুনের মামলা ছিল।

তাহা প্রচারও হইতে পারে।

হতে সবই পারে। তবু দয়া করে আমার কাজটি করে দিন। এই পাঁচশো টাকা রাখুন।

শাসন হাত বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে বলল, উঞ্ছবৃত্তিই আমার ব্যক্তিত্ব বিনাশ করিতেছে।

না শাসনবাবু, উঞ্ছবৃত্তি হবে কেন? আপনি বুদ্ধিমান লোক, বুদ্ধি ধার দিয়ে দক্ষিণা নেওয়াটা তো উঞ্ছবৃত্তি নয়।

মহাশয়, সকল অপকর্মেরই ধর্মানুগ ব্যাখ্যা আছে। টীকা ভাষ্যকাররা দিবসকে রজনী করিতে পারে।

রাত হচ্ছে শাসনবাবু। আমি আজ উঠি। খবর কিন্তু কালকেই চাই।

জানি মহাশয়। খবর কল্যই পাইবেন।

অভিসার বেরিয়ে গেলে শাসন ভ্রূ কুঁচকে ভাবতে লাগল।

।। দুই ।।

আরে! শাসনবাবু যে! কী খবর আপনার?

রামচরণের বৈঠকখানায় তেমন আধুনিক আসবাব নেই। একখানা নীচু তক্তপোশে জমিদারদের কাছারির মতো বিছানা পাতা, তাতে তাকিয়া দেওয়া আছে। সামনে কয়েকটা ভাল জাতের মোড়া। রামচরণ তক্তপোশে বসে কিছু হিসেবপত্র দেখছিল। বয়স পঞ্চাশের নীচে এবং বেশ শক্তপোক্ত মেদহীন চেহারা,

মাথায় টাক এবং মোটা কাঁচাপাকা গোঁফ আছে। চোখ দুখানা বেশ জ্বলজ্বলে, ঘন ভ্রূ, পাতলা ঠোঁট। রামচরণকে সুপুরুষ বলা যায় না, তবে চেহারায় বেশ ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

শাসন একটা মোড়ায় সন্তর্পণে বসে বলল, মহাশয়ের কুশল?

রামচরণের গোঁফের নীচে খুব মজবুত ও ঝকঝকে দাঁতের হাসি যেন বিদ্যুতের মতো খেলে গেল। হাসিটা আন্তরিক নয়, তবে আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ। রামচরণ বলল, ব্যবসা-বাণিজ্য করি, জীবনে নানা ঝুঁকি নিয়ে কাজ করি, কুশলের তোয়াক্কা করি না। ভাল থাকাই কি সব সময় ভাল?

তাহা বটে। আপনি তো ঘটনাবহুল জীবনযাপন করিতে ভালোবাসেন।

বাঃ, কথাটা বেশ বলেছেন তো! একেবারে ঠিক কথা। ঘটনাবহুল। লাগাতার ভাল থাকাটাও তো একঘেয়ে।

যথার্থই মহাশয়। অবিরল কিছুই উপভোগ্য নহে।

একজন কর্মচারী এসে নতুন কিছু খাতাপত্র রেখে গেল রামচরণের সামনে।

চা খাবেন নাকি শাসনবাবু?

না মহাশয়।

এবার বলুন আপনার জন্য কী করতে পারি।

শাসন একটু ভেবে বলল, আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতার নাম কী?

গুরুচরণ। কেন বলুন তো!

তিনি কেমন মানুষ বলিতে পারেন?

রামচরণের মুখে হঠাৎ ভ্রূকুটি দেখা দিল। অতি তীক্ষ্ণ এবং প্রায় অসহনীয় এক দীপ্ত চোখে কিছুক্ষণ শাসনের দিকে চেয়ে থেকে বলল, কেন বলুন তো!

বিশেষ প্রয়োজন। সম্ভব হইলে আমাকে তাঁহার নিকট যাইতে হইতে পারে। সেই কারণেই অগ্রে কিছু প্রস্তুতি লইতেছি।

কী কাজ?

চাকুরি প্রার্থনাও করিতে পারি।

রামচরণ হাসল, চাকরি চাওয়ার লোক আপনি নন। কারণটা বলতে চান না, এই তো!

বলিতেও পারি। তবে পরে।

রামচরণের গায়ে পুরনো আমলের বেনিয়ান, নিম্নাঙ্গে ধুতি। বাঙালিয়ানাটি বেশ জোরালো রকমের। রামচরণ সামান্য খাটো গলায় বলল, গুরুচরণ সম্পর্কে বলতে আপত্তি নেই। কারণ, তাকে অনেকেই ভালরকম চেনে। সে লোক ভাল নয় শাসনবাবু।

বটে মহাশয়?

খুবই বটে। অসম্ভব ধূর্ত, অসম্ভব নিষ্ঠুর এবং অতি মোলায়েম পাজি।

শুনিয়াছি তিনি বিস্তর টাকা করিয়াছেন।

ঠিকই শুনেছেন। টাকার পাহাড়ে বসে আছে। ম্যানুফ্যাকচারার তো। ব্যবসাটা লেগেও গেছে। তবে দাদা এমন কাজ নেই যা করতে না পারে। মুখ দেখে অবশ্য বোঝা যায় না।

শুনিয়াছি তাঁহার কন্যার বিবাহ, সত্য নাকি?

আমিও শুনেছি।

সে কি মহাশয়, আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহের কথা আপনি কি লোকমুখে শুনিয়াছেন নাকি?

তাও বলতে পারেন। তবে ডাকে একটা নেমন্তন্নের চিঠিও এসেছে। আমার ভাইঝির বিয়েতে আপনার কিছু কৌতূহল আছে দেখছি। কী ব্যাপার?

শাসন হাসল, মহাশয়, আমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর লইয়া কী করিব? তবে লোকমুখে শুনিতেছি আপনি এই বিবাহ অনুমোদন করেন না।

রামচরণ হঠাৎ তার বিদ্যুৎচমকের মতো হাসিটা হেসে বলল, না, করি না। বিয়েটা যাতে হতে না পারে সেইজন্য যথাসাধ্য চেষ্টাও করছি।

শাসন সবিস্ময়ে বলল, কেন মহাশয়?

একটা নিরপরাধ ছেলেকে একজন দুশ্চরিত্রা মেয়ের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই এই কাজ আমাকে করতে হবে। কিন্তু শাসনবাবু, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আপনি কিছু খোঁজখবর নিয়েই আমার কাছে এসেছেন। আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে কাজের কথায় আসুন।

শাসন অমায়িক হেসে পকেট থেকে চিঠিটা বের করে এগিয়ে দিয়ে বলল, আপনি বুদ্ধিমান মানুষ। অযথা কালক্ষেপ করিব না। এই পত্রটি কি মহাশয়ের লিখিত?

রামচরণ খামটা ছুঁয়েও দেখল না। একবার চেয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, হ্যাঁ, অবশ্যই। চিঠিটা কে দিল আপনাকে? ওই অভিসার ছোঁড়া নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘটনাক্রমে তাঁহার সঙ্গে বৎসর দুই হইল আমার কিছু হৃদ্যতা জন্মিয়াছে। তিনি কখনও-সখনও আমার নিকটে আইসেন।

ভাল কথা। তাকে বুঝিয়ে বলবেন এই বিয়ে আমি হতে দিচ্ছি না।

ইহার বিশেষ কোনো কারণ রহিয়াছে কি?

ক্রুর চোখে শাসনের দিকে চেয়ে রামচরণ বলল, না থাকলে নিষেধ করছি কেন?

শাসন উদাস মুখে বলল, পারিবারিক বিষয় লইয়া প্রশ্ন করিতে দ্বিধা হয়। তবে বিবাহটি সংঘটিত না হইলে অভিসারবাবুর কিছু অসুবিধা হইবার সম্ভাবনা। আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতারও বোধ করি সুবিধা হইবে না। সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ন হইবে।

তা হবে। কিন্তু বিয়েটা তো ছেলেখেলা নয়।

তাহা তো বটেই।

আমার দাদার মেয়ে মালিকা একটি ছেলের সঙ্গে অনেক দিন ধরেই মেলামেশা করে আসছে। ছেলেটি ভাল, দোষের মধ্যে গরিব। একটা মাইনর স্কুলে মাস্টারি করে। দাদা যখন জানতে পারে তখন মেয়ের ওপর শাসন তর্জন শুরু হয়। দাদাকে যারা জানে তারাই সাক্ষী দেবে, মানুষটা অত্যন্ত অহংকারী। তার অহং-এ আঘাত লাগলে ভয়ংকর হয়ে ওঠে। মালিকা এক স্কুল মাস্টারের সঙ্গে প্রেম করছে জেনে দাদা চণ্ড মূর্তি ধারণ করে।

মহাশয়, একটি প্রশ্ন। সেই মাস্টার মহাশয় কি আপনাদের সবর্ণ?

হ্যাঁ, সবর্ণ। চরিত্রবান ছেলে, দেখতেও ভাল, চমৎকার গান গায়, পরোপকার করে।

দারিদ্র্য এক অভিশাপ বিশেষ।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু মেয়ে যেখানে প্রেমে পড়েছে সেখানে তেমন অসুবিধে না থাকলে বিয়ে দেওয়াটাই তো বুদ্ধিমানের কাজ ছিল।

হাঁ মহাশয়। ইচ্ছা করিলে তিনি তো জামাতা বাবাজীবনকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার তো টাকার অভাব নাই।

না, সেটা পারত না। সুবিনয় শ্বশুরের সাহায্যে বড়লোক হওয়ার মতো মানুষ নয়। সে স্বাধীনচেতা, তেজি ছেলে। দাদা সেইজন্যই তাকে আরও বেশি সহ্য করতে পারত না। আক্রোশটা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাকে খুন করারও চেষ্টা হয়।

বলেন কী মহাশয়? এতদূর?

দাদাকে তো জানেন না। প্রেস্টিজে লাগলে কাণ্ডজ্ঞান বলে তার কিছু থাকে না।

মহাশয়, সুবিনয়বাবু কি আপনার পরিচিত?
হ্যাঁ, ছেলেটিকে আমি স্নেহ করি।
মালিকাদেবীর যে কলঙ্কের কথা আপনি পত্রে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কি এই সুবিনয়বাবুর দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছে?
সুবিনয় সেরকম ছেলেই নয়। তবে মালিকা যতটা সুবিনয়ের দিকে ঢলে পড়েছিল, সুবিনয় কিন্তু ততটা ঢলেনি। বরং মালিকাকে বিয়ে করার ব্যাপারে তার আগ্রহের অভাবই ছিল। কিন্তু মালিকা দিনের পর দিন তাকে ভালবাসা জানিয়ে গেছে। মেয়েটির এই আগ্রহ দেখে সুবিনয় অবশেষে নিমরাজি হয়।
একটি অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন। মালিকাদেবী দেখিতে কেমন?
সুন্দরীর পর্যায়ে পড়ে না। একটু মোটাসোটাও। তবে মুখে একসময়ে একটু লাবণ্য ছিল।
তাহার পর বলুন, মালিকাদেবীর কলঙ্ক কীরূপে ঘটিল?
তার জন্যও দাদার জেদই দায়ী। মেয়েটাকে ঘরবন্দি করে রেখে, মারধর করে সে এমন একটা বিশ্রী সিচুয়েশন তৈরি করল যে মালিকার মতো শান্ত মেয়েও গেল বাপের ওপর ক্ষেপে। কিন্তু প্রতিবাদ বা বিদ্রোহ করার মতো সাহস তো ছিল না। সে তাই প্রতিশোধ নিল নিজের কলঙ্ক ঘটিয়ে।
কীরূপে মহাশয়?
সেটাও জানতে চান?
বাধা থাকিলে কহিবেন না।
পারিবারিক কেচ্ছা বলতে ইচ্ছে হয় না। তবে আপনি যেহেতু কোনো একটা সমাধানসূত্র বের করতে এসেছেন বলেই আমার অনুমান, তাই বলছি। যে সময়ে ঘটনাটা ঘটে সে সময়ে মালিকাকে রাজগীরে রাখা হয়েছিল। রাজগীরে দাদার বাড়ি আছে। বেশ কড়া পাহারারও ব্যবস্থা হয়েছিল। মালিকা সেখানে একবার গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টাও করে। সেটা পারেনি শেষ অবধি। তারপর সে মরিয়া হয়ে, বাবাকে জব্দ করার জন্যই কাণ্ডটা বাধিয়ে বসে।
কাহার সঙ্গে মহাশয়?
ওখানকারই একটি ছেলের সঙ্গে। তার নাম জয়নাথ দুবে। ছেলেটিকে পরে পুলিশ অ্যারেস্টও করেছিল রেপ চার্জে। কিন্তু চার্জ টেঁকেনি। মালিকা নিজেই বলেছিল, সে-ই ছেলেটিকে অ্যালাউ করে। সে অনেক কাণ্ড মশাই। মহাভারত।
জয়নাথবাবু কীরূপ মানুষ?
কে জানে মশাই। তবে স্থানীয় লোকেরা বলে সে খারাপ ছেলে নয়।
কাহিনিটি জটিল হইতেছে কি?
না। জটিল হতো যদি জয়নাথের সঙ্গে মালিকার প্রেমটেম হত। তা তো নয়। মালিকা শুধু নিজেকে কলঙ্কিত করার জন্য তাকে ব্যবহার করেছিল।
বুঝিলাম। গুরুচরণবাবু কি সুবিনয়বাবুকে এখনও সমান অপছন্দ করিয়া থাকেন?
দাদার পছন্দ-অপছন্দ বরাবরই একপেশে। ওর বড় কথা হল, জেদ। নিজের জেদ বজায় রাখা ছাড়া ও কিছু বুঝতে চায় না।
সুবিনয়বাবুকে খুন করিবার চেষ্টা কবে হইয়াছিল?
দু'বছর তো হবেই। সুবিনয়কে যখন গুন্ডারা মারল তখনই বোধহয় মালিকা ক্ষেপে গিয়ে ওই কাণ্ড করে।
সুবিনয়বাবু এখন কীরূপ আছেন?
ভালই আছে। গুন্ডাদের হাতে তার মরারই কথা ছিল। বরাতজোরে বেঁচে গেছে।
এক্ষণে তাঁহার মনোভাব কীরূপ?
কোন মনোভাবের কথা বলছেন?

মালিকাদেবীর প্রতি।

সুবিনয় তো কোনোদিনই মালিকার প্রেমে হাবুডুবু খায়নি। তবে মনোভাব বিরূপও নয়।

মালিকাদেবীর বিবাহে তিনি আপত্তি তুলিয়াছেন কি?

না। আপত্তি আমিই তুলেছি। মেয়েটার জীবন তাতে নষ্ট হবে। পাগলামি করে নিজের অনেক ক্ষতি করেছে। এবার বোধহয় আত্মহত্যাটা বাকি।

মহাশয়, অভিসারবাবু যে মালিকাদেবীকে বিবাহ করিবার জন্য বিশেষ ব্যাকুল।

আবার সেই ছটাকে হাসি হেসে রামচরণ বলল, তাও জানি। সেই ব্যাটা টাকা আর আমেরিকা যাওয়ার লোভে পাগল হয়ে আছে।

এইবার আপনিই বলুন, আমি তাঁহাকে কী পরামর্শ দিতে পারি।

তাকে বিয়েটা ভেঙে দিতে বলুন। এই পরিস্থিতিতে সেটাই একমাত্র পথ।

মহাশয়, আমি তো সর্বত্রগামী। আমার ইচ্ছা কুশীলবদিগের সকলের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করি।

করতে পারেন। কিন্তু বিয়েটা ঘটাতে পারবেন না কিন্তু। আমি ওটা হতে দেবো না।

জিভ কেটে শাসন বলল, আমি আপনার বিরোধিতা করিতে আসি নাই। আমার প্রয়াস সমস্যার জটাজাল হইতে অভিসারবাবুকে উদ্ধার করা। তিনি আমার শরণাগত।

টাকা খেয়েছেন নাকি?

সামান্য কিছু পাইয়াছি। আমার জীবিকাই উঞ্ছবৃত্তি।

ঠিক আছে। আপনি অনুসন্ধান করুন।

মহাশয়, আপনি কি আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রীটিকে বিশেষ স্নেহ করেন?

স্নেহ তো করতাম। মেয়েটি খারাপ ছিল না। কিন্তু যে-কাণ্ডটা করল তাতে বড্ড খারাপ লাগছে। দাদার সঙ্গে শত্রুতা থাকলেও পারিবারিক স্ক্যান্ডাল তো!

আপনার মনোভাব বুঝিতেছি। আপনি আমাকে বিপক্ষের লোক ভাবিবেন না। আমি পক্ষপাতদুষ্ট নহি।

আমি আপনাকে যতদূর জানি, আপনি অকারণে আমার কাজে বাগড়া দেবেন না। তবে অভিসার ছোকরা আপনাকে টাকা দিল কেন সেটাই ভাবছি। বিয়ের জন্য বড়ই বেজাহান হয়ে পড়েছে দেখছি।

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়। তিনি আমেরিকায় গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার অভিলাষী।

অর্থাৎ পাত্রীর চেয়ে আমেরিকায় যাওয়াটা অনেক বেশি গুরুতর।

আজ্ঞা হাঁ।

এরকম ছেলেকে বিশ্বাস করা যায় না। এসব ছেলেরাই বিয়ে করে কার্যসিদ্ধির পর হয় বউকে ডিভোর্স করে, না হয় তো মেরে ফেলে।

অভিসারবাবু সম্বন্ধে আপনার মনোভাব খুবই তিক্ত দেখিতেছি।

তা তিক্ত হওয়ারই কথা। তার টাকা খেয়ে আপনি আমাকে আরও দুশ্চিন্তায় ফেললেন। আপনি ধুরন্ধর লোক, কোথা দিয়ে কী চাল দেবেন তা বোঝা দুষ্কর।

মহাশয়, আপনার এই মন্তব্য আমি প্রশংসাবাক্য হিসাবেই গ্রহণ করিলাম। ধুরন্ধর হইলেও আমি ইষ্টবিহীন নহি। ছলে বলে কৌশলে মঙ্গল সাধনই আমার লক্ষ্য। আপনি ইহার অন্যথা দেখিবেন না।

তা দেখিনি। তবে আপনার সম্পর্কে একটা দ্বিধা কাজ করেই।

মহাশয়, বিবাহ বাসর ভণ্ডুল করিবার নিমিত্ত আপনি গুন্ডা নিয়োগ করিয়াছেন কি?

রামচরণ আবার তার কঠোর হাসিটি হেসে বলল, দলের চেয়ে বলের ওপরেই আমার ভরসা বেশি। হ্যাঁ শাসনবাবু, প্রয়োজন হলে পেশিশক্তির প্রয়োগ করা হবে। শুনেছি দাদা পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছে। তাতে লাভ বিশেষ হবে না।

জানি মহাশয়। বিবাহ বাসরটি ঘিরিয়া রাখিলেও বরানুগমনের দীর্ঘ পথটি প্রহরা দিবার ব্যবস্থা সম্ভব নহে। আপনি কুশলী।

অভিসার কি খুব মরিয়া হয়ে উঠেছে?

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়।

ওরা বিয়ের আগেই সিভিল ম্যারেজ সেরে ফেলতে পারে আন্দাজ করে আমি সে ব্যবস্থাও নিয়েছি।

আপনি পাকা লোক। কী ব্যবস্থা মহাশয়?

দু'পক্ষের ওপরই নজরদারির ব্যবস্থা।

ইহা অতীব ব্যয়সাপেক্ষ ব্যবস্থা।

হ্যাঁ। নিজের নাক কেটে পরের যাত্রাভঙ্গ করার মতোই ব্যাপার। তবে আমি যা করব বলে স্থির করি তা করেই ছাড়ি।

জানি মহাশয়। আপনি আমাকে সুবিনয়বাবুর ঠিকানাটা দয়া করিয়া দিলে বাধিত হই।

আবার তাকে কেন?

বলিয়াছি তো, এই ঘটনার কুশীলবদিগকে আমি একটু দেখিতে চাই।

তা ভাল। তবে কোনো চাল চালবেন না কিন্তু।

মহাশয়, কূটনৈতিক চালে আমি আপনার সহিত আঁটিয়া উঠিব কীরূপে? আপনি বুদ্ধিতে, কর্মদক্ষতায় অধিকতর বলবান বলিয়াই অদ্য সমাজের উচ্চ পর্যায়ে সমাসীন। আর আমি নিতান্তই অকিঞ্চন।

আপনি ইচ্ছে করলে অনেক কিছু পারতেন। যাকগে, সুবিনয়ের ঠিকানা দিচ্ছি। দেখা করুন গিয়ে।

।। তিন ।।

জয়নগরে গুরুচরণের প্রকাণ্ড প্রাসাদোপম বাড়িটার সামনে গিয়ে যখন শাসন পৌঁছোল তখন সেই বাড়িকে বিয়েবাড়ি বলে মনে হচ্ছিল বটে। হ্যাঁ, জম্পেশ ব্যাপার চলছে। বাড়ির চারদিকে উঁচু দেওয়াল। তবে মস্ত লোহার ফটক খোলা। তা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, সামনের মাঠ জুড়ে পেল্লায় প্যান্ডেল তৈরি হয়ে গেছে। ঠেলাগাড়ি করে মেলা চেয়ার-টেবিল আসছে। ভিতরে মেলা লোকজন। সকলেই ভারী ব্যস্ত।

ঢুকতে কোনো বাধা নেই দেখে শাসন ভিতরের দিকে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই একটি ছোকরা কোথা থেকে তার পাশে এসে হাঁটা ধরে বলল, ভিতরে যাচ্ছেন নাকি?

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়। কেন, কোনো বাধা আছে কি?

না, বাধা কিসের? কোথা থেকে আসছেন?

নিকটেই এক গ্রামে বাস করি। কেন মহাশয়?

আপনি কি সাধু ভাষায় কথা বলছেন নাকি? ইয়ার্কি হচ্ছে?

না মহাশয়। আমার পিতামহ বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিতেন। এমনকি আমার পিতামহীর সহিতও। আমার পিতা কথঞ্চিৎ তাহা বজায় রাখিয়াছিলেন। অধুনা কেহ সংস্কৃত অনুধাবন করিতে পারে না হেতু আমি সাধু ভাষায় কথা কহি। অপরাধ নিবেন না।

বাঃ, বেশ মজা তো।

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়। অনেকেই আমার বাক্যালাপ শুনিয়া কৌতুক অনুভব করে।

আপনি কী কাজে এসেছেন?

বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নাই। আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিবাহকার্যে সাহায্য করিয়া যদি কিছু জুটে সেই আশায় আসিয়াছি।

অন্য কোনো মতলব নেই তো?

আজ্ঞা না মহাশয়।

পিছন থেকে কে যেন হাঁক দিল, কে রে সঞ্জয়?

সঞ্জয় নামে ছেলেটি পিছন দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, এ এক মজার মাল কালোদা। সাধু ভাষায় কথা বলে।

অ্যাঁ! সাধু ভাষায়? শাসন ভট্টাচার্য নয় তো!

শাসন ফিরে তাকাল। কালো নামের লোকটি বেশ লম্বা। রং কালোই। বেশ মস্তান টাইপের চেহারা। এগিয়ে এসে পা ফাঁক করে শাসনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ক্রুর চোখে তার দিকে চেয়ে বলল, এ যে বাস্তুঘুঘুটিই দেখছি!

শাসন একটু হেসে বলল, কালোবাবু, সর্বাঙ্গীণ কুশল তো!

হ্যাঁ কুশল। তা তুমি এখানে কী মনে করে ভশ্চায?

কেন মহাশয়, এইখানে কি সান্ধ্য আইন জারি হইয়াছে, নাকি আমি ব্রাত্যজন?

ওসব বোলো না ভশ্চায, আমার কাছে তো ডিকশনারি নেই যে অর্থ বুঝে নেবো। মতলবটা কী?

নিতান্তই সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার। কন্যাপক্ষের সহিত একটু বাক্যালাপ করিব।

কিসের বাক্যালাপ? মতলবটা খুলে বলো।

মহাশয়, উদ্বিগ্ন হইবেন না। আমি কোনো চক্রান্ত করিতে আসি নাই।

সেটা বুঝব কী করে? তুমি বিটলে বামুন, পেটে পেটে অনেক বুদ্ধি। তোমাকে গুরুচরণবাবু কাজে লাগায়নি তো!

না মহাশয়। তাহার সহিত পরিচয় নাই।

কিন্তু তোমাকে এখানে দেখে যে আমার সন্দেহ হচ্ছে বাপু।

মহাশয়, আপনারা কি বিবাহবাটির প্রহরায় নিযুক্ত আছেন? কিন্তু আমি তো তস্কর নহি।

তস্কর নিয়ে আমাদের দুশ্চিন্তা নেই। চোর-ডাকাত এলে আমরা বরং পথ ছেড়ে দেবো। কিন্তু অন্য মতলবে এলে মুশকিল হবে।

কিন্তু মহাশয়, এ বাটির তো অবারিত দ্বার দেখিতেছি। বিস্তর মনুষ্য গমনাগমন করিতেছে।

তা করুক না। ওরা ডেকোরেটরের লোক আর আত্মীয়স্বজন।

শাসন একটু হাসল। তারপর গলা এক পর্দা নামিয়ে বলল, আমি রামচরণবাবুর অনুমতি লইয়াই আসিয়াছি।

তাই নাকি? তিনি তোমাকে পাঠালেন কেন?

কিছু উদ্দেশ্য আছে।

কী উদ্দেশ্য?

তাহা কহিবার অনুমতি নাই। তবে আমি মালিকাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহি। একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবেন?

কালো বারকয়েক আপাদমস্তক তাকে দেখে নিয়ে বলল, বিটলে বামুন, সত্যি কথা বলছো তো!

অসত্য স্থানবিশেষে কহিতে হয়। আপৎকালীন ব্যবস্থা। মহাশয়, আমার দ্বারা আপনাদের কাজ বিঘ্নিত হইবে না।

মালিকার সঙ্গে দেখা করতে চাও কেন?

কহিলাম তো, তাহা প্রকাশযোগ্য নহে।

শোনো ভশ্চায, তোমার মতো পিছল লোককে বিশ্বাস নেই। বহুৎ নটঘট তোমার জানা আছে। তবু রামবাবুর নাম বলছো বলে ছাড়ছি। হিমাদ্রিকে সঙ্গে দিচ্ছি, সে এ বাড়িরই ছেলের মতো, সে তোমাকে মালিকার কাছে নিয়ে যাবে। নইলে মালিকার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ হবে না। রদ্দা খেয়ে ফিরে আসতে হবে।

মহাশয়, আপনি বড়ই উপকার করিলেন।

হিমাদ্রি নামে ছিপছিপে ফর্সা হাস্যমুখ ছেলেটি চোখের ইশারায় চলে এল।

যাও বামুন, কোনো গণ্ডগোল কোরো না কিন্তু।

মহাশয়, নিশ্চিন্ত থাকুন।

ভিতরে ঢোকার ব্যাপারে কোনো বাধা হল না। বাড়িটি বিশাল, বিস্তর লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা কাজে। সুতরাং তাদের কেউ আলাদা করে লক্ষ্য করল না। হিমাদ্রি বেশ পরিচিত ছেলে বলেই মনে হচ্ছিল শাসনের। দু'একজনের সঙ্গে একটু-আধটু নিয়মরক্ষার মতো কথাও কইল।

দোতলায় এসে দেখা গেল, এ মহল্লায় মেয়েদেরই বেশি আধিক্য। পুরুষ নামমাত্র। অনেকেই তাকাচ্ছে তাদের দিকে। দু'একজন হিমাদ্রিকে জিজ্ঞেস করল, কি রে, কী খবর?

বাড়ির দুটি মহল, সামনের সঙ্গে পিছনের মহলের যোগাযোগ দোতলায় একটা সরু ব্রিজের মাধ্যমে। এই সেতুটি একটি লম্বা সরু ঘরের মতোই।

পিছনের মহলে ভিড় কম। এটাই খাসমহল বলে মনে হচ্ছিল।

হিমাদ্রি হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আপনি মালিকাকে চেনেন তো!

না মহাশয়।

তবে কী বলে পরিচয় দেবো?

একজন শুভাকাঙ্ক্ষী বলিলেই হইবে।

শেষে আমি বকুনি খাবো না তো!

আমি একজন উত্তম ব্যবস্থাপক। আপনি চিন্তিত হইবেন না।

একেবারে শেষের দিকে অনেক লম্বা বারান্দা আর দরদালান পেরিয়ে একখানা ঘরের বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল হিমাদ্রি। দরজায় টোকা দেওয়ার কিছুক্ষণ পর দরজা সামান্য ফাঁক করে একজন সুন্দরী যুবতী উঁকি দিয়ে বলল, কি রে, কী চাস?

মালিকার সঙ্গে এই ভদ্রলোকের কী দরকার।

যুবতীটি সন্দেহাকুল চোখে শাসনের দিকে চেয়ে হঠাৎ প্রসন্ন মুখে বলে উঠল, আরে ঠাকুরমশাই!

আজ্ঞা হাঁ।

আপনি এখানে!

গুরুতর প্রয়োজনে আসিয়াছি।

মালিকার সঙ্গে দেখা করবেন?

আজ্ঞা হাঁ।

একটু দাঁড়ান। পোশাক পাল্টাচ্ছে। আমাকে মনে আছে তো!

আছে। আপনার নাম বুলা। বটকৃষ্ণপুরের ঘটকমহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা।

উঃ, আপনার মনেও থাকে!

থাকিবে না? আপনার জ্যেষ্ঠা ভগিনীর বিবাহ দিয়াছি, আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপনয়নও আমারই পৌরোহিত্যে হইয়াছিল।

আসুন, হয়ে গেছে।

হিমাদ্রি দরজা থেকেই বিদায় নিল। শাসন ঢুকে দেখল বেশ বড় একটি ঘর। মহার্ঘ সব আসবাবে সাজানো। পুরনো আমলের উঁচু মকরমুখী পালঙ্ক, আধুনিক দামি কাঠের আলমারি, একধারে সোফাসেটও আছে। টিভি, ভিসিআর, মিউজিক সিস্টেম কোনো কিছুর অভাব নেই।

মালিকাকে যতটা কুচ্ছিত বলে অনুমান হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তা মোটেই নয়। মালিকার গায়ের রং ফর্সা, মুখটি ঢলঢলে। তবে গায়ে কিছু অতিরিক্ত চর্বি আছে। একটু ব্যায়াম বা জগিং করলেই সেটা ঝরে যেতে পারে বলে শাসনের মনে হল। মালিকার মুখশ্রীতে কোনো উগ্র ভাব নেই, বরং নম্রতা আছে। সোফায় বসে ছিল, তাকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

বুলা বলল, ইনি ঠাকুরমশাই। আমাদের খুব চেনা। সাধু ভাষায় কথা বলেন কিন্তু।

ও। বলে চুপ করে রইল মালিকা। তারপর বলল, বসুন। চা খাবেন তো!

না মহাশয়া, আমার অভ্যাস নাই। আগে খাইতাম, ছাড়িয়া দিয়াছি।

অন্তত মিষ্টিমুখ তো করবেন। ব্রাহ্মণ মানুষ।

শাসন মুগ্ধ হল। মেয়েটি অভিজাত পরিবারেরই বটে। শুধু বড়লোক হলেই তো হয় না।

মহাশয়া, আমি অসময়ে আহার করি না। ব্রাহ্মণদিগের সংযম পালন করিতে হয়।

শুধুমুখে চলে যাবেন?

আপনি সৌজন্য লইয়া ব্যস্ত হইবেন না। আমি বিশেষ প্রয়োজনে আপনার নিকট আসিয়াছি। কথাটি গোপন।

আচ্ছা, আমি বাইরে যাচ্ছি। বলে বুলা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজা ভেজিয়ে দিল।

এবার বলুন।

আপনি কি এই বিবাহ করিতে ইচ্ছুক?

না। কিন্তু বাধ্য হয়ে করছি।

অভিসারবাবু এই বিবাহে অতিশয় আগ্রহী।

ওরা লোভী। অনেক টাকাও পাচ্ছে তো। বাবা ওদের কিনে ফেলেছে। শুনেছি নগদ দেওয়া হচ্ছে পঞ্চাশ হাজার। দানসামগ্রীও অনেক।

সুবিনয়বাবুর সহিত বিবাহ হইলেও কি এরূপই দেওয়া হইত?

মালিকার মুখটা বিষণ্ণ হয়ে গেল। চোখ নত করে মাথা নেড়ে বলল, সে ওসব নিতই না।

মহাশয়া, আগামী কল্য আপনার বিবাহ। আপনি কি জ্ঞাত আছেন যে, এই বিবাহে কিছু বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা?

শুনেছি। কাকা বিয়েটা হতে দেবেন না।

আপনি এ ব্যাপারে কিছু ভাবিয়াছেন কি?

কী ভাবব?

আপনার পিতাঠাকুরও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তিনি ছাড়িবার পাত্র নহেন। আমার মনে হয় আপনার খুল্লতাতকে টেক্কা দিবার জন্য তিনি ভিন্নতর কৌশল অবলম্বন করিবেন।

তাই নাকি?

শাসন হাসল। বলল, আপনার খুল্লতাত বাইরে পাহারা বসাইয়াছেন, অভিসারবাবুকেও আসিতে বাধা দিবেন। কিন্তু এসকলই গুরুচরণবাবু অনুমান করিতে পারিবেন।

আমি তো কিছু জানি না।

আপনি জানিবেন কেন? কেহই জানে না। আমিও জ্ঞাত নহি, তবে আমার ইহাই অনুমান। আপনার খুল্লতাত বুদ্ধিমান বটেন, কিন্তু গুরুচরণবাবুর কথা যতদূর শুনিয়াছি, তিনি আরও বুদ্ধিমান। আপনি কি এই বিবাহে ইচ্ছুক?

আমার আর কিছু যায় আসে না।

কেন মহাশয়া, আপনি এত হতাশ কেন?

আর কী হবে বলুন! আমার জীবনটা তো অন্ধকারই হয়ে গেছে।

মহাশয়া, নিরাশ হইবেন না। তবে অদ্য রজনী আপনার পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

তার মানে?

শাসন হাসল। বলল, অধিক বলিতে পারি না। তবে এই সকল উদ্যোগ আয়োজন সকলই বাহ্বাস্ফোট বলিয়া মনে হইতেছে। ইহার অন্তরালে অন্য ব্যবস্থা রহিয়াছে। আপনাকে সতর্ক ও তৎপর থাকিতে কহিব।

বুলা আপনার কে হয়?
মাসতুতো বোন।
আমি বিদায় হইতেছি। সময়কালে সংবাদ পাইবেন।
কিসের সংবাদ? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
বুঝিবেন।
শাসন উঠল। দরজার বাইরে বুলার সঙ্গে কিছু কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল।
হাঁটতে হাঁটতে সে পুবদিকে খানিকটা এসে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকল। কয়েকখানা বাড়ির পরই একটা জীর্ণ একতলা বাড়ির সামনে উপস্থিত হয়ে কড়া নাড়ল।
যে দরজা খুলল সে লম্বা, সুপুরুষ এবং মুখে একটি গভীর ভাবনাচিন্তা আর বিষণ্ণতার ছাপ আছে।
মহাশয়, আমার অভিবাদন গ্রহণ করুন। অধমের নাম শাসন ভট্টাচার্য। আপনি কি সুবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়?
আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনি শাসন ভট্টাচার্য! আপনার কথা আমি শুনেছি। আসুন, ভিতরে আসুন।
সামনের ঘরখানা বেশ বড়। বইপত্রে ঠাসা।
মহাশয় খুবই অধ্যয়নপ্রিয় দেখিতেছি?
হ্যাঁ, পড়াশোনা নিয়েই আমার সময় কাটে।
ভাল মহাশয়। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ব্রাহ্মণোচিত বৃত্তি।
আমি আপনার কথা অনেকের কাছে শুনেছি। আপনি বিজ্ঞ মানুষ।
না মহাশয়, আমি কুলাঙ্গার। আমাদের বংশে কিছু অধ্যয়নের অভ্যাস ছিল।
আমার খুব সংস্কৃত শেখার ইচ্ছে। আপনি শেখাতে পারবেন?
আপত্তি কি মহাশয়! শিখিবেন। যৎসামান্যই জানি। তাহাই শিখাইতে পারি।
ওতেই হবে। আপনি কম জানা মানুষ নন।
শাসন হাসল। বলল, সংস্কৃতের বিকল্প নাই। ভারতের রাষ্ট্রভাষা, সংস্কৃতেরই হইবার কথা। কাহাকে বলিবেন, কেহই আজিকালি প্রকৃত চিন্তাশীল নহে।
ঠিকই বলেছেন।
অদ্য আপনার নিকটে বিশেষ কারণে আসিয়াছি।
বলুন।
মালিকাদেবীর প্রতি আপনার মনোভাব কীরূপ তাহা অকপটে আমাকে বলুন।
হঠাৎ একথা কেন?
বিশেষ প্রয়োজন।
একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুবিনয় একটু চুপ করে রইল। তারপর বলল, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আপনি প্রশ্নটা করছেন বুঝতে পারছি। আমার লুকোবার কিছু নেই। মালিকা আমাকে ভালবাসত। প্রথম দিকে আমি তাকে অ্যাভয়েড করতাম। বড়লোকের মেয়ে তো, বামন হয়ে চাঁদের দিকে হাত বাড়িয়ে কী হবে। তাছাড়া ওর প্রতি আমি আকর্ষণও বোধ করতাম না। কিন্তু মেয়েটা বড্ড ভাল। এত ভালবাসা আর নম্রতা দেখে আমারও ওকে খুব ভাল লাগতে লাগল। কিন্তু কী হবে বলুন, ওর বাবার তো ভীষণ আপত্তি।
মহাশয়, রাখ-ঢাক না করিয়া বলি, মালিকাদেবীর জীবনে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা আছে, আপনি তাহা জানেন কি?
ওপর-নীচে মাথা নেড়ে সুবিনয় চাপা গলায় বলল, জানি। এটা ও ইচ্ছে করেই ঘটিয়েছিল বাবার ওপর প্রতিশোধ নিতে। এর জন্যও মূলত আমিই দায়ী।
আপনি কি সেজন্য তাহাকে ক্ষমা করিয়াছেন?

শাসনবাবু, শরীরের কোনো পাপ হয় না, পাপ হয় মনের। তার মন তো পরপুরুষে আসক্ত হয়নি। আমি তাকে জানি।

শাসন হাতজোড় করে বলল, মহাশয়, বয়সে আপনি কনিষ্ঠ না হইলে আপনাকে আজ আমি প্রণাম করিতাম। এই সত্যজ্ঞান কয়জনের থাকে? আমার গুরুদেব শ্রীশ্রীঠাকুরও এই কথাই বলিয়াছেন। আপনার কথায় তাহার প্রতিধ্বনি পাইয়া বড় সন্তোষ লাভ করিলাম।

অত প্রশংসা করলে লজ্জা পাবো।

মহাশয়, মালিকা দেবীর প্রতি আপনি কি অদ্যাপি আসক্ত?

হ্যাঁ শাসনবাবু। সত্যকে অস্বীকার করে লাভ কী? তবে আগামীকাল তার বিয়ে। তার কথা ভুলবার চেষ্টা করছি।

শুনিয়াছি গুরুচরণবাবু আপনাকে প্রহার বা হত্যা করিবার জন্য গুন্ডা লাগাইয়াছিলেন।

হ্যাঁ, সে সব ইতিহাস। আমি সেই স্মৃতিও ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করছি।

আপনার পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক। ঘটনার নিয়ন্ত্রণ নিজ হস্তে গ্রহণ করেন না। কিন্তু মহাশয়, আপনাকে এইবার কিছু তৎপর হইতে হইবে।

কেন বলুন তো!

প্রয়োজন আছে। আর একটি গুরুতর কথা।

বলুন।

মালিকাদেবী বিবাহের পর আমেরিকা যাইবেন।

জানি।

আপনার সঙ্গে যদি তাঁহার বিবাহ হইত তবে কি আপনি তাঁহার সহিত আমেরিকা যাইতেন?

সুবিনয়ের মুখটা হঠাৎ কঠিন হয়ে গেল। একটু তপ্ত গলায় সে বলল, কখনোই নয়। আমেরিকায় যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। একটা কথা শুনে রাখুন। মালিকাও স্বেচ্ছায় যাচ্ছে না। ওকে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। তবে মালিকার এখন যা মনের অবস্থা তাতে ওর বিদেশে যাওয়াই ভাল। হয়তো অন্যরকম পরিবেশে ভালই থাকবে।

বুঝিতেছি আপনি তাঁহাকে বিশেষ স্নেহ করেন।

স্নেহ! তাই হবে। আমি মালিকার ভাল চাই। বেচারা বড্ড মানসিক কষ্ট পাচ্ছে। আমারও তাই মনটা ভাল নেই। ভাবছি কোথাও বেরিয়ে পড়ব, দু'চার দিন ঘুরেটুরে আসব। কেন যে মেয়েটা আমাকে ভালবাসল কে জানে।

মহাশয়, স্নেহের সহিত দুঃখও অঙ্গাঙ্গী। যেখানে স্নেহ সেখানেই উদ্বেগ, বিরহ, শঙ্কা। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে মালিকাদেবীর সহিত আমেরিকায় যাওয়ার কোনো পরিকল্পনা আপনার ছিল না?

এবার সুবিনয় হেসে বলল, না মশাই, না। আমি গরিব দেশের গরিব মানুষ, আমেরিকায় গিয়ে কী হবে? এদেশেই কত কী করার আছে। আর যদি যেতেই হয় তাহলে নিজের জোরেই যাবো, অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে যাবো কেন? আমার কি আত্মমর্যাদা নেই?

সবিশেষ আছে। এখন প্রশ্ন, যে সব গুন্ডা আপনাকে প্রহার করিয়াছিল তাহারা ধৃত হইয়াছিল কি?

না। তারা প্রফেশনাল গুন্ডা। রাতে টিউশনি সেরে বাড়ি ফিরছিলাম, ওই মোড়ের মাথায় রড-ফড দিয়ে অ্যাটাক করেছিল। কিছু বুঝে ওঠার আগেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাই। তাদের চোখেও দেখিনি।

প্রহারের ফলে কি ভয় পাইয়া পিছাইয়া গিয়াছেন?

ভয়-টয় আমি বিশেষ পাই না। গুরুচরণবাবু এতটাই বা করতে গেলেন কেন তাও বুঝতে পারি না। আমি তাঁর মেয়েকে নিয়ে তো পালিয়ে যেতাম না। হয়তো তাঁদের অমতে বিয়ে করতাম, সেটা তেমন কিছু

অপরাধ তো হত না। আমার ওদের সবর্ণ, কোনো দিক দিয়েই বাধা ছিল না। মস্ত বাধা একটিই, ওরা বড়লোক, আমি গরিব।

মহাশয়, এক্ষণে আমাকে উঠিতে হইতেছে। নানা দিক সামাল দিতে হইবে। এক ব্যক্তি চাতকপক্ষীর ন্যায় আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। অদ্য রাত্রিটি বড় সুবিধার হইবে না। দয়া করিয়া আমার জন্য নিজগৃহেই অপেক্ষা করিবেন। যখনই হউক আমি আসিব।

কেন বলুন তো! কী হবে?

তাহা পরে জানিতে পারিবেন। আমার আর সময় নাই।

শাসন বেরিয়ে এল। বেলা প্রায় দেড়টা বাজে। সে অভুক্ত। তবে খাওয়ার অনিয়ম তার বহুদিনের। একটি টেলিফোন বুথে এসে সে অভিসারের বাড়িতে ফোন করল। অভিসার ফোন ধরতেই বলল, মহাশয়, সংবাদ কী?

সংবাদ! সে তো আপনিই দেবেন।

আমিও দিব। আপনার দিকের কোনো সংবাদ আছে কি?

না না! কিছু নেই।

রামচরণবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছি।

একটু চুপ করে থেকে অভিসার সতর্ক গলায় বলল, তিনি কী বললেন?

পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহার অধিক নহে। তিনি এই বিবাহ হইতে দিবেন না।

ও।

এবার মহাশয় কী করিবেন?

আপনি আর কিছু বলবেন?

বলিব।

বলুন।

মালিকাদেবী যে একজনের প্রতি প্রণয়াসক্তা তাহা কি আপনি জানেন?

প্রণয়াসক্তা? সে কে? যার সন্তান—

না মহাশয়, ইনি সেরূপ নীচাশয় নহেন। ভদ্রলোক।

না, আমি ব্যাপারটা জানি না।

এখন তো জানিলেন।

হুঁ।

কী করিবেন?

এখন এসব জেনেই বা লাভ কি? হাড়িকাঠে গলা তো দিয়ে ফেলেছি।

তাহাই কি মহাশয়? ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখুন।

মেয়েটা কার প্রেমে পড়েছে?

সুবিনয় বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি শিক্ষক এবং পণ্ডিত ব্যক্তি। তবে ধনী নহেন।

এসব তো আর গুরুচরণবাবু আমাদের জানাননি।

তিনি কি কন্যার কলঙ্কের কথাও আপনাদের জানাইয়াছেন?

না, তাও জানাননি।

মহাশয়, আপনারা কি বিবাহে পণ লইতেছেন?

না, অন্তত আমি জানি না।

শুনিতেছি, নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আপনি শোনেন নাই?

না। কানাঘুষো শুনেছি যে, ওঁরা নাকি বউভাতের খরচ দেবেন।

তাহাই কি দেওয়ার নিয়ম?

ওসব কথা থাক। আমি বাবার হুকুমে বিয়ে করছি।

বিবাহ কোথায় হইবে?

কেন, গুরুচরণবাবুর জয়নগরের বাড়িতে।

আমি আপনাকে জয়নগর হইতেই টেলিফোন করিতেছি। সত্য বটে, গুরুচরণবাবুর বাড়িতে জাঁকালো রকমের উদ্যোগ-আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু বিবাহটা কোথায় হইবে মহাশয়?

এ কথার মানে কী?

তাহা আমিও অবগত নহি। তবে অনুমান করি, বিপদের আশঙ্কায় বিবাহের স্থান পরিবর্তন হইতে পারে। তারিখও বদলাইতে পারে।

সেসব আমি তো জানি না।

মহাশয়, আপনি এই ক্ষণেই জয়নগর আসুন।

কেন?

বিশেষ প্রয়োজন।

পাগল নাকি? আমাকে মা বেরোতে দিচ্ছে না।

কী কারণে মহাশয়?

বলছেন যে বিয়ের আগে কোনোরকম কাটাছেঁড়া হতে নেই। খুব সাবধানে থাকতে হয়।

অতি সত্য কথা। ধর্মীয় কার্যে ক্ষত বিঘ্নকারক।

তাই বেরোচ্ছি না।

অন্য কারণ নাই?

আর কী কারণ থাকবে?

মহাশয়, কারণ লইয়া আর প্রশ্ন করিবার ইচ্ছা নাই। এখন অন্য প্রশ্ন।

বলুন।

যে স্ত্রীলোক অন্যের প্রতি আসক্তা তাহাকে লইয়া ঘর করিবেন কী প্রকারে?

সে যে অন্য কাউকে ভালবাসে তা তো আপনার কাছে প্রথম শুনলাম। এখন এ বিষয়ে কী করা যাবে বুঝতে পারছি না। আমি মালিকার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলব কি?

বলিয়া লাভ কি হইবে? মালিকাদেবী স্বীকার করিবেন।

বিয়েটা খুব ভুল হয়ে গেল হয়তো।

মহাশয় কি দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন?

করলাম।

এরূপ দীর্ঘশ্বাস সারা জীবনে আরও কত ত্যাগ করিতে হইবে তাহা অবগত আছেন কি?

না শাসনবাবু। তবে ভাবছি বিয়ে করাটা বোধহয় ভুলই হল। কিন্তু কী আর করা।

মহাশয়, আপনি আর রামচরণবাবুর পরিকল্পনা বা বক্তব্য সম্পর্কে কিছুই জানিতে চাহিতেছেন না। কিন্তু গত রাত্রিতে এই সামান্য তথ্যের জন্য আমাকে পাঁচশত টাকা বাটি যাইয়া দিয়া আসিয়াছেন। আপনার কৌতূহল কি নিবৃত্ত হইয়াছে?

টাকার কথাটা তুলছেন কেন? ওটা আপনার দক্ষিণা। তবে হ্যাঁ শাসনবাবু, রামচরণবাবুর বক্তব্য নিয়ে আমার আর কৌতূহল নেই।

কেন মহাশয়?

ভাবছি, আমার ভাবী শ্বশুরমশাই যা করার করবেন, আমি ভেবে মরি কেন?

পত্রের কথা কি তিনি জানেন?

না। তবে রামবাবু তাঁর বক্তব্য গোপন রাখেননি।
আচ্ছা মহাশয়, আমার বক্তব্য শেষ হইয়াছে।
বিয়ের পর একদিন আসবেন।
আসিব মহাশয়। ব্রাহ্মণ ফলারের আমন্ত্রণ পাইলেই দৌড়ায়।
ফোন রেখে শাসন একটু হাসল।
বেলা তিনটের সময় গুরুচরণবাবুর বাড়ির দক্ষিণের চৌপাথিতে শাসন দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল। আচমকাই মুকুন্দ আর সাজু এসে উদয় হল।
ঠাকুরমশাই, এসে গেছি।
উত্তম। এক্ষণে আমার সহিত আইস।
গুরুচরণবাবুর বাড়ির সামনের প্রান্তরে ঢুকে শাসন বলল, তোমরা অদ্য মদ্যপান কর নাই তো!
না ঠাকুরমশাই, আমরা সন্ধের আগে খাই না।
ভাল। আইস।
বাড়ির দক্ষিণ দিকে একটি বাগান। মেলা গাছপালার সমারোহ। শাসন একটি নির্দিষ্ট গাছের নীচে অপেক্ষা করতে লাগল। সঙ্গী দুইজনও চুপ।
বেশ কিছুক্ষণ পর বুলা এল। তার মুখে উত্তেজনা।
ঠাকুরমশাই!
কী সংবাদ বুলা?
ও পিছন দিকে জায়গামতো অপেক্ষা করছে।
ভাল। চল, এইবার যাওয়া যাউক।
বাড়ির পিছনে একটা পুকুর, পুকুরের এক কোণে ছোটো একটা লাকড়ির ঘর। এখন খালিই পড়ে থাকে। ঘরের মধ্যে মালিকা অপেক্ষা করছিল। চোখে ভয়, মুখে দুশ্চিন্তা। শাসনকে দেখেই বলে উঠল, কী হচ্ছে ঠাকুরমশাই, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
বুঝিবেন। শঙ্কা করিবেন না। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী।
বাবা টের পেলে যে কুরুক্ষেত্র করবেন।
মহাশয়া, আপনার পিতাঠাকুরকে লইয়া চিন্তা করিবেন না। সময় আসিলে তিনি সকলই বুঝিবেন।
কিন্তু আমি এখন কী করব? বাবা যে বলে গেছে বিকেল পাঁচটার সময় আমরা কালীঘাটে পুজো দিতে যাবো!
বটে মহাশয়া? কালীঘাট! তবে তো আমার অনুমান মিলিয়া যাইতেছে।
কী বলছেন?
আমি কহিতেছি, আপনার পিতাঠাকুর অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁহার সহিত বুদ্ধিতে আঁটিয়া উঠা কঠিন।
এখনই যে বাড়িতে আমার খোঁজ হবে!
মহাশয়া, আপনাকে অধিকক্ষণ আটকাইব না। তবে আপনার নিকট একটি কথা জানিতে ইচ্ছা করি।
বলুন।
যদি ঘটনাক্রমে এই বিবাহ না হয় তাহা হইলে আপনি কি সন্তুষ্ট হইবেন?
বলেছি তো, আমার আর ইচ্ছে-অনিচ্ছে কিছু নেই। সবসময়ে আমার মনে হয় আমি মরে গেছি। শুধু মরা একটা দেহ চলেফিরে বেড়াচ্ছে। কত পাপ যে করেছি তার ঠিক নেই। মাথাটাই আমার গোলমাল হয়ে গেছে।
হাঁ মহাশয়া, ব্যক্তিত্ববান ও স্বাধিকারপ্রমত্ত পিতার অধীনে সন্তানদিগের কিছু ক্লেশ হইয়া থাকে। বিশেষ যদি পিতা বিবেচক না হন।

এখন কী করতে হবে ঠাকুরমশাই?

কহিতেছি। অগ্রে কহুন, সুবিনয়বাবুর প্রতি আপনার মনোভাব এখন কীরূপ?

আবার তার কথা কেন?

তাঁহার কথাই আজ গুরুতর। লজ্জা ত্যাগ করিয়া স্পষ্টভাবে মনোভাব ব্যক্ত করুন।

বিষণ্ণ মুখে মালিকা বলল, তার প্রতি আমার মনোভাব তো কখনও বদলায়নি। তাকে আমি আজও ভালবাসি। তার জন্যই জীবনটা নষ্ট করেছি বটে, তবু তাকেই ভালবাসি।

আর কহিতে হইবে না। বুঝিয়াছি।

এখন কি আমি যেতে পারি?

হাঁ মহাশয়া। আপনার মনোভাবটি জানা অতি গুরুতর ছিল। এইক্ষণে আপনি যাইতে পারেন।

যেতে গিয়েও মালিকা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, ঠাকুরমশাই, আপনি কি কিছু করতে চাইছেন?

মহাশয়া, আমরা নিমিত্ত মাত্র। ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝিয়া স্বীয় বুদ্ধি প্রয়োগে কার্য করিয়া থাকি। সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

আসছি ঠাকুরমশাই।

মহাশয়া, জীবনে অনেক দুঃখ পাইয়াছেন। অনুরাগের মূল্য দিতে গিয়া সতীত্বকেও পরীক্ষায় ফেলিয়াছেন। প্রণয় অতি আশ্চর্য বস্তু। আমি কহি কী, মহাশয়া, জীবনে আর একবার মাত্র আমার বাক্য মান্য করিয়া একটি বিপজ্জনক কাজ করিবেন কি?

মালিকা অবাক হয়ে বলে, কী?

মহাশয়া, আমার বাসস্থান খুব দূরবর্তী নহে। আমার বিশ্বস্ত দুই বান্ধব উপস্থিত। বাহিরে, আপনাদিগের বাটির পশ্চাদ্ভাগে একটি দীন শকটও প্রস্তুত রহিয়াছে। আমি কহি কী আপনি কিছুকালের জন্য আমার বাসস্থানে অবস্থান করুন। আপনি স্থানান্তরিত না হইলে অদ্যই আপনার বিবাহ অভিসারবাবুর সহিত সম্পন্ন হইবে।

কী বলছেন ঠাকুরমশাই?

মহাশয়া, আপনি ইহজীবনে সকল আশা-ভরসা বিসর্জন দিয়াছেন। আপনি নিজেই কহিলেন যে আপনি আপনার মৃতদেহ বহন করিয়া চলিতেছেন। ঘটনাপ্রবাহ আপনাকে আর স্পর্শ করিতেছে না। কিন্তু ইহা জীবনের ধর্ম নহে। বাঁচিয়া থাকিলে বাঁচিবার শর্তগুলিও পূরণ করিতে হয়। মৃতবৎ জীবিত থাকা অর্থহীন। যদি এরূপ ঘটিতে দিই তাহা হইলে আমাদেরও পাতক হইবে। মহাশয়া, আপনি দুঃসাহসে ভর করিয়া আমার পরামর্শমতো কার্য করুন। দেখা যাউক, মৃতদেহে প্রাণের স্পর্শ ফিরিয়া আসে কিনা।

আপনার বাড়িতে কতদিন থাকতে হবে?

মহাশয়া, আমার অনুমান আপনার অবস্থান স্বল্পকালের জন্যই হইবে। চিন্তা করিবেন না, বুলা আপনার সঙ্গেই যাইবে। উহার বাড়িতে আমি সংবাদ দিয়া রাখিয়াছি।

মালিকা সামান্য একটু দ্বিধা করে হঠাৎ চোখ তুলে বলল, আমার আপনাকে খুব বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হচ্ছে। জানি না শেষ অবধি কী হবে। ঠিক আছে, যাচ্ছি।

বাহিরে আমার এক যজমানের শকট প্রস্তুত। সঙ্গীরাও আমার বিশেষ বিশ্বস্ত। উদ্বিগ্ন হইবেন না। নিরাপদেই যাইতে পারিবেন। ইহারা প্রাণ দিয়াও আপনাকে রক্ষা করিবে। আর কালক্ষেপ করিবেন না, অগ্রসর হউন।

মালিকা চলে যাওয়ার পর বুলা বলল, আমিও যাই?

সাজু আর মুকুন্দ পেছনের ফটক খুলে ফেলল। এদিকেও কাজের লোকজন ঘোরাঘুরি করছে। কিন্তু তারা নিতান্তই কাজের লোক, ঘটনার তাৎপর্য বোঝার মতো কেউ নয়। কাজেই কোনো বাধা হল না।

শাসন তাদের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিল। বাইরে একটি অ্যামবাসাডার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। বিনা ভূমিকায় কুশীলবরা তাতে উঠে পড়ল এবং গাড়িটি বেরিয়ে গেল।

শাসন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফটকটা বন্ধ করে ফিরে এল ভিতরে। মালিকাকে সরিয়ে দিলেই কাজ শেষ হবে না। গুরুচরণ অত সহজ মানুষ নয়।

শাসন জানে, অভিসার ছেলে খারাপ নয়। কিন্তু মালিকাকে বিয়ে করছে নিতান্তই লোভে পড়ে। শাসনের সন্দেহ মালিকার কলঙ্কের কথা অভিসারের মা-বাবাও জানেন। কিন্তু নিতান্তই টাকার স্রোতে তাঁদের ভাসিয়ে দিয়েছে গুরুচরণ। টাকার জোরে বিয়েটা দিতে পারলেও অভিসারের সঙ্গে মালিকার ভাবী দাম্পত্য জীবনের পরিণতি ভাল না-হওয়ারই কথা। নানা কূট সন্দেহ, ঘৃণা, অবিশ্বাস দুজনকেই বিষাক্ত করে দেবে।

শাসন চিন্তিত মুখে হাঁটতে লাগল।

শাসন একটু অপেক্ষা করে বাড়ির সামনের দিকে গিয়ে একটু খোঁজ করে গুরুচরণবাবুর ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সামনের বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তের ঘর। মস্ত ভারী শালকাঠের দরজা। সামনে একজন দারোয়ান টুলে বসে আছে।

কাকে চাই?

গুরুচরণবাবুকে।

উনি জরুরি কাজে ব্যস্ত আছেন। এখনই বেরিয়ে যাবেন। দেখা হবে না।

আমার প্রয়োজনটিও গুরুতর।

কাল সকালে আসবেন। বাবুর মানা আছে, আজ কারও সঙ্গে দেখা হবে না।

আমার নাম শাসন ভট্টাচার্য। ভিতরে গিয়া আমার নামটি বলুন, তিনি বুঝিবেন।

কোথা থেকে আসছেন?

নিকটস্থ একটি গ্রাম হইতে। মহাশয়, বিলম্ব করিবেন না।

ঠিক আছে। দাঁড়ান।

এই বলে ভেজানো দরজা ঠেলে লোকটা যখন ভিতরে ঢুকেছে তখন শাসনও তার পিছু পিছু ঢুকে পড়ল। ‘‘আরে! আরে! করেন কী?’’ বলে দারোয়ান একটু বাধা দিতে চেষ্টা করল। শাসন তাকে ঠেলে সরিয়ে একেবারে গুরুচরণবাবুর মুখোমুখি দাঁড়াল।

সামনে মস্ত টেবিলের ওপাশে একটা রিভলভিং চেয়ারে গুরুচরণ বসে আছে। রামচরণের সঙ্গে মুখের আদলে মিল থাকলেও অনেক ব্যাপারে দুজনে আলাদা। রামচরণের মতো শরীরের মজবুত বাঁধন গুরুচরণের নয়। গোঁফ নেই, বরং মাথায় টাকের আভাস আছে। কিন্তু গুরুচরণের মুখেও একটা কঠিন ও নির্মম মনোভাবের ছাপ আছে, যা দেখে বোঝা যায় এ যা করতে চায় তা না করে ছাড়ে না।

আর গুরুচরণের টেবিল ঘিরে কয়েকখানা চেয়ারে যে সাতজন লোক বসে আছে তাদের চেহারা দেখলেই আর পরিচয়ের দরকার হয় না। অতি উচ্চশ্রেণির পেশাদার গুন্ডা এবং খুনি ছাড়া ওরকম তীব্র চোখ দেখা যায় না।

মোট আটজোড়া জ্বলন্ত চোখ তার দিকে নিবদ্ধ দেখেও শাসন খুবই বিনীত হাসিমুখে গুরুচরণবাবুকে বলল, অভিবাদন গ্রহণ করুন মহাশয়।

আপনি কে?

দারোয়ানটা কাঁইমাই করে বলে উঠল, শাসন না কী যেন নাম বাবু, ঠেলে ঢুকে পড়ল।

দারোয়ানের দিকে হাত নেড়ে গুরুচরণ বলল, তুমি যাও।

দারোয়ান চলে যাওয়ার পর গুরুচরণ ভ্রূ কুঁচকে মুখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলল, শাসন আপনার নাম?

হ্যাঁ মহাশয়।

কে একজন পুরুত সাধু ভাষায় কথা বলে শুনেছি। আপনিই সে?

আজ্ঞা হ্যাঁ।

তা এখানে হঠাৎ কী দরকার?

কথাটি প্রকাশ্যে বলা যাইবে না।

গোপনে বলতে চান? কিন্তু তার তো এখন সময় হবে না। আমি জরুরি কাজে ব্যস্ত রয়েছি। এখনই বেরিয়ে যাবো। আপনি দু'তিন দিন পরে আসুন।

তখন আর বলিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

কী এমন কথা! সাহায্য-টাহায্য চান নাকি?

হ্যাঁ মহাশয়।

কিসের সাহায্য? কন্যাদায়?

না মহাশয়, আমার সন্তানাদি হয় নাই।

তবে কী চান?

ব্রাহ্মণকে একটি বাক্য প্রদান করিবেন কি?

কিসের বাক্য?

আপনার কন্যার বিবাহটি স্থগিত রাখুন। স্থির ও শীতল মস্তিষ্কে আরও একটু বিবেচনা করুন, তাহার পর দিবেন।

অসম্ভব। বিয়ে কালই হবে। আপনি আসতে পারেন।

গুরুচরণের গলার থমথমে ভাবটা কানে লাগল শসনের। সে সাতজন গুন্ডার দিকে নির্দেশ করে বলল, মহাশয়, এই ভদ্রমহোদয়গণকে কী উদ্দেশ্যে আনাইয়াছেন?

তার কৈফিয়ত কি আপনাকে দিতে হবে নাকি? শুনুন মশাই, আপনার উপদেশ শোনার মতো সময় আমার নেই। এবার বিদেয় হোন।

যথা আজ্ঞা মহাশয়। যাইতেছি। যাইবার পূর্বে জানাইয়া যাই, আপনার কন্যার বিবাহ আগামী কল্য নহে, আপনি আজই দিতেছেন।

চমকে উঠে গুরুচরণ বলল, কে বলেছে?

আমার চরের অভাব নাই। আমি সবিশেষ জ্ঞাত আছি। মহাশয়, বাইরে রামচরণবাবুর গুন্ডারাও মোতায়েন রহিয়াছে। তাহাদের সংবাদটা দিব কি?

গুরুচরণের মুখ হঠাৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করল। প্রায় চিৎকার করে উঠে সে বলল, এত বড় সাহস! আমার বাড়িতে ঢুকে আমাকেই থ্রেট করা হচ্ছে?

সাতজন লোকের মধ্যে দুজন হঠাৎ উঠে এসে দুদিক থেকে শাসনের দুটো হাত ধরে ফেলল। একজন বলল, মালটি কে গুরুচরণবাবু?

একজন পুরুত বলে শুনেছি। মহা পাজি লোক।

গুন্ডাদের একজন তার ঘাড়টা ধরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, কী পুরুতঠাকুর, কী করবে বললে!

শাসন হঠাৎ দুই হাতে প্রবল ঝাঁকুনি দিতে দিতে চিৎকার করতে লাগল, মহাশয়গণ, আমাকে ছাড়িয়া দিন...ছাড়িয়া দিন...

দুই গুন্ডার একজন একটা ঘুঁষি তুলেছিল, কিন্তু আর একজন টপ করে উঠে এসে ঘুঁষিটা আটকে বলল, চিতু, ছেড়ে দে, আমি দেখছি।

চিতু নামের গুন্ডাটা ছেড়ে দিয়ে বলল, বিচিত্র জীব!

সতু, তুইও ছেড়ে দে।

দ্বিতীয় গুন্ডাও শাসনের হাত ছেড়ে দিল।

তিন নম্বর গুন্ডাটি দানবাকৃতি। ছ' ফুটের ওপর লম্বা এবং মেদহীন পেশিবহুল চেহারা। বাঁ ভ্রূর ওপর সন্দেহজনক একটা কাটা দাগ আছে। চোখে খুনির শীতল দৃষ্টি। সে গুরুচরণের দিকে চেয়ে বলল, এর ব্যবস্থা আমি করছি। আপনারা কথা চালিয়ে যান।

গুরুচরণ বলল, লোকটাকে ছেড়ে দিও না সুভাষ। ও বোধহয় আমার ভাইয়ের টাকা খেয়ে এখানে ওকালতি করতে এসেছে।

ঠিক আছে, দেখছি।

ঘরের বাইরে এসে ভ্রূ কুঁচকে সুভাষ বলল, চিনতে পারছেন?

না মহাশয়। আপনি কে?

চলুন, একটু তফাতে গিয়ে বলছি।

বারান্দা থেকে নেমে মাঠের একধারটায় দাঁড়িয়ে সুভাষ বলল, আপনার গাটস সেই আগের মতোই আছে দেখছি।

শাসন করুণ হেসে বলল, চতুর্দিকে সকল অন্যায়ের সহিত সংগ্রাম করিবার মতো শক্তি আমার নাই। শুদ্ধমাত্র অকুতোভয় হইবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তাহাতে কাজ কতদূর হয় বলিতে পারি না, বিড়ম্বনা বিস্তর জুটিয়া যায়। মহাশয়, আপনার পরিচয় তো দেন নাই?

দশ বছর আগের আমাকে হয়তো চিনতে পারছেন না। তখন আমার বয়স ছিল আঠারো-উনিশ। আপনি আমার বাবার কুলগুরু। বছরে একবার আমাদের বাড়িতে আসতেন। বাবা আর মা আপনার পা ধুইয়ে দিতেন, সিধে দিতেন। আমার বাবার নাম পরিতোষ মিত্র।

শাসন হাসল, পটুয়াটোলার পরিতোষবাবু তো! তোমার নাম কচি নহে কি?

হ্যাঁ, আমি কচি। যখন আপনি আমাদের কুলগুরু ছিলেন তখন আপনাকে আমি মোটেই পছন্দ করতাম না। আপনার প্রতি ভক্তির বাড়াবাড়ি দেখে নিজের বাবা-মায়ের ওপরও আমার রাগ হত। তারপর আপনি নিজেই ঠাকুরের শিষ্যত্ব নিয়ে গুরুগিরি ছেড়ে দেন।

অবশ্যই। আমার জীবনে একটি শুভ পরিবর্তন আসিয়াছিল। তোমার পিতা-মাতাকেও আমি পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের সৎনামে দীক্ষিত করি।

হ্যাঁ ঠাকুরমশাই, আমি জানি। আমার মা-বাবা ধার্মিক, কিন্তু আমি তত ধার্মিক হতে পারিনি।

বুঝিতেছি। তুমি কি পেশাগতভাবেই কুকার্য করিয়া থাকো?

হ্যাঁ ঠাকুরমশাই। পাপ কিছু কমও করিনি। সে কথা থাক। আপনাকে এ অবস্থায় দেখে মনে হচ্ছে কিছু গণ্ডগোলে পড়ে গেছেন। কী ব্যাপার?

বিস্তারিত কহিবার সময় নাই। তবে বাপু, আমি ইচ্ছা করিয়াই একটু শোরগোল তুলিবার চেষ্টা করিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম একটা হাঙ্গামা বাধাইয়া সকলকে অন্যমনস্ক করিব। নহিলে ঘোর বিপদ।

আপনি কী চাইছেন একটু বলুন তো!

আমাকে সাহায্য করিবে?

কেন করব না? বলুন না।

তাহা হইলে আমাকে প্রহার করিতে থাকো যাবৎ আমি মৃতবৎ ভূতলে পড়িয়া না যাই।

প্রহার! ঠাকুরমশাই, আমার হাত যে লোহার মতো শক্ত। এ হাতের মার খেলে মজবুত মানুষও হাসপাতালে যায়। তাছাড়া আপনার গায়ে কি হাত তুলতে পারি! পাপী হলেও এতদূর নীচে নামিনি।

মূর্খ আর কাহাকে বলে! আসল প্রহার করিতে বলি নাই, নকল প্রহারও তো করিতে পারো!

কচি একটু হেসে বলল, ঠাকুরমশাই, এসব ব্যাপার আপনার চেয়ে আমি অনেক ভাল বুঝি। আপনি একটা ডাইভারশান চান তো!

অবশ্যই!

তার জন্য আপনাকে মারধর করার দরকার নেই। অন্য উপায় আছে।

কী উপায়?

আপনি একটু দাঁড়ান। আমি আসছি।

কচি খুব দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল এবং ঠিক দু'মিনিট বাদে ফিরে এল। বলল, চলুন ঠাকুরমশাই, গুরুচরণবাবুকে কথা দিয়েছি আপনাকে ছেড়ে দেবো না। চলুন, ও ঘরেই চলুন।

কিছু ঘটিবে?

অবশ্যই ঘটবে। পাঁচ মিনিট সময় দিন।

কচি শাসনকে নিয়ে ফের গুরুচরণের ঘরে এসে ঢুকল। গুরুচরণকে বলল, না, এঁর সঙ্গে রামচরণবাবুর সম্পর্ক নেই। ইনি জাস্ট নিজের গরজেই আপনাকে বোঝাতে এসেছিলেন। হাঙ্গামা বাড়িয়ে কী হবে? এঁকে ছেড়ে দিই?

সাতজোড়া চোখ তাদের দেখছিল।

আচমকাই বাইরে প্রবল একটা বিস্ফোরণের শব্দ হল। এত জোর শব্দ যে ঘরটা সেই শব্দে কেঁপে উঠল হঠাৎ। চোখের পলকে বসা লোকগুলো লাফিয়ে উঠল, কে যেন চেঁচিয়ে উঠল, অ্যাকশন শুরু হয়ে গেল!

অন্য একজন বলল, কোন শালা, শুয়োরের...

দু'তিনজনের হাতে রিভলভার দেখতে পেল শাসন। তারা সবাই হুড়মুড় করে ঘরের বার হতে না হতে উপর্যপরি বোমার শব্দ হতে লাগল। বাইরে লোকজন আতঙ্কিত হয়ে দৌড়াদৌড়ি করছে। প্যান্ডেলের একধারে ধোঁয়ায় ধোঁয়াক্কার, সম্পূর্ণ অরাজকতা।

গুরুচরণবাবু বেরিয়ে এসে চেঁচাতে লাগল, এ ওই কালোর কাজ। এ নিশ্চয়ই কালো। আগে ওকে খুন করো, তারপর অন্য কথা। রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবো আজ...

শাসন শান্তভাবে তার পিছনে দাঁড়িয়ে একটু হাসল। কচির ব্যবস্থা খুবই ভাল। এতটা আশা করেনি সে।

।। চার ।।

আমি ম্লেচ্ছ ভাষা ব্যবহার করি না। কিন্তু ইহাকেই বোধহয় ইংরাজিতে প্যান্ডেমোনিয়াম কহে।

ইংরিজি আমিও ভাল শিখিনি, তবে প্যান্ডেমোনিয়ামটা জানি। হ্যাঁ, এই হল সেই প্যান্ডেমোনিয়াম।

কেহ হতাহত হয় নাই তো!

না ঠাকুরমশাই, আমার ছেলেরা অত কাঁচা নয়। তারা কোন কাজ কীভাবে করতে হয় তা ভালই জানে। কিন্তু আপনি এখনও দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমার উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই।

গুরুচরণবাবু আপনার ওপর রেগে আছেন। আপনাকে দেখলে হয়তো আবার চণ্ডমূর্তি ধারণ করবেন।

জানি। মনুষ্যটি স্বীয় বৃত্তি-প্রবৃত্তির তাড়নায় কষ্ট পাইতেছেন। যাহাদের অহং প্রবল তাহারাই ক্লেশ ভোগ করে। গুরুচরণবাবুর সর্বাধিক শত্রু তাঁহার নিজেরই অহং।

সে তো বুঝলাম, এখন কী করতে চান বলুন। আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ আমাকে কথা বলতে দেখলে গুরুচরণবাবুর সন্দেহ হবে যে, আমি ষড়যন্ত্র করছি। এখনও অর্ধেক টাকা বাকি।

তোমাদের সহিত গুরুচরণবাবুর চুক্তিটি কীরূপ? কী কার্য করিতে তিনি অর্থব্যয় করিতেছেন?

অ্যাকশন হলে পাল্টা অ্যাকশন। মেয়েকে এসকর্ট করে কালীঘাটে নিয়ে যাওয়া এবং ফিরিয়ে আনা আর কাল বিয়েবাড়ি গার্ড দেওয়া।

আর কোনো দায়িত্ব নাই?

না। আর কী দায়িত্ব থাকবে? তবে চিতু বলছিল, এখানে সুবিনয় নামে কে এক ছোকরা আছে, তাকে নজরে রাখার জন্য তাকে বলা হয়েছে।

শাসনের চোখ বিস্ফারিত হয়েই স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কী নাম বলিলে?

চিতু। চিত্তরঞ্জন বসাক।

কীরূপে নজরে রাখিবে?

তা জানি না।

প্রহার করিবার আদেশ দিয়াছেন কি?

তা জানি না। তবে চিতু খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। টক করে হাত-ফাত চালিয়ে দেয়।

তাহা হইলে বিপদ। কচি, আমাকে একটু সাহায্য করিবে কি?

বলুন না। আমি তো আজ দেখছি আপনার হয়েই কাজ করছি।

ততটা করিতে বলি না। সূক্ষ্মভাবে তাহা বিশ্বাসঘাতকতা হইবে। শুধু চিতুকে চিহ্নিত করিয়া দিতে হইবে। তাহাকে কীরূপে চিনিব?

সোজা। গায়ে একটা কালো ফুলহাতা শার্ট আছে। চিতু বেঁটে, বেশি মোটাসোটাও নয়। দেখতে ছোটোখাটোই। তবে মাথায় খুব ফাঁপানো কোঁকড়া চুল আছে।

বুঝিলাম।

ঠাকুরমশাই, ওকে ঘাঁটাতে যাবেন না। সঙ্গে আর্মস আছে।

থাকিবারই কথা। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারি না। এইবার যাইতে হইবে।

আসুন ঠাকুরমশাই।

চারদিকে চূড়ান্ত বিশৃংখলা, ছোটাছুটি, পুলিশের আবির্ভাব সব মিলিয়ে অরাজকতাটা এমনই সম্পূর্ণ যে, অন্দরমহলের খবর এখনও এদিকে আসেনি। সময় যতটা কাটানো যায় ততই ভাল।

চিতু নামের গুন্ডাটি সুবিনয়ের বাড়ির দোরগোড়াতেই দাঁড়ানো। তবে দূরাগত বোমার শব্দ এবং পুলিশের গাড়ির সাইরেন তাকে কিছু চঞ্চল করে তুলেছে। সে গলির মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝবার চেষ্টা করছিল।

একটা রোগা-পাতলা লোক সেদিক থেকে এক দৌড়ে গলিতে ঢুকে হাঁফাতে হাঁফাতে এসে বলল, পুলিশ গুলি চালাচ্ছে...

চিতু খুব উদ্বিগ্ন হল না। শুধু জিজ্ঞেস করল, হাঙ্গামাটা কিসের?

সাতটা গুন্ডা এসেছে কলকাতা থেকে। তাদের ধরা হচ্ছে।

চিতু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলল, ফোট শালা!

ছেলেটা দৌড়ে চলে গেল। গলি দিয়ে লম্বা কালোমতো একটা লোকও দৌড়ে এল এদিকে।

পুলিশ গুলি চালাচ্ছে!

এইবার চিতু চঞ্চল হল। গুলির শব্দ সে পায়নি বটে, কিন্তু সবাই এক কথা বলছে কেন! জামার তলায় কোমরে ডান হাতটা রেখে সে গলির মুখের দিকে এগিয়ে গেল।

গলির মুখে দুদিকেই কয়েকজন দাঁড়িয়ে। বাঁ দিকে চেয়ে গণ্ডগোল আঁচ করছে। চিতু একটু উঁকি দিল। কী হল তা সে বুঝতেই পারল না। মাথায় একটা ভারী কী যেন এসে পড়ল। তারপর চোখ অন্ধকার।

ফাঁকা গলিতে একটা ভ্যানগাড়ি ঝকর ঝকর করে ঢুকে পড়ল।

সুবিনয়ের দরজায় ধাক্কা দিয়ে শাসন ডাকল, মহাশয়! মহাশয়!

সুবিনয় দরজা খুলে অবাক হয়ে বলল, আপনি!

ত্বরা করুন, এইক্ষণেই রওয়ানা হইতে হইবে।

সে কী মশাই! ঘণ্টাখানেক আগে একটা লোক এসে আমাকে পিস্তল দেখিয়ে বলল ঘর থেকে বেরোলে গুলি করবে। সেই থেকে বেরোতে পারছি না।

জানি মহাশয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আমি কোথায় যাবো?

অদ্যই আপনার বিবাহ।

সুবিনয় হাঁ করে চেয়ে থেকে বলল, কী বলছেন?
আমি বৃথা বাক্য কহি না। ত্বরা করুন।

অনেক রাতে দুজন দাওয়ায় বসে আছে।
আজ পুন্নিমে নাকি রে সাজু?
হুঁ হুঁ বাবা, আজ আর ভুল করছি না। ঠাকুরমশাইকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিয়েছি।
কী জানলি?
আজ পুন্নিমেই বটে। বিয়ের লগ্নও ছিল।
তা বটে। তবে বিয়েটা ভ্যাতভ্যাতে হল। শুধু মন্তর। নেমন্তন্ন হল না।
হবে।
হবে? বলছিস!
নিজের কানে শুনেছি। হবে।
আমাদের হলেই হল, কি বলিস? কে আসছে রে?
সেই বাবুটাই মনে হচ্ছে যেন!
তোর নেশা হয়েছে।
না গো মুকুন্দদা। নেশা কোথায়? এই তো মোটে দু' নম্বর ভাঁড়।
তোর মাথা! ছ' নম্বর চলছে।
বলো কী!
অভিসার সামনে এসে দাঁড়াতেই মুকুন্দ একগাল হেসে বলল, ঠাকুরমশাই যে আজও বাড়িতে নেই।
কোথায় গেছেন?
যজমান বাড়ি। ঘরে তালা।
অভিসার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বসল।
সাজু বলল, ধকলটাও তো কম গেল না। বিয়ে দিলেন, বর-বউ নিয়ে রওনা হয়ে গেলেন।
ও।
তা সিগারেট হবে নাকি বাবু?
অভিসার পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল।
মুকুন্দ যত্নের সঙ্গে একটা নতুন ভাঁড়ে ধেনো ঢেলে এগিয়ে দিয়ে বলল, বাবু, ইচ্ছে করুন।
অভিসার হাত বাড়িয়ে ভাঁড়টা নিল।

[পৌষ ১৪০৪]

—

ছবি

আপনাকে দেখে একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক বলেই মনে হয়। কিন্তু আপনি যাকে খুঁজতে এসেছেন সে একজন অতি সন্দেহজনক চরিত্র।

বটে! কিন্তু চতুর্মুখবাবুকে আমার তো খারাপ লোক বলে মনে হয়নি। অবিশ্যি, শুধু মুখ বা আচরণ দেখে আজকাল ভাল-মন্দ আন্দাজ করা কঠিন। তবে শুনেছিলুম যেন চতুর্মুখ একজন আর্টিস্ট। ছবি এঁকে তাঁর নাকি বেশ নামডাক। সত্যি কথা বলতে কী, আমি অত খবর রাখি না। আমি থাকি বিদেশে। এখানে এই পশ্চিমবঙ্গে কী হচ্ছে-টচ্ছে তার খবর খুব একটা রাখা হয় না।

খুব ভুল শোনেননি। চতুর্মুখ রায় ছবি-টবি আঁকে। তবে তার যে বিশেষ নামডাক হয়েছে এটা ঠিক কথা নয়। ওপরের যে ঘরটায় সে ভাড়া থাকত সেখানে এখনও তার বিস্তর ছবি ডাঁই হয়ে পড়ে আছে। বিক্রি-টিক্রি হলে ছবি পড়ে থাকত না, আর তিন মাসের ভাড়াও বাকি পড়ত না।

তা তিনি এখন কোথায়?

কে জানে মশাই! গত সাতদিন ধরে তার কোনো পাত্তা নেই। আরও দু-চারজন গত ক'দিন ধরে তার খোঁজ করে যাচ্ছে। কিন্তু ঘর বন্ধ। বাইরে তালা ঝুলছে।

আপনিই কি তাঁর বাড়িওয়ালা?

যে আজ্ঞে। তবে আমিও ছাপোষা মানুষ। ভাড়ার টাকায় আমার সংসার চলে। গোলমেলে ভাড়াটে কপালে জুটলে আমাদের বড্ড মুশকিল হয়।

তা তো বটেই।

বাড়ির হাল তো স্বচক্ষেই দেখছেন। পয়সার অভাবে সংস্কারও করাতে পারছি না।

চতুর্মুখ তাহলে একজন গোলমেলে লোক বলছেন আপনি?

উচিত কথা বলতে আমি ভয় পাই না। চতুর্মুখ অবশ্যই অতিশয় গোলমেলে লোক। চুপচাপ থাকে, কারও সঙ্গে বেশি কথা-টথা কয় না, কিন্তু প্রতি রাতে আকণ্ঠ মদ গিলে ফেরে। তারপর ঘরের দরজা বন্ধ করে বেসুরো গান গায়, আপনমনে বকবকও করে।

মাতালরা সাধারণত উৎপাত করে, চতুর্মুখও সেরকম করে কি? ধরুন গালিগালাজ করা বা অশ্লীল কথা-টথা বলা!

কান পেতে কে আর শুনতে গেছে বলুন। তবে খারাপ কথা কিছু কানে এলে বাড়ির মেয়েরা নালিশ করত।

উনি কি বিয়ে করেননি?

দেখুন, আমি ব্যাচেলারকে ঘরভাড়া দিই না। চতুর্মুখ তার বউকে নিয়েই ঘরভাড়া নিতে এসেছিল। তাও ধরুন বছর তিনেক আগে। প্রথম বছর বউ নিয়েই থাকত। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খিটিমিটি ছিল, প্রায়ই ঝগড়াও হত। তারপর বউ চলে গেল দেশের বাড়িতে।

বাপের বাড়িতে কি?

না। যতদূর শুনেছি বিষ্ণুপুরের কাছে চতুর্মুখের বাপ-মা থাকে। বউটিও সেখানেই থাকে। চতুর্মুখের সঙ্গে তার বাড়ির বনিবনা নেই।

আপনি বললেন, সাতদিন হল উনি বেপাত্তা। উনি কি মাঝে মাঝেই এরকম বেপাত্তা হয়ে যান?

তা যায়। কোথায় যায় তা তো আর বলে যায় না। আমিও জিজ্ঞেস করতে যাই না।

আপনার দোতলাটা তো বেশ বড়। চতুর্মুখ কি গোটা দোতলা নিয়ে থাকেন?

পাগল নাকি? দোতলায় আমি থাকি। তিনতলায় খানিকটা কনস্ট্রাকশন হয়েছিল। কিন্তু টাকার অভাবে শেষ করতে পারিনি। আধাখ্যাঁচড়া হয়ে পড়ে আছে। একখানা ঘরের ছাদ ঢালাই হয়েছিল মোটে। সেটাতেই চতুর্মুখ থাকে। দেয়ালে প্লাস্টার নেই, জলছাদ হয়নি, তবে ওসব নিয়ে চতুর্মুখ তেমন মাথা ঘামায় না।

তাহলে ভাড়াটে হিসেব চতুর্মুখ ভালই বলছেন?

শোনো কথা! তাই বললুম নাকি মশাই? ভাল ভাড়াটে হওয়ার প্রথম শর্তই হল নিয়মিত ভাড়া মেটানো। তা না হলে তাকে ভাল বলি কী করে? তার ওপর মদ্যপ এবং...

এবং কী?

আর কিছু নয়।

তার কাছে ছবির কাস্টমাররা আসে না?

তা আসে-টাসে বোধহয়। কাস্টমার কিনা জানি না। তবে বেশ ভদ্র এবং অভিজাত চেহারার লোকজন ইদানীং আসছে দেখছি। তাদের অন্য মতলবও থাকতে পারে। কাগজ বা চটে মোড়া ছবিও দু-চারখানা নিয়ে যেতে দেখেছি অবশ্য। চতুর্মুখের সঙ্গে আপনার প্রয়োজনটা কী বলুন তো!

আমি চতুর্মুখকে একখানা ছবি আঁকার বরাত দিয়েছিলাম। আমার দাদুর একটা পোর্ট্রেট। ইন্টারনেটে দেখে তার সম্পর্কে একটা ধারণা হয়েছিল যে, পোর্ট্রেটের হাত বেশ ভাল। ফোনে যোগাযোগ করে দরদামও ঠিক হয়। ছবির জন্য বেশ মোটা টাকা অগ্রিমও দেওয়া হয়েছিল। তিন মাস আগেই ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দেয়নি। তবে মাসখানেক আগে উনি জানিয়েছিলেন যে, ছবি শেষ হয়েছে। পরশু আমি দুবাই থেকে ফিরেছি। বারকয়েক টেলিফোন করে দেখেছি, ফোন নো রিপ্লাই। রিং হচ্ছে, কেউ ধরছে না।

হুঁঃ। আমার মেয়ে বলছিল, ওপরের ঘরে মাঝে মাঝে ফোনের রিংটোন শোনা যাচ্ছে। এমন হতে পারে যে, চতুর্মুখ তাড়াহুড়োয় তার মোবাইল ঘরেই ফেলে রেখে গেছে।

খুব ভুলো মনের মানুষ নাকি?

তা বোধহয় একটু আছে। কীসব চিন্তা-টিন্তা করে বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে এমনভাবে তাকায় যেন চিনতে পারছে না।

তাহলে তো মুশকিল হল মশাই!

তা হল। বরং ক'দিন পরে আসুন, ততদিনে যদি ফেরে।

আমি কাজের লোক। দেশে বসে থাকতে আসিনি। আগামী পরশুদিনই আমার জাপানে যাওয়ার কথা। সেখান থেকে অস্ট্রেলিয়া এবং তারপর আমেরিকা। চতুর্মুখের জন্য অপেক্ষা করার সময় নেই।

ওরে বাবা, আপনি তো দেখছি গ্লোবট্রটার। সবসময়ে ঘুরে বেড়াতে হয় নাকি?

তা হয়। দুবাইতে আমার বিশেষ ধরনের সফটওয়্যার ডেভেলপ করার ব্যবসা আছে। কনসালটেন্ট হিসেবে আমার নানা জায়গা থেকে ডাক আসে। আমি সত্যিই বড্ড ব্যস্ত মানুষ। কাল আরও একবার খোঁজ নিয়ে দেখব। যদি চতুর্মুখকে পাওয়া যায় তো ভাল। নইলে ধরে নেবো অ্যাডভান্সের টাকাটা জলে গেছে।

অ্যাডভান্স কত নিয়েছিল?

এক লাখ।

বাপ রে! টাকাটা তো সোজা নয়!

আজকাল আর্টিস্টদের কদর বেড়েছে মশাই।

শুনুন, আপনার নাম-ধাম আর টেলিফোন নম্বরটা রেখে যান। চতুর্মুখ যদি এসে যায় তাহলে আমিই আপনাকে খবর দিয়ে দেবো।

এই যে আমার কার্ড। আপনি আমাকে বাঁচালেন। কালকের দিনটা আমি ভয়ংকর ব্যস্ত থাকবো। চতুর্মুখের পিছনে সময় দিলে ক্ষতি হয়ে যাবে। প্লিজ, খবরটা দেবেন কিন্তু।

নিশ্চিন্ত থাকুন। সারাদিন আমার বিশেষ কাজ নেই। চারদিকে নজর রাখাটাই কাজ। কার্ডে কলকাতার ঠিকানায় দেখছি, আপনি কাছেই থাকেন, বালিগঞ্জে।

হ্যাঁ, আমার পৈতৃক বাড়ি।

বাবা-মা আছেন?

আছেন। ঠাকুর্দার পোর্ট্রেট করানোর আগ্রহ আমার বাবারই বেশি। কিন্তু তিনি আমার চেয়েও ব্যস্ত লোক। দু'দুটো কোম্পানি সামলাতে হয়।

আপনি তো দেখছি ঘ্যামা লোক! চতুর্মুখের মতো হাড়হাভাতের সঙ্গে জুটলেন কী করে সেটাই মাথায় আসছে না।

আমি ঘ্যামা লোক-টোক নই। খেটে-খাওয়া মানুষ। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে আর চরকিবাজি করে পয়সা রোজগার করতে হয়। আর পয়সা আমাদের কাছে বাবুগিরি করার জন্য নয়। নতুন ইনভেস্টমেন্ট তৈরি করার জন্য।

সে তো ঠিকই।

চতুর্মুখের খবর পেয়েছিলাম ইন্টারনেটে। তার কিছু পোর্ট্রেট আপলোড করা ছিল। ভালই আঁকে। আমার এক বন্ধুও ওকে রেকমেন্ড করেছিল আমার কাছে। সে যাই হোক, আমার কাছে যা ইনফর্মেশন আছে তাতে চতুর্মুখকে খুব একটা এলেবেলে বা ধাপ্পাবাজ বলে মনে করার কারণ ছিল না। আমার বন্ধুর গুরুদেবের বেশ কয়েকটা অয়েল পেন্টিং ওদের আশ্রম থেকেই চতুর্মুখকে দিয়ে করানো হয়েছিল। কাজেই লোকটাকে অবিশ্বাস করবো কী করে বলুন!

অলকবাবু, আমার স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে আমি আর্টের তেমন সমঝদার নই। চতুর্মুখ কী দরের আর্টিস্ট তা আমি সত্যিই জানি না। হাবভাব দেখে লোকটাকে আমার তেমন সুবিধের মনে হয় না, এই যা। তার ওপর ধরুন, ভাড়ার টাকাটাও বাকি ফেলে রাখে বলে আমি ওকে তেমন সুনজরে দেখি না। তবে আপনার মতো লোক যখন ওর কাস্টমার তখন চতুর্মুখ হয়তো তেমন খারাপ আর্টিস্ট নয়। ঠিক আছে, কথা দিচ্ছি, ওর খবর পেলেই আপনাকে জানাবো।

অনেক ধন্যবাদ।

অলক হাতজোড় করে একটা বিনম্র নমস্কার জানিয়ে বাড়ির উঠোন থেকে বাইরে বেরিয়ে এল। পাড়াটা মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্তদের পাড়া। বাড়িঘর বড্ড ঘিঞ্জি। খোলা ড্রেন এবং সরু রাস্তা। অবিরল লোকের যাতায়াত। এবং বেশির ভাগ লোকই তেমন ভদ্রস্থ চেহারার নয়।

বাইরে অলকের দামি বি এম ডবলিউ গাড়িটা দাঁড় করানো ছিল। এখন সেটা নেই। অত দামি গাড়ি নিয়ে এ পাড়ায় আসার ইচ্ছে ছিল না তার। কিন্তু তাদের ইন্ডিকা গাড়িটা আজ সার্ভিসিং-এ গেছে বলে বাধ্য হয়ে বি এম ডবলিউটা নিয়ে এসেছিল। ভ্রূ কুঁচকে সে বিরক্ত মুখে মোবাইলে ড্রাইভারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে যাচ্ছিল। ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে একটা কে মেয়ে যেন বলে উঠল, আপনার গাড়িটা ড্রাইভার

বড় রাস্তায় নিয়ে গিয়ে পার্ক করেছে। গলিটা আটকে যাচ্ছিল বলে আমিই ওকে গাড়িটা সরিয়ে নিতে বলেছি।

অলক ফিরে দেখল, ফ্রক পরা একটা ছিপছিপে মেয়ে। চৌদ্দো-পনেরোর বেশি বয়স নয়। মুখখানায় খুব বুদ্ধির ছাপ।

অলক রেগে গেল না, তবে বিরক্ত হল। বলল, ও। আচ্ছা, ঠিক আছে।

আপনার সঙ্গে আর একটা কথা ছিল। আপনি আমার বাবার সঙ্গে যখন কথা বলছিলেন, তখন আমি উঠোনে কাপড় শুকোতে দিচ্ছিলাম। কথাগুলো কানে আসছিল।

অলক একটু অবাক হয়ে বলল, তাই বুঝি? ঠিক আছে, বলো।

চতুর্মুখবাবু সম্পর্কে আমার বাবা তেমন কিছু জানে না। বাবা শুধু ওকে ডিফল্টার হিসেবে জানে। বাবার দোষ নেই। বাড়ি ভাড়ার টাকায় আমাদের সংসার চলে কিনা।

বুঝলাম, কিন্তু চতুর্মুখ সম্পর্কে তুমি কী জানো?

মেয়েটা টুক করে একটু হাসল। এত সুন্দর ঝকঝকে দাঁত আর এত চমৎকার দাঁতের সেটিং আর দেখেনি অলক। মেয়েটা হেসে বলল, অনেক কিছু। আমি একটু-আধটু আঁকতেও পারি তো, তাই চতুর্মুখদার কাছে মাঝে মাঝে আঁকা শিখি। ঠিক শেখান না, উনি আঁকেন আর আমি আঁকাটি দেখি। আর তাইতেই অনেক কিছু শিখেছি।

অলক বিরক্তি চেপে বলে, তা তো বুঝলাম। কিন্তু—

মেয়েটা কথার মাঝখানেই বলল, উনি এখানে নেই, কিন্তু সেন্ট্রাল পার্কে ওঁর একটা স্টুডিয়ো আছে। আমার মনে হয় উনি সেখানে আছেন।

ঠিকানাটা জানো?

না। শুনেছি, বাড়ির একতলায় একটা বাচ্চাদের স্কুল আছে। আর কিছু জানি না। ও হ্যাঁ, স্কুলটার নাম টিনি স্টারস।

সেখানে গেলে কি এখন ওকে পাবো?

ফোন করে দেখুন না।

সে তো কতবার করেছি। ফোন নো রিপ্লাই।

মেয়েটা ফের হাসল। বলল, উনি কুঁড়ে লোক। অনেকের কাছ থেকে টাকা অ্যাডভান্স নিয়ে বসে আছেন, কিন্তু মুড না হলে আঁকতে চান না। তাগাদার ভয়ে উনি ওঁর মোবাইলটা এখানেই ফেলে রেখে গেছেন। আমি তো প্রায় সবসময়েই ওঁর বন্ধ ঘর থেকে ফোনের আওয়াজ পাই।

তাহলে ফোন করে কি হবে?

আর একটা নম্বর আছে। দিচ্ছি। প্লিজ, নম্বরটা যে আমি দিয়েছি তা বলবেন না। কারণ, নম্বরটা উনি আমাকে দেননি। সিম কার্ডের কভারটা ফেলে দিয়েছিলেন। আমি সেটা পেয়ে নম্বরটা চুরি করেছি।

এবার অলক হাসল। বলল, ভেরি গুড। দাও, দেখি লোকটার হদিশ পাই কিনা।

নম্বরটা ডায়াল করতেই একটা বিরক্ত গলা বলে উঠল কে? কে বিরক্ত করছেন?

অলক বেশ ভদ্র গলাতেই নিজের পরিচয় দিল। তারপর বলল, আমি আপনার বাসায় এসে খোঁজ নিয়ে জানলাম, আপনি সাতদিন হল বাড়িতে নেই।

চতুর্মুখ একটু থতমত খেয়ে বলল, ওঃ, অলকবাবু! ভেরি সরি, আসলে আমি একটু ফ্যাসাদে পড়ে গেছি। আপনার দাদুর ছবিটা প্রায় এইট্টি পারসেন্ট হয়ে গেছে। কয়েকদিনের কাজ বাকি।

আপনার ডেট কিন্তু অনেকদিন পার হয়ে গেছে।

এবারেই শেষ করে দেবো। আর দশটা দিন। বাই দি বাই, আমার পুরোনো মোবাইল তো আমি ঘরে ফেলে এসেছি ভুল করে। এ নম্বর আপনি কোথায় পেলেন?

নম্বর? সে তো কত ভাবেই পাওয়া যায়।

আমি সত্যিই খুব অবাক হয়েছি।

মেয়েটা বিবর্ণ মুখে তার দিকে চেয়ে বলতে নিষেধ করছিল আকারে-ইংগিতে। অলক বলল, আমি নম্বর-টম্বর জানি না। আমি আপনার পুরোনো নম্বরেই ফোন করেছি। সম্ভবত আপনার ফোনে কল ডাইভার্ট করা ছিল।

তাই? আমি আনমনা মানুষ, মোবাইল ফোন বিষয়ে তেমন কিছু জানিও না। হতে পারে কল ডাইভার্টটা অ্যাকটিভ ছিল। ফোনটার চার্জ শেষ হয়ে যাওয়াতে কলটা ডাইভার্টেড হয়েছে।

এই তো বুঝেছেন। আমি মাত্র চার-পাঁচদিনের জন্য এখানে এসেছি। পরশু জাপান যাওয়ার কথা। ছবিটার প্রোগ্রেস কি দেখানো সম্ভব? বাবা একটু টেনশনে আছেন।

কোনো ইমার্জেন্সি আছে স্যার?

আছে। আর দু'মাস পরে দাদুর জন্মদিন। ওইদিন দাদুর নামে একটা ইনস্টিটিউটের উদ্বোধন হবে। সেটা রাজ্যের সবচেয়ে বড় ইনজিনিয়ারিং কলেজ। ছবিটা সেই কারণেই তাড়াতাড়ি দরকার।

দু'মাস তো অনেকটা সময় স্যার। আমি তো মাত্র দশ দিন সময় চাইছি।

আমরা বড় আর্টিস্টদের কাছে কেন যাইনি জানেন? টাকার জন্য নয়। বড় শিল্পীরা সময় বেশি নেন। আমাদের সময় খুব বেশি ছিল না। আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল দু'মাসের মধ্যে এঁকে দেবেন।

জানি স্যার। তবে ছবি জিনিসটাই একটু মুড-নির্ভর।

আমার বাবাও মুড-নির্ভর। আনপ্রফেশনাল অ্যাটিচুড সহ্য করতে পারেন না। উনি ছবিটার প্রোগ্রেস জানতে চান। অজানা-অচেনা আর্টিস্টকে কাজটা দেওয়ায় উনি আমার ওপর খুব বিরক্ত। এই বয়সেও আমাকে ওঁর বকুনি খেতে হচ্ছে।

বুঝতে পারছি স্যার। আপনার প্রবলেমটাও আমার দেখা উচিত। কিন্তু স্যার, ছবিটা আমার বাসাতেই রয়েছে, কিন্তু আমি যে সেখানে ফিরে যেতে পারছি না।

কেন? এনি প্রবলেম?

হ্যাঁ স্যার। ফোনে সব বলা সম্ভব নয়।

ছবিটা যদি এখানেই থেকে থাকে তাহলে সেটা কি একবার দেখা সম্ভব?

না স্যার। বাড়িওয়ালা আপনাকে ঢুকতে দেবেন না।

কী যে মুশকিলে ফেললেন মশাই। এনিওয়ে আমার তো কিছু করার নেই দেখছি। তাহলে আমরা অন্য আর্টিস্টের সঙ্গেই বরং যোগাযোগ করছি।

চতুর্মুখের আর্তনাদ শোনা গেল, না স্যার, ওটা করবেন না। বরং আমি লাইফ রিস্ক নিয়েও বাসায় ফিরে ছবিটা শেষ করব। জাস্ট দুটো-তিনটে দিন সময়! প্লিজ স্যার!

অলক বলল, আমার ই-মেল অ্যাড্রেস তো আপনার জানাই আছে। যদি ছবি শেষ হয় তাহলে এই সপ্তাহেই খবরটা আমাকে মেল করবেন, উইথ এ ফটোগ্রাফ অফ দি পেইন্টিং।

প্রমিস স্যার।

ফোন বন্ধ করতেই মেয়েটা ফের খুক করে তার মার্কামারা হাসিটা হাসল। তারপর খুব ভালমানুষের মতো বলল, আপনি কী ভাল মিথ্যে কথা বলতে পারেন! বাববা! আমার চেয়েও ভাল।

অলকের ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর হতে গিয়েও হঠাৎ হেসে ফেলল। মেয়েটা ফিচেল বটে, কিন্তু বেশ মজার মেয়ে। সে বলল, মিথ্যেটা তো তোমাকে বাঁচাতে গিয়েই বলতে হল।

থ্যাংক ইউ। একটা কথা বলব?

বলো।

আমার কাছে চতুর্মুখবাবুর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি আছে।

বলো কী? তুমি পেলে কীভাবে?

সে সব বলা যাবে না। চাবি আছে, আপনাকে আমি চুরি করে ঘরে ঢোকাতে পারি।

কিন্তু বাড়ির লোক বা তোমার বাবা রাগ করবেন না?

টের পেলে তো! আমার অনেক অন্ধিসন্ধি জানা আছে।

বাঃ বেশ! অ্যাডভেঞ্চার আমার খারাপ লাগে না, আর লোকটা মিথ্যে কথা বলছে কিনা সেটাও জানা দরকার। এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছে, টাকাটা হয়তো জলেই গেল।

আমার সঙ্গে আসুন।

বাড়িটার শ্রী-ছাঁদ বা স্থাপত্য নেই বটে, কিন্তু বেশ বড় পরিসরের বাড়ি। অনেকটা জায়গা জুড়ে উঠোন, পিছন দিকেও জায়গা আছে। মাঝমধ্যিখানে আধখ্যাঁচড়া বাড়ি। অলকের হিসেবমতো বাড়িটা প্রায় ছয়-সাত কাঠা জমি নিয়ে।

পাড়াটা হয়তো অভিজাত নয়, কিন্তু কলকাতার যে কোনো জায়গাতেই এতটা জমি খুব কম কথা নয়। সবটাই একটা মজবুত দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

উঠোনে তারে এবং দড়িতে কাপড় শুকোচ্ছে মেলা, বাঁ দিকে একটা টিউবওয়েলের চাতালে চার-পাঁচজনের ভিড়। ঝপাং ঝপাং শব্দ হচ্ছে টিউবওয়েলের। উঠোনে কয়েকটা বাচ্চা বল নিয়ে খেলছে।

তোমাদের ক'ঘর ভাড়াটে?

ছয় ঘর। সেজন্যই এ বাড়িতে থাকতে আমার ভাল লাগে না। একটুও প্রাইভেসি নেই।

কথাটা ঠিক। প্রাইভেসির একটু সমস্যা আছে বটে। তোমার নামটা এখনও জানা হয়নি, বলবে?

আমি টুসি। আমার কিন্তু আর ভাল নাম নেই। একটাই নাম।

খারাপ কী? বেশ নাম।

কোন ক্লাসে পড়ি জিজ্ঞেস করবেন না? সবাই করে।

অলক হেসে ফেলল, তারপর বলল, তুমি যে খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে সেটা বুঝতে পেরে গেছি। বুদ্ধি জিনিসটাই মানুষের মস্ত অ্যাসেট। পড়াশুনো তো লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে করছে, তাতে কিছু হচ্ছে কি?

আপনারও খুব বুদ্ধি, না?

কী করে বুঝলে?

চোখ-মুখ দেখেই বোঝা যায়। তার ওপর সফটওয়্যার ইনজিনিয়ার, সোজা কথা তো নয়!

সফটওয়্যার ইনজিনিয়ারও আসলে একজন মিস্তিরি ছাড়া কিছু নয়।

থাক, আর বিনয় করতে হবে না। আমিও বি সি এ পড়ি, ওসব জানি।

বাপ রে! বি সি এ? দেখে তো মনে হয়—

ক্লাস এইট তো? সবাই তাই বলে।

সংকীর্ণ সিঁড়ি বেয়ে মেয়েটার পিছু পিছু তিনতলায় নির্বিঘ্নে উঠে এল অলক। তিনতলায় খানিকটা খোলা ছাদ, খানিকটা ছাদ ঢালাই হয়ে আছে। তার মধ্যেই পলেস্তারাহীন দেয়াল তুলে একটা বড়সড় ঘর। বাকিটা খোলা। বেশ হাওয়া-বাতাস আর রোদ রয়েছে।

ঢালাইয়ের ফাঁকা দিকটায় এখনও কাঠের তক্তা, বালি আর ইটের পাঁজা পড়ে আছে।

একটু দাঁড়ান! বলে তাকে দাঁড় করিয়ে রেখে টুসি টুক করে ইটের পাঁজার আড়ালে চলে গেল। তারপর তার গুপ্ত জায়গা থেকে একটা পাটের দড়িতে বাঁধা চাবি নিয়ে এসে দরজার তালাটা খুলে বলল, আসুন।

হ্যাঁ টুসি, শেষে চোর দায়ে ধরা পড়ে মারধর খেতে হবে না তো!

আবার সেই অপরূপ দাঁতের হাসি। বলল, কোনো ভয় নেই। আমি তো আছি।

তোমাকে কী বলে যে কৃতজ্ঞতা জানাবো! আমি অবশ্য এখনও বুঝতে পারছি না, আমার জন্য তুমি এতটা করলে কেন। আমার নামটাও তো তুমি জানো না।

আপনার নাম অলক।
আরে! কী করে জানলে?
আপনি ভুলে গেছেন, আপনি এসেই তো বাবার কাছে আপনার পরিচয় দিয়েছিলেন।
হ্যাঁ, তাই তো বটে!
আর আপনার মুখটা দেখে কেন যেন আমার ভারী মায়া হয়েছিল। কী মনে হয়েছিল জানেন? শুনলে আপনার কিন্তু রাগ হবে।
না না, আমার অত রাগ হয় না।
হয়। আপনি চট করে রেগে যান, কিন্তু রেগে থিতু করতে পারেন না। হেল্পলেস ফিল করেন।
তুমি কি সত্যিই বি সি এ পড়ো? নাকি সাইকোলজি?
হিঃ হিঃ। বি সি এ-ই পড়ি মশাই। কিন্তু ভীতু আর ভালমানুষ লোকদের আমি খুব চিনি। সফটওয়্যার উইজার্ড হলে কী হবে, আপনি আসলে ভীষণ ইমপ্র্যাকটিক্যাল টাইপের।
কথাটা মোটেই ঠিক নয়।
ঠিক নয়?
না, মানে হান্ড্রেড পারসেন্ট নয়।
এই তো, একটা নিরীহ প্রশ্নেই কেমন ঘাবড়ে গেছেন! চোখ দুটো জুলজুল করছে। শুধু ইমপ্র্যাকটিক্যাল নয় বেশ ইমম্যাচিওরড।
অলক স্মিত একটু হেসে বলল, তুমি বেশ একটা মেয়ে। যতদূর ভেবেছিলাম তার চাইতেও চালাক।
ঘরের ভিতরটা একরকম শৃংখলাহীন। একধারে একটা ডবল বেড খাট, একটা আলনা, ড্রেসিং টেবিল ছাড়া বাকিটা ক্যানভাস, প্যালেট, ইজেলের ছড়াছড়ি।
তুমি এই ঘরে মাঝে মাঝে হানা দাও বুঝি?
না। আগে চতুরদার ছবি আঁকার সময়ে আসতাম। কিন্তু একদিন টের পেলাম, আমি এলে উনি খুশি হন না।
কেন?
আমার দিদি এলে খুশি হন।
অবাক হয়ে অলক বলে, কেন, দিদি এলে খুশি হন কেন?
ফের বোকা-বোকা প্রশ্ন? বলে সেই মনোহরণ হাসি টুসির। এলোমেলো চুল একটু গোছাতে গোছাতে বলল, এত বোকা হলে চলে? দিদি এলে খুশি হন কেন এ তো বাচ্চারাও আজকাল বোঝে।
আমিও হয়তো বুঝলাম। কিন্তু উনি তো বিবাহিত।
হ্যাঁ। কিন্তু একে আর্টিস্ট, তার ওপর বউ দেশে। বুঝতেই তো পারছেন।
তুমি বেশ এঁচোড়ে পাকা।
যদি পাকা হয়েই থাকি তবে আর এঁচোড়ে নই মশাই। পাকবার বয়স হওয়ার পরই পেকেছি। এখন ওই গাদা গাদা ছবির মধ্যে আপনার দাদুকে খুঁজুন তো!
মোট চারটে ইজেলে ক্যানভাস মাউন্ট করা ছিল। তিনটে ঢাকনা দেওয়া। তারই একটার ঢাকনা খুলতেই ছবিটা ঝকঝক করে উঠল।
অলক মুগ্ধ হয়ে ছবিটা দেখছিল। চতুর্মুখের নামডাক না থাক, ছবি আঁকার সিদ্ধ হাত যে তার আছে তাতে সন্দেহ নেই। অলক ভুল লোককে নির্বাচন করেনি।
ছবিটা ঝুঁকে দেখতে দেখতে টুসি বলল, কেমন হয়েছে?
পাশে তাকাতে গিয়ে টুসির শ্বাস তার গালে পড়ল, এত কাছাকাছি ওর মুখ। অলক সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল, দারুণ।

ছবিটা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। চোখ, চুল, গলার ভাঁজ, ব্যাকগ্রাউন্ড টাচ আপ করা বাকি। অন্তত পাঁচ-ছয় দিনের কাজ।

তুমি তো ছবি খুব ভাল বোঝো!

আমি আপনার দাদুর ছবি দেখিনি। ফটোটা দেখতে পেলে ছবিটা সম্পর্কে বলা সহজ হত। অনেক সময়ে হয় কি, মুখটা ঠিকঠাক আঁকা হল, কিন্তু কেমন যেন প্রাণটা এল না। ছবি অবিকল, কিন্তু নিষ্প্রাণ। ভাল আর্টিস্ট সে-ই যে ছবিটাকে প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে।

দাদুর ছবিটা কি তোমার নিষ্প্রাণ লাগছে?

আপনার লাগছে না?

আমি তো ঠিক সমঝদার নই!

নিষ্প্রাণ না হলেও, ছবিটার মধ্যে একটা মিসিং কিছু আছে। মনে হয় চোখ দুটোয় কিছু টাচ আপ করলেই ম্যাজিকটা ঘটবে। এখন চোখ দুটোকে মনে হচ্ছে পাথরের চোখ। কোনো গ্লিন্ট বা এক্সপ্রেশন নেই।

বাপ রে! তুমি তো দারুণ সমঝদার!

ভাল করে দেখুন, আপনিও বুঝতে পারবেন।

তোমার কি মনে হয় চতুর্মুখ ভাল আর্টিস্ট?

খারাপ নন। তবে মুডি। তাড়াহুড়ো করলেই মুশকিল।

যাই হোক, ছবিটা আমার খারাপ লাগছে না। ফিনিশিং-এর পর ভালই হবে, কি বলো?

হুঁ। চা খাবেন?

চা? এখানে?

আপনি বসুন। আমি চা আনছি।

আরে! ওসব ঝামেলা করার দরকার কী?

আমি একটু খ্যাপা আছি। এক এক সময়ে এক এক মুডে থাকি। আজ আমার খুব আড্ডা দেওয়ার মুড। আর চা খাওয়ালে আপনি হয়তো আরও দশ-পনেরো মিনিট থেকে যাবেন।

হেসে মাথা নেড়ে অলক বলে, আমি একদম ভাল আড্ডাবাজ নই। গোমড়ামুখো কেজো মানুষ।

সেটা দেখলেই বোঝা যায়। একটু বোকাও আছেন। চুপ করে বসুন, চা নিয়ে আসছি।

অগত্যা দাদুর ছবিটার মুখোমুখি একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রইল অলক। দামি মোবাইলে পোর্ট্রেটটার বেশ কয়েকটা ছবি তুলে নিল সে। ঘরে বেশ ধুলো পড়েছে। ছবিটা বাঁচানোর জন্য সে ছবির ঢাকনাটা ভাল করে ঝেড়ে ছবিটা ঢাকা দিল।

পিছনে একটা শব্দ শুনে টুসি এসেছে ভেবে ফিরে তাকিয়ে একটু অবাক হল অলক। টুসি নয়, চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়সি একটি মেয়ে। চুল এলোমেলো, পরনে নাইটি। বলল, আপনি কে? এখানে কী করছেন?

টুসির মুখের সুস্পষ্ট আদল দেখে অলক আন্দাজ করল, এই সেই দিদি যে এলে চতুর্মুখ খুশি হয়। খুশি হওয়ারই কথা, মেয়েটি বেশ সুন্দরী।

অলক বিনীতভাবেই বলল, আমি একজন কাস্টমার বলেই ধরে নিন।

কিন্তু ঘর তো বন্ধ ছিল! ঢুকলেন কীভাবে?

সত্যি কথাটা বলতেই পারত অলক, কিন্তু ভাবল, তাতে টুসি হয়তো বিপদে পড়তে পারে। তাই সে খুব অবাক হয়ে বলল, কিন্তু আমি তো আমার দাদুর ছবির খোঁজ করতে এসে ঘরটা খোলাই পেলাম।

মেয়েটা ভ্রূ কুঁচকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, খোলা ছিল?

অবশ্যই।

সেটা কী করে সম্ভব? ও তো আসেনি, তাহলে ঘর খুলল কে?

আবার অবাক হওয়ার ভান করে অলক বলল, কেন, চতুর্মুখবাবু কি বাড়িতে নেই? আমি তো ভাবলাম হয়তো বাথরুমে গেছেন। তাই বসে আছি।

না। উনি আউট অফ স্টেশন।

আপনি কি ওঁর কেউ হন?

না। আমি এ বাড়িতে থাকি।

দেখুন, আমি বিদেশে থাকি। পরশুই চলে যাবো। আমার দাদুর একটা ছবি আঁকবার বরাত দিয়েছিলাম চতুর্মুখবাবুকে। দু'মাস আগে দেওয়ার কথা ছিল। ছবিটা আমাদের ইমিডিয়েটলি দরকার।

মেয়েটা ঠোঁট উলটে বলল, ওসব শুনে আমার কী দরকার! আমি তো আর ওর সেক্রেটারি নই। হঠাৎ ছাদে এসে ঘর খোলা দেখে খোঁজ নিতে এসেছি।

আমি চোর-টোর নই। জেনুইন একজন বায়ার।

মেয়েটা বিরক্ত হলেও কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। দোনোমোনো করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ বলল, একজন ফ্রক পরা মেয়ে আপনাকে এ ঘরে নিয়ে আসেনি তো?

আর মিথ্যে বলা উচিত হবে কিনা বুঝতে না পেরে অলক বলল, হ্যাঁ, চতুর্মুখের ঘরের খোঁজ করতেই একজন ফ্রক পরা মেয়েই আমাকে ঘরটা দেখিয়ে দেয়।

বুঝেছি। এটা টুসির কাজ।

তা হবে। তবে আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু।

ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন। ওর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে নিয়ে তবে আসবেন।

উনি টেলিফোন রিসিভ করছেন না। কী করা যায় বলবেন? উনি এক লাখ টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছেন। ছবিটা আমাদের খুব তাড়াতাড়ি দরকার।

মেয়েটা ফের ভ্রূ কুঁচকে কী একটু ভেবে বলল, আমি তো বললাম যে আমি ওর সেক্রেটারি নই।

ওঁর সঙ্গে আমার একটা লিখিত চুক্তি হয়েছিল। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সময়মতো ছবির ডেলিভারি না পেলে ওঁকে অগ্রিম বাবদ নেওয়া টাকা ফেরত দিতে হবে। আমি কি তাহলে ওঁর বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশন নেবো?

সেটা আপনার ইচ্ছে। আমি কী বলব?

সেক্ষেত্রে বাড়িতে পুলিশ আসতে পারে।

মেয়েটাকে এবার একটু বিচলিত দেখাল। চোখে একটু শঙ্কাও কি! নিজের চুলগুলো সটান করার চেষ্টা করতে করতে বলল, পুলিশ! পুলিশ কেন আসবে? ঠিক আছে, আপনি একটু বসুন, আমি দেখছি ওর সঙ্গে যদি টেলিফোনে যোগাযোগ করা যায়। নম্বরটা হয়তো আমার বাবা জানে।

মেয়েটা চলে গেল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকল টুসি। মুখে হাসি, হাতে চায়ের কাপ। বলল, কী মিথ্যুক বাবা! আপনি দেখতে বোকাসোকা হলে কী হয়, যা সাজিয়ে-গুছিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারেন!

সব শুনেছো বুঝি আড়াল থেকে?

সব শোনা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। হেসে বাঁচি না।

চা-টা বেশ ভাল হয়েছে। তবে অলক চায়ের বিশেষ ভক্ত নয়। সে খায় কড়া কফি। কিন্তু ভিক্ষের চাল কাঁড়া-আকাঁড়া বিচার করলে তো চলবে না।

চা খেয়ে অলক উঠল। বলল, আজ চলি। তবে তোমার কথা আমার খুব মনে থাকবে। আমাকে তুমি অনেকটাই সাহায্য করেছো। ছবিটার প্রোগ্রেস জানা হল। শুধু একটা অনুরোধ, ছবিটা চতুর্মুখ যেন তাড়াতাড়ি শেষ করে দেয়।

টুসি মাথা নেড়ে বলল, পারবে না।

অবাক অলক বলে, কেন?

চতুর্মুখ এ বাড়িতে এলে নুটুর হাতে হয় খুন হবে, নয়তো মার খেয়ে হাসপাতালে যাবে।

নুটু কে?

সবই কি আপনার জানা দরকার? এখন পালান তো। দিদি আসছে।

পালাবো! পালাবো কেন? তোমার দিদি তো চতুর্মুখের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করে আমাকে খবরটা দেবে।

দিদি ওসব কিছুই করবে না। লাভও নেই। চতুর্মুখ এখন এ বাড়িতে এলে তার প্রাণসংশয়। আপনি একটা কাজ করবেন? এখন সকাল সাড়ে দশটা বাজে। ঠিক এগারোটায় আপনার গাড়িটা আমাদের বাড়ির মোড়ে নিয়ে আসুন।

মতলবটা কী?

আছে একটা। পারবেন?

অলক হেসে বলল, পারবো।

এখন কেটে পড়ুন। আর হ্যাঁ, ফোন নম্বরটা দিয়ে যান। আমার ফোনে একটা মিস কল মারুন তো। নম্বর হল, নাইন এইট সিক্স সিক্স...

মিস কল দিয়ে অলক বেরিয়ে এল। সিঁড়ি দিয়ে যখন নামছে তখন টুসির দিদি উঠে আসছিল। মুখোমুখি দেখা।

আপনি চলে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ। ভাবছি চতুর্মুখের বিরুদ্ধে লিগ্যাল অ্যাকশনই নেবো। লোকটা চুক্তিভঙ্গ করেছে।

মেয়েটা বলল, আর্টিস্টরা তো আর মিস্তিরি নয় যে সময়মতো কাজ তুলে দেবে।

ও কথাটা চুক্তিতে লেখা থাকলে ভাল হত। আপনি কি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?

বলেছি। কিছুদিন সময় চেয়েছে।

কত দিন?

মাসখানেক।

অত সময় দেওয়া সম্ভব নয়। ছবিটা একটা বিশেষ অকেশনে দরকার।

অন্তত দশ-পনেরো দিন সময় তো দিতে পারেন?

তার মধ্যে উনি পারবেন?

না পারলে আপনি লিগ্যাল অ্যাকশন নেবেন।

ঠিক আছে।

অলক নেমে এল। দাদুর ছবির সূত্রে যে এরকম একটা আধা রহস্যময় ঘটনার খোঁজ পাবে এটা ভাবেনি অলক।

টুসিদের গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে সেই মোড় থেকে রাস্তাটা খানিকটা চওড়া। ডানদিকে দু'মিনিট হাঁটলে বেশ বড়ো রাস্তা। তার গাড়িটা সেখানেই পার্ক করা ছিল।

কলকাতায় এখন হেমন্তকাল। আবহাওয়া মনোরম। ড্রাইভারকে গাড়িটা টুসিদের গলির মুখে মোড়ের মাথায় পার্ক করতে বলে অপেক্ষা করতে লাগল অলক। আশ্চর্যের বিষয় হল, আজকের সকালটা তার খারাপ লাগছে না।

আজ তার বেশ কয়েকটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। জাপান রওনা হওয়ার আগে বেশ কিছু কাজ সারতে হবে। হাতে সময় নেই। তবু এই যে অনেকটা সময় এ বাড়িতে সে কাটাল এবং এখনও যে অপেক্ষা করতে হবেই তাতে তার একটুও বিরক্তি আসছে না।

ঠিক এগারোটাতেই টুসি এল। হাতে কাগজে মোড়া বড় একটা ক্যানভাস।

।। দুই ।।

অলক অবাক হয়ে বলে, কী সর্বনাশ! ছবিটা নিয়ে এলে নাকি?

হ্যাঁ তো।

এ তো চুরি!

মোটেই নয়। ছবিটা আপনি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখুন।

কিন্তু তুমিই তো বললে ছবিটায় টাচ আপ করা বাকি।

বলেছি তো। কিন্তু এখানে পড়ে থাকলে জীবনেও কাজটা শেষ হবে না। আপনার বাড়িতে থাকলে হয়তো হবে। আমি চতুর্মুখকে বুঝিয়ে বলবো, যাতে আপনার বাড়িতে গিয়ে উনি কাজটা শেষ করে দিয়ে আসেন।

অলক মেয়েটার বুদ্ধি দেখে ভারী খুশি হয়ে বলল, তোমার মাথা খুব পরিষ্কার। কিন্তু চতুর্মুখের এত কী বিপদ বলো তো!

সেসব জেনে আপনার কী হবে শুনি?

প্রাণসংশয় শুনলে একটু টেনশন হয় তো!

চতুর্মুখ আপনার কে যে তার প্রাণসংশয় হলে আপনার টেনশন হবে? একজন প্রফেশনাল আর্টিস্ট ছাড়া তো কিছু নয়।

তুমি বেশ ঝগড়ুটে মেয়ে তো!

সবাই তাই বলে। ছবিটা কিন্তু ভাল হয়েছে। ফিনিশিং হলে সবাই প্রশংসা করবে। চতুর্মুখ লোক তেমন ভাল নয়, কিন্তু ছোটোখাটো জিনিয়াস।

লোক ভাল নয় বুঝি?

না। একদম ভাল নয়।

তোমাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না। ছবিটা উদ্ধার করে দিয়ে তুমি আমার ভীষণ উপকার করলে। টাকার জন্য নয়। কিন্তু হাতে সময় এত অল্প যে কোনো ভাল আর্টিস্টকে দিয়ে নতুন করে আঁকানোর উপায় নেই।

আপনার প্রবলেমটা আমি বুঝেছি।

তোমাকে একটা কমপ্লিমেন্ট দেবো?

সেটা আবার কী?

তোমার হাসিটা দারুণ। এত সুন্দর হাসি দেখিনি।

ভ্যাট। ওটাও সবাই বলে। নতুন কিছু মাথায় এল না?

না। তাহলে আসি?

আসুন গিয়ে।

অলকদের বাড়িটা বিরাট। তিনটে তলা মিলিয়ে অন্তত গোটা চৌদ্দো ঘর। এক আর দু'নম্বর তলায় দুটো পেল্লায় হলঘরও আছে। এত বড়ো বাড়িটায় থাকার মধ্যে থাকেন মা আর বাবা। আর বিস্তর কাজের লোক। অলকের একটা ভাই, আমেরিকার জর্জিয়ায় পড়তে গেছে। আর একটা বোন আছে অলকের। সে আপাতত বিবাহের সূত্রে ফিলিপিনসে, শিগগিরই অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবে।

একতলার একটেরে একটা ঘরে মস্ত টেবিলের ওপর ছবিটা শুইয়ে রেখে দিল অলক। কাজটা কতদূর সঙ্গত হল তা সে বুঝে উঠতে পারছে না। তবে অ্যাডভেঞ্চারটা করায় মন্দও লাগছে না। বাড়ির লোককে ছবিটা সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে ফের বেরিয়ে পড়ল সে। গাড়িতে উঠে চতুর্মুখকে ফোন করল। নো রিপ্লাই।

সারাদিন নানা ব্যস্ততায় আর ফোন করার কথা খেয়ালই হয়নি অলকের।

বিকেলে তাজ-এ বন্ধুদের ডিনারে গেলে সেখানেই হঠাৎ একটা ফোন এল।

আমি টুসি বলছি। আপনি কোথায় এখন?

তাজে। ডিনার পার্টিতে।

তাহলে কি খবরটা এখন আপনাকে দেওয়া উচিত হবে?
কী খবর টুসি?
চতুরদা হাসপাতালে।
মাই গড! কী হয়েছে?
উনি বোধহয় আপনার ফোন পেয়ে, কিংবা দিদির কাছে কোনো খবর পেয়ে তড়িঘড়ি এখানে আসছিলেন। রিস্ক নেওয়াটা ওর উচিত হয়নি।
তারপর?
ওই যা আপনাকে বলেছিলাম। নুটু ওকে স্ট্যাব করেছে।
সর্বনাশ! নুটু কি গুন্ডা?
বটেই তো। ভীষণ গুন্ডা।
চতুর্মুখের সঙ্গে তার খারাখারিটা কিসের?
কারণ আমার দিদি।
তার মানে?
নুটুকে দিদি তিন বছর আগে বিয়ে করেছিল। আমার ধারণা নুটু গুন্ডা বলেই করেছিল। আজকাল গুন্ডা-মস্তানদেরও ইমেজ হয়েছে, জানেন তো!
জানতাম না।
এখন তো আর বীরেরা জন্মায় না। তাদের বিকল্প হল মস্তান।
বুঝেছি। তুমি একটি বিচ্ছু।
ওটাও শুনে শুনে কান পচে গেছে। যাই হোক, নুটুকে ভালোবেসে দিদি পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে। ছ'মাসের মধ্যে হিপনোটিক স্পেলটা কেটে যায়। এক বছর পরে দিদি ফিরে আসে বাপের বাড়িতে।
তারপর?
আপনি বরং ডিনারটাই মন দিয়ে করুন। বাকিটা রাতে বলব। যদি অবশ্য বেশি ড্রিংক করে ঘুমিয়ে না পড়েন।
শোনো পাজি মেয়ে, সব যুবকই কিন্তু ড্রিংক করে না। আমরা অন্যরকম ট্র্যাডিশনে মানুষ।
গুড বয় বুঝি?
গুড বয় মানে কি নিন্দে নাকি?
হুঁ। আজকাল গুড বয়রা মেয়েদের দু'চোখের বিষ।
আহা, মেয়েদের সার্টিফিকেট চেয়েছেটা কে?
সব পুরুষ মানুষই মেয়েদের সার্টিফিকেট পছন্দ করে, অবশ্য গে হলে অন্য কথা।
তুমি একটি বিছুটি গাছ। আচ্ছা ঠিক আছে, রাতেই কথা হবে। রাত এগারোটায় ফোন করলে অসুবিধে আছে?
না। আমি চিলেকোঠায় একা থাকি। বন্ধুদের সঙ্গে রাত একটা-দেড়টা পর্যন্ত ফোনে আড্ডা দিই।
কথার মাঝখানেই ফোনটা হঠাৎ কেটে দিল টুসি। কারণটা আর অনুমানের চেষ্টা করল না অলক। কারণ কিছু একটা আছেই। বুদ্ধিমতী মেয়ে।
রাত বারোটা নাগাদ বাড়ি ফিরল অলক। সে পার্টি-টার্টি মোটেই পছন্দ করে না। পারতপক্ষে যায়ও না। কিন্তু আজকের কথা আলাদা। কলকাতার পুরোনো বন্ধুরা মিট করতে চাইছিল। তার বন্ধুরা বেশির ভাগই সফল পেশাদার। প্রত্যেকেই মোটা টাকা কামায়। সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে এবং আনুষঙ্গিক অতিচারও আছে। পার্টিতেই শুনল, তার বন্ধু শমীক গত মাসে তার বারো নম্বর গাড়িটা কিনেছে। শমীকের পরিবার

বলতে ওর বউ আর দুটো মেয়ে। বাবা-মা আছেন বটে, কিন্তু তাঁদেরও গাড়ির অভাব নেই। তবে বারোখানা গাড়ি দিয়ে ও কী করবে তা ভেবেই পায় না অলক।

টুসির ফোনটা এল রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ।

জেগে আছেন এখনও?

তোমার জন্যই জেগে আছি। তুমি বলেছিলে ফোন করবে। তাই। চতুর্মুখ কি বেঁচে আছে? আউট অফ ডেনজার?

আমি খুব ভাল জানি না। ডাক্তাররা নাকি বলেছে চান্স ফিফটি ফিফটি। নুটু ফেরার।

বড্ড বিজার সব ঘটনা। ভাবছি আমার জন্যই বেচারা চতুর্মুখ এই বিপদ ডেকে আনল কি না।

আপনি নিমিত্ত মাত্র। চতুর্মুখের দুর্দশা ও নিজেই ডেকে এনেছে।

নুটুর সঙ্গে তোমার দিদির কি ডিভোর্স হয়ে গেছে?

মামলা কোর্টে। নুটু ডিভোর্স দিতে চায় না। তা বলে মনে করবেন না যে, দিদিকে ও খুব ভালবাসে। ডিভোর্স দিতে চায় না প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। ওর সন্দেহ দিদি একাধিক মানুষের সঙ্গে প্রেম করছে। তাদের একজন চতুর্মুখ। তবে এসব জটিল ব্যাপার আপনার জানার কোনো দরকার নেই। আপনার প্রবলেম তো ছবিটা নিয়ে। জেনে রাখুন, চতুর্মুখের যা অবস্থা তাতে বেঁচে উঠলেও আগামী ছয় মাসের মধ্যে ছবিটা শেষ করতে পারবে না।

তা তো বুঝতেই পারছি। তাহলে কি ফিনিশিং-এর জন্য অন্য কোনো আর্টিস্টকে কন্ট্রাক্ট দেবো? তুমি তো বলছিলে খুব বেশি কাজ বাকি নেই।

বলেছিলাম। প্রথম কথা, কোনো ভালো আর্টিস্ট অন্য কারো আঁকা ছবি টাচ আপ করতে চাইবে না। ইগো প্রবলেম আছে। দ্বিতীয় কথা, ছবিটা টাচ আপ করতে গিয়ে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

তাহলে তো ব্যাপারটা জটিলতর হয়ে গেল।

না, হল না। একটা উপায় আছে। আপনি রাজি হলে।

কী উপায়?

আমার ওপর ভরসা করা।

তুমি আর্টিস্ট জোগাড় করবে? তাহলে তো খুব ভাল হয়।

আমি নিজেই ছবিটা ফিনিশ করবো।

তুমি! পারবে?

ওই যে বললাম, আপনাকে এটুকু রিস্ক নিতে হবে।

একটু দোনোমোনো করে অলক বলল, দেখ, আমার তো অলটারনেটিভ নেই। ছবি ভাল বুঝিও না। আমার কাছে তো ছবিটা দিব্যি লেগেছিল। তুমিই ধরিয়ে দিলে, ছবিটায় অনেক খামতি আছে। তার মানে, তুমি ছবি আমার চেয়ে অনেক ভাল বোঝো। ঠিক আছে, আমি তোমার ওপর ভরসা করতে রাজি।

থ্যাংক ইউ।

আরে থ্যাংক ইউ তুমি বলছো কেন? উপযাচক হয়ে তুমিই যে আমার উপকার করতে চাইছো তাতে আমারই কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। চতুর্মুখের সঙ্গে আমার আড়াই লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট হয়েছিল। পরে ও অবশ্য টাকাটা আরও বাড়িয়ে নিয়েছে। চার লাখ। তোমাকে আমি টাচ আপের জন্য কত দিতে পারি বলো তো!

কত দিতে চান?

ধরো আরও এক লাখ?

আপনার টাকা খুব বেশি হয়েছে, না? তা হবে নাই বা কেন? শুনতে পাই দুবাই-টুবাই যারা যায় তারাই নাকি রাতারাতি বড়োলোক হয়ে ওঠে!

দূর! আমি বড়োলোক নই, খেটে-খাওয়া মানুষ। টাকা রোজগার করার হ্যাপা কাকে বলে তা আমি জানি। তবে আমি একজন আদ্যন্ত প্রফেশনালও বটে। তুমি যে কাজটা করে দেবে তার তো একটা সম্মান দক্ষিণাও আছে!

বাপ রে! কী শক্ত শক্ত কথা! সম্মান দক্ষিণা! শুনুন মশাই, ছবি আঁকা শিখছি নিজের শখে, টাকা রোজগারের জন্য নয়। চতুর্মুখের কাজটা আমি শেষ করতে চাই, কারণ ছবিটা আমি বুঝতে পেরেছি। চতুর্মুখের আঁকার ধরনটা জানি বলেই বাকি কাজটা আমি হয়তো করে দিতে পারবো। ভয় পাবেন না। আমি প্রথমে যে রংটা দেবো তা তুলে ফেলা যাবে। যদি ফিনিশিং-এর পর ছবিটা আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে পার্মানেন্ট রং দেবো।

সে সব তুমি বুঝবে। কিন্তু তোমাকে পারিশ্রমিকও নিতেই হবে।

ভালবেসে কোনো কাজ করলে তার জন্য পারিশ্রমিক পাওনা হয় না।

অলক মৃদু হাসল। খুশিও হল। আজকাল এসব কথা ইয়ং জেনারেশনের মুখে তো শোনাই যায় না। মুখে বলল, কবে থেকে কাজ শুরু করবে?

ভাবছি কাল থেকে।

ক'টার সময় গাড়ি পাঠাবো?

গাড়ি! গাড়ি কেন পাঠাবেন?

বাঃ, আমাদের কাজ করে দেবে, গাড়ি তো পাঠানোই উচিত।

আপনি এত বোকা কেন বলুন তো!

কেন, বোকার মতো কী করলাম?

আমাদের এই গরিব পাড়ায় রোজ যদি একটা দামি গাড়ি এসে আমাকে নিয়ে যায় তাহলে লোকে কী বলবে বলুন তো! এ তো আর আপনাদের নির্বিকার বালিগঞ্জ নয়। সবাই সবার হাঁড়ির খোঁজ রাখে।

ওঃ, জীবনটা দেখছি বড়োই জটিল!

জীবন মোটেই জটিল নয়। যার বুদ্ধি নেই তার কাছে জটিল।

আমাকে ফের বোকা বললে তো!

বললাম তো! বোকাকে বোকা ছাড়া কী বলে?

বারবার বলতে থাকলে এরপর আমারও মনে হতে থাকবে যে আমি একজন হাফ উইট।

অতটা তো বলিনি। সে যাক, আমার যাতায়াত আর সম্মান দক্ষিণা নিয়ে দয়া করে ভাবা বন্ধ করুন। মনে রাখবেন যে ঘরটায় কাজ করবো সেটায় ন্যাচারাল লাইট থাকাটা জরুরি। আর আমি সকাল সাতটার মধ্যেই চলে যাবো, কারণ সে সময়টার আলো আমার পক্ষে সুবিধেজনক হবে।

নো প্রবলেম।

আপনার বাড়িতে কুকুর নেই তো! কুকুরকে আমি ভীষণ ভয় পাই।

ছিল একটা। ডোবারম্যান। সেটা মরে যাওয়ায় আর কোনো কুকুর আনা হয়নি। আমাদের বাড়ি বেশ নিরাপদ। সারাদিন বাড়িতে থাকে আমার মা। আর মা খুব অ্যাকটিভ। সারাদিন সারা বাড়ি আর বাগান ঘুরে সব আগলে রাখে। দারোয়ান, ড্রাইভার আর মালি ছাড়া বাড়িতে সব কাজের লোকই মহিলা।

ভাল। আপনি তো পরশু জাপান চলে যাবেন।

হ্যাঁ। সেইরকমই তো প্রোগ্রাম হয়ে আছে। তবে আমার অ্যাবসেন্সে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। আমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবো।

জানি। ঠিক আছে, কাল সকালে দেখা হবে। গুড নাইট।

নাইট।

শুয়ে অলকের আজ ঘুম তো হলই না। বরং মনে হল, ঘুম কয়েক হাজার মাইল দূরে বসে আছে। অথচ তার ঘুম এমনিতে খুব সাধা। সারাদিন কাজকর্ম করার পর বিছানায় শরীর ঢেলে দিতেই ঘুম চেপে ধরে।

আজ দাদুর ছবি, চতুর্মুখ, টুসি, টুসির দিদি এবং ঘটনাবলি এত নাটকীয় পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে তাকে যে ঘুমের চটকাটাই উধাও হয়েছে। উঠে বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার ছেড়ে অনেকক্ষণ জলের নীচে দাঁড়িয়ে রইল সে। এখন রাতে একটু হিম ভাব বাতাসে। ঠান্ডা জলে তার বেশ শীত করছিল। প্রায় কাঁপুনি উঠে যাওয়ার পর গা-মাথা মুছে বিছানায় এল সে।

ঘুম এল বটে, কিন্তু ছেঁড়া ছেঁড়া। ভিতরে এক অস্থিরতাজনিত ছটফটানি। কোনো মানেই হয় না। ঘুমের মধ্যে নানা অস্বাভাবিক স্বপ্ন দেখে বারবার তন্দ্রা ভেঙে যাচ্ছিল।

খুব ভোরে রণে ভঙ্গ দিয়ে শয্যাত্যাগ করল অলক। আজ এক ব্যস্ততার দিন। তৈরি হওয়া দরকার।

সকালের কৃত্যগুলো সেরে বাইরে বেরোনোর পোশাক পরেই সে টুসির জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

আশ্চর্য সময়জ্ঞান মেয়েটার। ঠিক সাতটায় এল। দারোয়ানকে বলা ছিল। সে-ই নিয়ে এল বৈঠকখানায়।

পরনে একটা সাদামাটা সালোয়ার-কামিজ। মুখে কোনো প্রসাধন নেই। টান করে চুল বাঁধা। ধারালো মুখখানায় একটু লাজুক হাসি। কাঁধে একটা বেশ বড়সড় ব্যাগ।

বাববাঃ! পেল্লায় বাড়ি আপনাদের!

টুসিকে দেখে অলক ভারী খুশি হল। কেন খুশি হল তা বুঝতে পারছিল না। মেয়েটার সান্নিধ্যই যেন ভারী একটা ভাল ব্যাপার। কিন্তু এত সামান্য পরিচয়ে এতটা হওয়ার কথা নয়।

অলক হেসে বলল, হ্যাঁ, বনেদি বাড়ি বলা যায়। আমার ঠাকুর্দার বাবা প্রথম বাড়িটা করেছিলেন, পরে অবশ্য অনেক এক্সটেনশন হয়েছে। বোসো। চা না কফি কিছু খাবে?

আমার চা খাওয়ার নেশা আছে। ব্ল্যাক টি, চিনি ছাড়া, কড়া লিকার। কিন্তু সেটা পরে, আগে কাজের ঘরটা দেখা দরকার।

চলো।

নীচের তলার প্রশস্ত ঘরটা দেখে খুশি হয়ে টুসি বলে, বাঃ, পারফেক্ট ঘর। জানালাগুলো সব খুলে দিতে হবে।

ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের বাড়িতে ইজেল নেই। যদি চাও তো আনিয়ে দিতে পারি।

কোনো দরকার নেই। একটা টেবিলের ওপর দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখলেই হবে।

রং-তুলি কিছু চাই?

নাঃ। ওসব আমার সঙ্গে আছে। নিজের কিছু ছিল। আর কিছু চতুর্মুখের ঘর থেকে চুরি করে এনেছি।

অলক হেসে ফেলল, বলল, তুমি বেশ সোজাসাপটা মানুষ, তাই না?

কে জানে আমি কীরকম।

শোনো, ঠিক সাড়ে আটটায় আমরা সকালের জলখাবার খাই। বলতে কী ওটাই আমাদের সারাদিনের মেইন খাওয়া। বাবা এবং আমি এতই ব্যস্ত থাকি যে হেভি লাঞ্চ কখনও করি না। ব্রেকফাস্টের সময় আমার মা আর বাবার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবো।

ভ্রূ তুলে টুসি বলে, ও মা! কেন? পরিচয়ের আবার কী দরকার? আমি তো মাত্র কয়েকদিনের কর্মচারী। কাজ শেষ করেই ফুড়ুৎ হয়ে যাবো।

চেনা-পরিচয় থাকা ভাল। আমি তো থাকব না, পরিচয় থাকলে আমার অ্যাবসেন্সে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না। আর তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কিছু খেয়ে আসোনি।

চা আর চিঁড়ে ভাজা। আমি অল্পই খাই। খিদে পেটে নিয়ে কাজ করতে ভাল লাগে।

ওসব বললে হবে কেন? এখন তোমার কড়া লিকার চায়ের বন্দোবস্ত হচ্ছে। সাড়ে আটটায় আমাদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট, কেমন?

এখন আপনি আসুন তো। আমি এখন ছবিটার সামনে বসে একটু কনসেনট্রেট করতে চাই।

আচ্ছা। কাজের মেয়েরা এসে ছবিটা তোমার পছন্দমতো জায়গায় ফিট করে দিয়ে যাবে।

তার কোনো দরকার নেই। আগে আমি ছবিটা ভাল করে দেখি। তারপর ভাবা যাবে কোথায় এটা রাখব।

তুমি খুব জিদ্দি টাইপের মেয়ে।

সবাই তাই বলে। এখন আপনি আসুন।

অলক একটু হেসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে এল। মেয়েটা কাজপাগল। হয়তো বা ছবিটা শেষ করতে পারবে।

বাড়িতে অন্তত ছয়-সাতজন কাজের মেয়ে আছে নানা বয়সের। আবার তাদের একজন ইনচার্জও আছে। তবু মা সারাদিন টুক টুক করে ঘরদোর গোছগাছ করে বেড়ায়। মায়ের ওটা বাতিক।

হলঘরে মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মা ক্যাবিনেটের ওপর রাখা একটা পেতলের ফ্লাওয়ার ভাসে রাখা দু'দিনের বাসি ফুলের পচা পাপড়ি আর পাতা বেছে ফেলছে।

মেয়েটা কে রে? দোতলা থেকে দেখলুম।

ওর কথাই তো কাল বলছিলাম তোমাকে আর বাবাকে।

ওমা! এ তো বাচ্চা একটা মেয়ে। পারবে?

পারবে কিনা জানি না। তবে না যদি পারে তবে নষ্টও করবে না। ছবিটা তো ওই উদ্ধার করে দিয়েছে।

আমার কিন্তু বাপু, ছবিটা বেশ পছন্দই হয়েছে। কোথাও খুঁত তো দেখলুম না। তোর বাবাও তাই বলছিল।

আমাদের চোখে ধরা পড়বে না মা। টাচ আপ করলে দেখবে ছবিটা অনেক বেশি জ্যান্ত লাগবে।

মেয়েটা একটু রোগা, না?

হুঁ। আজকাল রোগা হওয়াই তো ফ্যাশন।

খুব গরিব ঘরের?

তা হবে হয়তো। ঠিক জানি না।

ছিরিছাঁদ দেখে তো গরিবগুর্বো বলেই মনে হয়।

তোমার অত খোঁজখবরের কী দরকার? কাজ করতে এসেছে, করে চলে যাবে।

ওরে বাবা, সে তো জানি। কিন্তু একটা মানুষ এলে নানা কথা জানতে ইচ্ছে করে। আমরা আর কী নিয়ে থাকি বল। এই যে পুরোনো খবরের কাগজ নিতে আসে এক্রাম আলি, বসে বসে কত কথা কয়। ঘরের কথা, গাঁয়ের কথা। শুনতে শুনতে যেন ওর সংসারটা দেখতে পাই। খোঁজখবর নেওয়া কি খারাপ রে?

বেশি প্রশ্ন করতে যেও না। হয়তো কিছু মনে করবে।

আচ্ছা বাপু। কথা সাবধানেই কইব।

অলকের আগামীকাল জাপানযাত্রা। সুতরাং তার অনেক কিছু কাজ সেরে নেওয়ার আছে। ঘরে এসেই সে তার ল্যাপটপ নিয়ে বসে গেল। এখনও নিউ ইয়র্ক, সানফ্রানসিসকো জেগে আছে। দুবাইয়ে প্রায় ভোর ভোর। জাপানে বেশ বেলা। সময়টা খেয়াল রেখে সে নেটওয়ার্কের স্রোতে ভেসে গেল।

সাড়ে আটটায় ব্রেকফাস্ট টেবিলে মা-বাবার সঙ্গে অপেক্ষা করছিল অলক। কাজের মেয়ে সবিতা এসে বলল, দিদিমণি এলেন না।

কেন?

দিদিমণি তো খুব মন দিয়ে ছবি আঁকছেন। ডেকে জবাবই পেলাম না। কাছে গিয়ে আস্তে করে কাঁধ ছুঁতেই হাত তুলে ডাকতে বারণ করলেন।

অলক উঠে পড়ে বলল, ঠিক আছে, আমি দেখছি।

গিয়ে দেখল, ছবিটাকে ইতিমধ্যেই জানালার পাশে একটি টেবিল টেনে এনে তার ওপর দাঁড় করিয়েছে টুসি। ইতিমধ্যে প্যালেটে রং নিয়ে খুব সূক্ষ্ম সরু তুলি দিয়ে ছবির ওপর খুব মন দিয়ে কিছু করছে।

বাহ্যজ্ঞান নেই। চোখ তদগত, শ্বাসও বোধহয় চলছে না।

খুব কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে আস্তে করে অলক ডাকল, টুসি!

টুসি চমকাল না। খুব ধীরে স্বপ্নাচ্ছন্ন, সম্মোহিত দুটো চোখ তার দিকে ফিরিয়ে কিছুক্ষণ সময় নিল ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে। তারপর সেই অসাধারণ, অদ্ভুত হাসি।

কী হল?

খাবে না? সবাই আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমি কি এ বাড়িতে খেতে এসেছি নাকি?

জানি, তুমি খেতে ভালোবাসো না। কিন্তু শুধু আজকের দিনটা একটু নিয়মরক্ষা করে আসবে চলো। কাল থেকে কেউ বিরক্ত করবে না আর।

হাতের তুলিটা রেখে টপ করে উঠে দাঁড়াল টুসি, চলুন।

যখন টেবিলের কাছে এল তখন একদম অন্য মানুষ। টপাটপ অলকের মা আর বাবাকে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলল, আমি টুসি।

অলকের বাবা অমল রায় গম্ভীর মানুষ, কাজের মানুষও বটে। মেপে কথা বলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি আলটপকা বলে ফেললেন, ইউ হ্যাভ এ ম্যাগনিফিসান্ট স্মাইল। তোমার হাসিটা এথেরিয়াল।

অলকের মা সাবিত্রী খুব তীক্ষ্ণ চোখে চেয়েছিলেন টুসির দিকে। বললেন, তুমি মেয়ে নিজের যত্ন নাও না বুঝি? সাজগোজ নেই, চুলটাও বাঁধা হয়নি ঠিকমতো? বোসো, এই তো আমার পাশের চেয়ারে বোসো।

এ বাড়ির নিয়ম যে যার পছন্দমতো খাবারের অর্ডার দেবে আর তা টাটকা তৈরি করে দেওয়া হবে। বাটার টোস্ট, পরোটা, লুচি, ডিম, কর্নফ্লেক্স আর দুধ, এমনকি কচুরি অবধি।

তুমি কী খাবে টুসি?

যা খুশি একটা হলেই হল। টোস্ট আছে? তাই খাবো। আর চা।

শুধু টোস্ট আর চা? ডিমের ওমলেট করে দিক?

ডিমে আমার অ্যালার্জি আছে।

শেষ অবধি দুটো টোস্ট আর কালো চা-ই খেল সে। আর অনেক গল্প করল অমল আর সাবিত্রী রায়ের সঙ্গে। তারা যে নিতান্তই নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং কষ্টে মানুষ তাও অম্লানবদনে বলে দিল। খুল্লামখুল্লা, অকপট, কোনো ভণিতাহীন কথাবার্তা শুনে অমল আর সাবিত্রী একটু অবাক। বেশিটাই মুগ্ধ।

সাড়ে ন'টায় বেরোনোর আগে একবার টুসির ঘরে নিঃশব্দে হানা দিল অলক। দেখল, টুসি ছবিটা একটা ল্যাপটপে আপলোড করে নিবিষ্ট মনে তাতে আঁকিবুকি করছে। অলকের আগমন টেরই পেল না। অলক নিঃশব্দেই চলে এল।

বেরোনোর মুখে মা বলল, আমি টুসিকে দুপুরে আমার সঙ্গে খেতে বলেছি। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না। শেষে হয়েছে।

ঠিক আছে মা।

সারাদিন নানা কাজে ব্যস্ত রইল অলক। কিন্তু এত ব্যস্ততার মধ্যেও মাঝে মাঝেই কেন যে টুসি আর তার অদ্ভুত হাসি আর স্বপ্নাতুর নিবিষ্টতার কথা মনে পড়ছিল। সে নিজে কাজের লোক। কিন্তু স্বীকার করতে বাধা নেই টুসির মতো ডেডিকেশন খুব কম দেখা যায়।

বেশ রাত করে ফিরল অলক। এসে শুনল, টুসি বিকেল অবধি ছিল। সারাক্ষণ ছবি মেরামতের কাজ করেছে। দুপুরে সাবিত্রী দেবীর সঙ্গে ভাত খেতে বসেছিল। খেয়েছে সামান্যই, তবে গল্প করেছে অনেক। আর সাবিত্রী বেজায় ভালবেসে ফেলেছেন টুসিকে।

রাত সাড়ে বারোটায় টুসির ফোন।

আপনারা বেশ হ্যাপি ফ্যামিলি, না?

বাইরে থেকে ওরকম মনে হয়।
তার মানে?
আমাদের ফ্যামিলিটায় আঠা নেই, বুঝতে পারোনি? আমরা ভাইবোন যে যার ধান্দায় দূরে দূরে, বাবা তার কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। পরিবারে বাঁধনই তো নেই। সেই দিক দিয়ে বরং তোমরা অনেক কাছাকাছি, ঘনিষ্ঠ।
ছাই ঘনিষ্ঠ। আমাদের দুই বোনের মধ্যে রিলেশন বনবেড়ালের মতো। কেউ কাউকে সহ্য করতে পারি না। আর বাবা-মার কথা? থাক, সে আপনার শুনে দরকার নেই।
তাহলে আমার মা-বাবাকে তোমার অপছন্দ হয়নি?
নাঃ। তবে হিউম্যান নন, একটু দেব-দেবীর ইমেজ আছে।
তুমি একটু বিচ্ছু আছো।
তা আছি। কাল আপনার ফ্লাইট কখন?
অনেক রাতে।
ভারী মজা না! আজ এদেশে তো কাল ওদেশে!
সবটাই মজা নয়। অনেক হ্যাপাও আছে। আছে টেনশন, ভীষণ দায়িত্ব এবং রিস্ক। কাজের দুনিয়াটাই এখন ভীষণ রকমের ক্রুয়েল অ্যান্ড আনকমপ্রোমাইজিং।
জানি মশাই, জানি। উঠতে বসতে এখন তা টের পাচ্ছি।
ছবিটার কাজ কতদূর?
অনেকটা হয়েছে, এবং হয়েও যাবে। চতুর্মুখ অত্যন্ত ট্যালেন্টেড আর্টিস্ট। যদিও তেমন বাজার হয়নি, কিন্তু আমি জানি হি ইজ এ জিনিয়াস। তবে মানুষটা নষ্ট হয়ে গেছে। ফ্রাস্ট্রেটেড, গ্রীডি।
ওঁর অবস্থা কেমন?
একটু ভাল। খবর নিয়েছি, ওর বউ আর মা দেশ থেকে এসেছে।
আর নুটু?
নুটু বেপাত্তা। এবং সেটা একটু ভয়ের।
কেন?
আমার মনে হয়, দিদি ইজ ইন পোটেনশিয়াল ডেনজার।
সর্বনাশ!
সর্বনাশের কিছু নেই। যে যেমন কাজ করে সে তেমন ফল পায়। এটাই তো নিয়ম।
তুমি বেশ দার্শনিকও আছো কিন্তু।
তা আছি। কাল সাতটার সময় যাবো। তখন কি দেখা হবে?
নিশ্চয়ই। কাল বাড়ির লোককে একটু সময় দেবো। তবে দুপুরের দিকে একটু বেরোতে হবে।
আমি যতটুকু টাচ আপ করেছি কাল তা আপনাকে বুঝিয়ে দেবো।
আমি কি ওসব বুঝবো?
খুব বুঝবেন। বোঝালে বুঝবেন না কেন? কাঠ বা পাথর তো নন!
তা ঠিক।
আগের ছবিটার একটা প্রিন্ট আউট করে রেখেছি। সেটা আর টাচ আপ করা ছবিটা পাশাপাশি দেখলেই বুঝতে পারবেন তফাতটা কোথায়।
বুঝতে চেষ্টা করবো।
আপনার কি ঘুম পাচ্ছে?
না তো!
আমার পাচ্ছে। ঘুমোলাম! গুড নাইট।

আচ্ছা মেয়ে যা হোক।

একটা খিলখিল হাসির পরই ফোনটা অফ হয়ে গেল।

আজ অবশ্য অলকের ঘুমের কোনো সমস্যা হল না।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় এল টুসি। সেই ম্যাড়ম্যাড়ে পোশাক। রূপটানহীন মুখশ্রী। কিন্তু বড্ড ভাল দেখাচ্ছে ওকে। আর সেই হিপনোটিক হাসি। সেই দুধসাদা দাঁত আর দাঁতে অনবদ্য সেটিং।

বাপ রে! পাংচুয়ালিটিতে তো তুমি আমাদের হারিয়ে দিয়েছো!

খেটেই তো খেতে হবে মশাই, তাই ভাবী বসদের তুষ্ট রাখার জন্য নিজেকে তৈরি রাখছি। পাংচুয়ালিটি একটি মস্ত অ্যাসেট।

তাই বুঝি?

আহা, যেন আপনি জানেন না! এখন আসুন তো, চুপটি করে বসে ছবি দুটো মিলিয়ে দেখুন।

টুসি যখন আঁকার ঘরে দাদুর ছবির ওপর থেকে কাপড়ের ঢাকনাটা সরাল তখনই চমকটা টের পেল অলক। ছবিটা একই আছে। কিন্তু কোনো এক জাদুমন্ত্রবলে যেন ছবিটায় একটা প্রাণ সঞ্চারিত হয়ে গেছে। চোখে একটা যেন দীপ্তি এসেছে। বসার ভঙ্গিতে যেন একটা প্রাণবন্ত ভাব। পিছনের পটভূমিতে অনেক সূক্ষ্ম ডিটেলসের কাজ।

বাঃ!

এখনও শেষ হয়নি কাজ। আরও খাটতে হবে।

পাশাপাশি আগের ছবিটাও দেখল অলক। খুঁটিয়েই দেখল। তারপর বলল, এখন ওরিজিনালটাকে ম্যাড়ম্যাড়ে দেখাচ্ছে। টুসি, তুমি ম্যাজিক জানো।

টুসি কোনো ম্যাজিক জানে না! তার শুধু কাণ্ডজ্ঞান আছে। এবার আপনি কেটে পড়ুন তো। আমার এখন অনেক কাজ।

প্রায় এক মাস পর নিউ ইয়র্কের কুইনসের একটা অ্যাপার্টমেন্টে অনেক রাতে মায়ের একটা ফোন পেল অলক।

শোন, আমি আর তোর বাবা মিলে একটা ডিসিশন নিয়েছি।

ডিসিশন! কিসের ডিসিশন?

ডিসিশনটা টুসি।

তার মানে?

তার মানে টুসি এ বাড়ির বউ হয়ে থাকবে।

অলক কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে ভারী বিরক্তির সঙ্গে বলল, কী যে সব করো না!

তোর আপত্তি আছে?

দুম করে একটা কথা বললে কি জবাব দেওয়া যায়? দাঁড়াও, ভেবে দেখি—

ত্রিশ বছর বয়স হল, অনেক ভেবেছো, আর সময় দেওয়া যাবে না।

কী যে সব করে ফেল! ও রাজি হবে কেন?

হবে কী রে? রাজি করিয়ে ছেড়েছি।

তাই বলো! সেজন্যই গত দু’দিন ফোন ধরেনি! আচ্ছা যা হোক!

কী ধরে নেবো?

অগত্যা—

[বৈশাখ ১৪২০]

—

ঈগলের চোখ

স্যার, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, কিন্তু পারিনি। ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা আমার ধাতেই নেই। কিছুদিন দিব্যি রুটিন ফলো করতে পারি। সকালে ওঠা, দাঁত মাজা, দাড়ি কামানো, স্নান, বাটার টোস্ট আর ডিম দিয়ে ব্রেকফাস্ট, পোশাক পরে তৈরি হয়ে ব্রিফকেস নিয়ে বউকে একটা আলতো চুমু খেয়ে অফিসের জন্য বেরিয়ে পড়া—এসব মাসখানেক দিব্যি পারি। তারপরই আমার অস্থিরতা আসে। সাঙ্ঘাতিক অস্থিরতা। মনে হয় এইসব রুটিন আমার গলা কেটে ফেলছে, হাত-পায়ে দড়ি পরাচ্ছে, একটা নিরেট দেয়ালে ঠেসে ধরছে আমাকে। আমার তখন ভীষণ কষ্ট হয়। পাগল-পাগল লাগে। আর তখনই আমি আমার কয়েকজন মার্কামারা পুরোনো বন্ধুকে খবর পাঠাই। তারা ভাল লোক নয় ঠিকই, তবে বন্ধু হিসেবে খুব, খুব বিশ্বস্ত। খবর পেলেই তারা এসে হাজির হয়ে যায় আর আমি তাদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। উধাও হয়ে যাই। কাঁহা কাঁহা মুল্লুক চলে যাই। বেশির ভাগই হয় আদিবাসী ভিলেজ, নয়তো কোনো খনি এলাকা, ডক অঞ্চল। অর্থাৎ যেখানে ভদ্রলোকরা থাকে না। চোলাই খাই, জুয়া খেলি, ভাড়াটে মেয়েদের সঙ্গে শুই। হয়তো এসব খুব খারাপ কাজ স্যার, কিন্তু ওইরকম বেপরোয়া বেহিসেবি পাগলাটে মর্যালিটিহীন কিছুটা সময় কাটালেই আমার অস্থিরতাটা চলে যায়।

তখন কি ফিরে আসেন?

হ্যাঁ স্যার। হয়তো এক মাস বা দেড় মাস কিংবা দিন দশ-পনেরো ওইরকম বাঁধনছাড়া জীবন কাটাতে না পারলে আমাকে সুইসাইড করতে হত।

আমাদের কাছে যা খবর আছে তাতে আপনার পাঁচজন বন্ধুর মধ্যে রাজু শেঠ আর নিমু কর্মকার ডেঞ্জারাস ক্রিমিনাল। তা কি জানেন?

ওরা আমার আজকের বন্ধু নয় স্যার। ছেলেবেলা থেকে আমরা প্রায় একসঙ্গে বড়ো হয়েছি। ওদের সব জানি স্যার। রাজু খুব অ্যাগ্রেসিভ টাইপের। নিমু একটু চুপচাপ কিন্তু একরোখা। হ্যাঁ স্যার, আপনার ইনফর্মেশনের কোনো ভুল নেই।

প্রবাল, শতরূপ আর নন্দনও খুব ভালো লোক নয়।

স্যার, আমরা কেউ ভালো লোক বলে দাবি করছি না। আর ওই বন্ধুদের সঙ্গে বছরে দু-তিনবারই আমার দেখা হয়। যখন আমরা উইকেন্ড অ্যাডভেঞ্চারে যাই। নইলে কে কী করে তা নিয়ে আর কেউ তেমন মাথা

ঘামায় না।

আপনার এইসব অ্যাডভেঞ্চার আপনার স্ত্রী কী চোখে দেখতেন?

সে কি আর বলতে হবে স্যার? উনি আমাকে আপাদমস্তক ঘেন্না করতেন। যখন ফিরে আসতাম তখন ওঁর চোখ যেন আমার সর্বাঙ্গে ছ্যাঁকা দিত। নিজেকে বড্ড অপরাধী মনে হত তখন।

রিকনসিলিয়েশন কীভাবে হত?

সময় লাগত স্যার। উনি আমাকে খুব অপমান করতেন, গালাগাল দিতেন।

ডিভোর্সের ভয় দেখাননি?

বহুবার। যতদূর জানি, ইদানীং ল-ইয়ারের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিলেন।

বিয়ে কতদিনের?

সাত বছর।

প্রেম করে, না নেগোশিয়েটেড?

আপনি কি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানেন স্যার?

জানি। তবু আপনি বলুন।

আমি প্রসাদ ফুড প্রোডাক্টের মালিকের ছেলে। সুতরাং আমাকে বড়োলোকের ছেলে বলাই যায়। আমরা তিন ভাই, আমি মেজো এবং ফ্যামিলির ব্ল্যাক শিপ। আমার মিস-অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আমি বাবার চক্ষুশূল। তিনি হয়তো আমাকে ত্যাজ্যপুত্রই করতেন। কিন্তু একটা কারণেই করেননি। তিন ভাইয়ের মধ্যে আমিই একমাত্র ফুড টেকনোলজি নিয়ে পড়েছি এবং পাশ করেছি। আমার আর দুই ভাই ম্যানেজমেন্ট পাশ করেছে এবং ব্যবসাও বোঝে। কিন্তু আমি প্রোডাকশনটা বুঝি। আপনি জানেন না যে আমি কিছু ইনোভেশন করার ফলে আমাদের প্রোডাক্টের কোয়ালিটি অনেক ভাল হয়েছে এবং বিদেশেও মার্কেট পাচ্ছে। শুধু এই কারণেই বাবা আমাকে তাড়িয়ে দেননি। যাতে আমি শুধরে যাই সেইজন্যই শিবাঙ্গীর মতো সুন্দরী মেয়ে খুঁজে আমার বিয়ে দেন। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ স্যার।

বুঝলাম। আপনার স্ত্রী যে সুন্দরী তা আমরা জানি। কিন্তু শিবাঙ্গীও আপনাকে শোধরাতে পারেনি, তাই তো?

হ্যাঁ স্যার।

বেলঘরিয়ায় আপনাদের বিশাল বাড়ি থাকতেও আপনি এই সাউথ ক্যালকাটায় ফ্ল্যাট কিনে বাস করছেন কেন? বিশেষ কারণ আছে কি?

আইডিয়া আমার বাবার। কেন তা বলতে পারব না। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ। যা করেন ভেবেচিন্তেই করেন। আমার মা আপত্তি করেছিলেন বটে, কিন্তু বাবা বলেছিলেন, শিবাঙ্গীর সঙ্গে আলাদা থাকলেই নাকি আমার ভাল হবে। এই ফ্ল্যাট বাবাই কিনে দিয়েছেন।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় আপনার ভাল হয়েছে কি?

না স্যার। আমি ইনকরিজিবল।

স্ত্রীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কীরকম?

লুকওয়ার্ম। অলমোস্ট কোল্ড।

তার জন্য আপনি কাকে দায়ী করতে চান?

আমাকে। শিবাঙ্গী ভালো মেয়ে।

আপনার ওই মার্কামারা পাঁচজন বন্ধুকে কি আপনার স্ত্রী চেনেন?

ওরা আমার বাড়িতে বড়ো একটা আসে না। আমাদের বন্ধুত্বটা বাইরে। তবে শিবাঙ্গী ওদের দু-চারবার দেখেছে। বিয়ের সময়ে ওরা ইনভাইটেড ছিল। দু-তিনবার বিভিন্ন অকেশনে এসেছে। শিবাঙ্গী ওদের খুব

ফর্ম্যালি চেনে। ঘনিষ্ঠভাবে নয়। সত্যি কথা বলতে কী ওদের সঙ্গে আমারও বিশেষ যোগাযোগ থাকে না। যখন আমার ঘাড়ে অস্থিরতার ভূতটা চাপে তখনই ওদের ফোন করি, আর ওরা চলে আসে।

সবাই একসঙ্গেই চলে আসে?

না স্যার। তা কি হয়! সকলেই নানা ধান্ধায় ব্যস্ত। কখনও দুজন বা তিনজন জুটে যায়। আজকাল পাঁচজন জোটে খুব কম।

এই বন্ধুরা কি সবাই ওয়েল অফ?

হ্যাঁ স্যার। কারও মানিট্যারি কোনো প্রবলেম নেই। কিন্তু স্যার, আপনি আমার বন্ধুদের সম্পর্কে জানতে চাইছেন কেন?

এ ম্যান ইজ নোন বাই দি কমপ্যানি হি কিপস।

সে তো ঠিকই। আমরা সবাই ক্যালকাটা বয়েজ-এ পড়তাম। অ্যাকাডেমিক রেকর্ড কারওই খুব খারাপ নয়। তবে হ্যাঁ, আমাদের সবাই বদমাশ বলে জানত। অ্যান্ড দ্যাটস দ্যাট।

এবার বলুন জুন মাসের পাঁচ তারিখে আপনি এবং আপনার বন্ধুরা রাত বারোটার সময় কোথায় ছিলেন।

বন্ধুরা বলতে সবাই নয়। আমি, রাজু আর শতরূপ জুনের এক তারিখে গাড়ি নিয়ে বেরোই।

গাড়িটা কার?

রাজুর। রাজুর গাড়িরই ব্যবসা। অন্তত তিনটে বড়ো বড়ো কম্প্যানিকে ও বছরওয়্যারি চুক্তিতে গাড়ি দেয়। সব কোয়ালিটি কার। তাই আমরা যখনই বাইরে যাই তখনই রাজুর কাছ থেকে গাড়ি নিই।

বুঝলাম। এবার বলুন, কোথায় গিয়েছিলেন?

লোধাশুলি।

সেখানে কেন?

শতরূপের ওখানে একটা ফার্ম হাউস মতো আছে। হাঁস, মুর্গি, শুয়োরের খামার। সেইখানে।

তারপর?

পাঁচ তারিখ রাতেও আমরা শতরূপের ফার্ম হাউসেই ছিলাম স্যার।

ফার্ম হাউসের কর্মচারীরা সাক্ষী দেবে তো?

কেন দেবে না স্যার? তবে রাজু ছিল না। ওর জরুরি কাজ থাকায় দুই তারিখেই ফিরে এসেছিল। আমরা ফিরি ছয় তারিখের সকালে। ফার্ম হাউসের ডেলিভারি ভ্যান-এ।

কলকাতায় কখন পৌঁছোন?

ভোর সাড়ে পাঁচটায়।

তারপর?

শত আমাকে এসপ্লানেডে গ্র্যান্ডের সামনে নামিয়ে দেয়। আমি ট্যাক্সি ধরে বাড়ি চলে আসি। এসব কথা আমি লোকাল পুলিশকে বলেছি স্যার। একাধিকবার বলতে হয়েছে।

জানি। হয়তো আরও কয়েকবার বলতে হবে।

ঠিক আছে। যতবার বলতে বলবেন, বলবো। বাড়িতে ফিরে আমি বেল দিই। কেউ দরজা খুলল না। হঠাৎ মনে হল, দরজাটা লক করা নেই, শুধু আধভেজানো আছে। আমি দরজা খুলে ঢুকি। সামনের হলঘরেই নন্দিনী উপুড় হয়ে পড়ে ছিল। লট অফ ব্লাড। ক্লট হয়ে ছিল।

আপনার ফার্স্ট রি-অ্যাকশন?

খুব নার্ভাস হয়ে, হাত-পা কেঁপে মেঝেতেই বসে পড়ি। কাউকে ডাকাডাকি করার মতো অবস্থা ছিল না। বোধহয় আরও আধঘণ্টা পর আমি শিবাঙ্গীকে ডাকতে ডাকতে হামাগুড়ি দিয়ে বেডরুমে যাই। অ্যান্ড শি ওয়াজ লায়িং...

শিবাঙ্গীর সঙ্গে আপনি বাইরে গেলে ফোনে কথা-টথা বলতেন না?

না স্যার। আমার হোয়ার-অ্যাবাউটস সম্পর্কে ওর কোনো ইন্টারেস্ট ছিল না।

আপনার কোনো গার্লফ্রেন্ড আছে?

না স্যার।

কখনও ছিল?

না। আমার অনেক দোষ আছে, কিন্তু উওম্যানাইজার নই।

নারী-পুরুষের আকর্ষণ কোনো দোষের ব্যাপার কি?

আমি তা জানি না স্যার। আমি মরালিস্ট নই। কিন্তু আমার কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না।

নন্দিনী এ বাড়িতে কী করত? হাউস-মেইড? মানে কাজের লোক?

ঠিক তা নয়। নন্দিনীকে এ বাড়িতে এনেছিল শিবাঙ্গী। এ বাড়িতে অনেক কাজের লোক আছে। কুক, ডাস্টিং-এর লোক, ডোমেস্টিক হেলপ মিলিয়ে অন্তত জনা চার-পাঁচ তো হবেই। নন্দিনী হাউসমাদারের মতো ছিল। ওভারঅল সুপারভিশন করত। কিন্তু ওর আসল কাজ ছিল শিবাঙ্গীকে সঙ্গ দেওয়া। শিবাঙ্গীর একটা ছোটো ব্যবসা আছে। বিদেশ থেকে নানারকমের সুগন্ধের কনসেনট্রেট আনিয়ে তা দিয়ে পারফিউম তৈরি করা। ওর একটা ল্যাবও আছে। লার্জ স্কেলে করত না। লিমিটেড কিছু ক্লায়েন্টের জন্য করত। কিন্তু ব্যবসাটা খুব ভালই চলত। নন্দিনী ওকে ব্যবসার কাজেও হেলপ করত।

নন্দিনীকে কি স্যালারি দেওয়া হত?

হ্যাঁ স্যার। আমার ধারণা, মোর দ্যান ফিফটিন থাউস্যান্ড।

নন্দিনীর বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের বেশি ছিল না, কোয়াইট গুড লুকিং। ম্যারেড?

জানি না স্যার। নন্দিনীর সঙ্গে আমার বিশেষ কথাবার্তা হত না। শি ওয়াজ এ প্রাইভেট পারসন, ফোর্থ বেডরুমটায় থাকত। আমার সঙ্গে বিশেষ দেখাও হত না।

তার মানে আপনার সঙ্গে নন্দিনীর কোনো অ্যাফেয়ার ছিল না?

না স্যার! কী বলছেন? নন্দিনীর সঙ্গে অ্যাফেয়ার? আমার তো মনে হয় নন্দিনী আমাকে শিবাঙ্গীর মতোই ঘেন্না করত। আর সেটাই তো স্বাভাবিক।

কী করে বুঝতেন যে নন্দিনী আপনাকে ঘেন্না করত?

আমার তেমন সূক্ষ্ম অনুভূতি নেই। তবু দেখা হলে নন্দিনীর মুখে-চোখে রিপালশনের ভাব লক্ষ করেছি।

রেকর্ডে দেখছি আপনি একসময়ে খেলাধুলো করতেন।

হ্যাঁ স্যার। আই ওয়াজ এ গুড অ্যাথলিট। স্প্রিন্টার ছিলাম। পরে আই টুক আপ টেনিস।

নেশাভাঙ কবে থেকে শুরু করেন?

পার্টি-ফার্টিতে যেতে হত। সেই থেকেই শুরু।

আর বোহেমিয়্যানিজম?

ওটা আগে থেকেই ছিল। স্কুলে পড়ার সময় দু'বার পালিয়ে দেরাদুন আর লাদাখ চলে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কেমন যেন পাগলাটে ইচ্ছে হয় পালানোর।

আপনি একজন বিচিত্র মানুষ।

হ্যাঁ স্যার। অনেকে বলে, আমি পাগল।

আপনার স্ত্রীকে সেদিন সকালে আপনি কী অবস্থায় দেখেছিলেন?

বিছানায় উপুড় হয়ে শোওয়া। হাফ নেকেডে। মাথা থেকে রক্ত পড়ে বিছানা ভেসে যাচ্ছিল। ঘ্যাস্টলি সিন। ভেবেছিলাম মরে গেছে।

আপনার কাজের লোকেরা কোথায় ছিল?

ওরা ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকে না। সারভেন্টস কোয়ার্টারে থাকে কুক আর একজন সবসময়ের লোক। বাকিরা ঠিকে। অত সকালে কেউ তো আসে না। আটটার আগে কারও আসবার হুকুম নেই।

তখন কটা বাজে?

হার্ডলি ছটা বা সোয়া ছটা।

কী করলেন?

প্রথমে সিকিউরিটিকে ডাকি। তারপর অ্যাম্বুলেন্স আর পুলিশ। কিন্তু সবটাই করেছি একটা ঘোরের মধ্যে। এরকম সাঙ্ঘাতিক ঘটনা তো কখনও দেখিনি।

আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

না স্যার। তবে শুনছি, পুলিশ আমাকেই সন্দেহ করছে। এখনও কেন অ্যারেস্ট করেনি জানি না।

তার কারণ আপনার অ্যালিবাই। ঘটনাটা ঘটে পাঁচ তারিখে রাত বারোটার কাছাকাছি।

হ্যাঁ স্যার, জানি। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ আমি সুপারি কিলার লাগিয়ে কাণ্ডটা করেছি।

সেটা খুবই সম্ভব।

হ্যাঁ স্যার, এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে। আর আমার তো মোটিভও আছে, কী বলেন?

হ্যাঁ। তাহলে কি আপনি স্বীকার করছেন যে কাণ্ডটা আপনারই?

না স্যার। আমি শিবাঙ্গী বা নন্দিনীকে খুন করার কথা কখনও ভাবিনি। কারণ, খুন করার পিছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য তো থাকবে! আমার তো কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। শিবাঙ্গীর জ্ঞান ফিরলে এবং কথা বলার মতো অবস্থা হলে ওর কাছ থেকেই জানতে পারবেন যে, আমি স্বামী হিসেবে অযোগ্য হলেও ভিনডিকটিভ নই। আমাকে ও কিছুদিন আগে মিউচুয়াল ডিভোর্সের কথা বলেছিল। আমি খুব অপরাধবোধের সঙ্গেই বলেছিলাম, আমি তো অপদার্থ, আমার সঙ্গে কোনো মহিলারই বসবাস করা সম্ভব নয়।

ডিভোর্সে আপনার মত ছিল?

ছিল। না থাকলেও ডিভোর্স ও পেয়ে যেত। দেড় কোটি টাকার একটা সেটলমেন্টের কথাও হয়েছিল।

বাঃ! এটাই তো মোটিভ! শিবাঙ্গী মারা গেলে আপনার দেড় কোটি টাকা বেঁচে যেত! তাই না?

হ্যাঁ স্যার। আমি তো বলেইছি আমার মোটিভের অভাব নেই। পুলিশ আমাকে অনায়াসে ঝুলিয়ে দিতে পারে। কিন্তু নন্দিনীকে খুন করার পিছনে আমার কী মোটিভ থাকতে পারে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না।

মোটিভ আছে বিষাণবাবু।

আছে! তাহলে তো হয়েই গেল! কিন্তু নন্দিনীর সঙ্গে আমার তো সম্পর্কই ছিল না স্যার!

আপনি কখনও নন্দিনীর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট চেক করেছেন কি?

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট! না স্যার, ফেসবুকের কথা লোকের মুখে শুনি বটে, কিন্তু আমি কখনও ফেসবুক চেক করি না। কখনও ইন্টারেস্টই হয়নি। কেন স্যার, ফেসবুকে কি নন্দিনী আমার সম্পর্কে কিছু বলেছে?

ক্যাটেগোরিক্যালি নয়, তবে কিছু হিন্ট আছে। নন্দিনী একজন রহস্যময় পুরুষের কথা লিখেছে। তার পুরো নাম বা ছবি লোড করেনি। শুধু ইনিশিয়াল দেওয়া আছে। আর ইনিশিয়াল হল বি. পি.। আপনার নামের আদ্যক্ষর। আপনি কি জানেন নন্দিনী ছবি আঁকতে জানত কিনা?

না স্যার, নন্দিনী সম্পর্কে আমি বেশি কিছুই জানি না। শুধু জানি সে ছিল শিবাঙ্গীর ডান হাত। তাকে ছাড়া শিবাঙ্গীর এক মুহূর্তও চলত না। দুজনের খুব ভাব ছিল, বন্ধুর মতো। এমপ্লয়ার-এমপ্লয়ির মতো নয়।

এতে কি আপনি বিরক্ত হতেন?

না স্যার, বিরক্ত হব কেন? বরং শিবাঙ্গী যে মনের মতো একজন সঙ্গিনী পেয়েছে তাতে আমি খুশিই হতাম।

নন্দিনী কখনও আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইন্টারফিয়ার করত?

না স্যার। কারণ শিবাঙ্গীর সঙ্গে আমার ঝগড়া হত না। বরং দুজনের মধ্যে একটা নীরবতাই ছিল। কোল্ড ডিসট্যান্স। তবে কখনও-সখনও শিবাঙ্গী গায়ের ঝাল ঝাড়ত। একতরফা। আমি কখনও জবাব দিতাম না। কারণ আমি সর্বদাই পাপবোধে ভুগতাম। আমি যে অন্যায় করছি তা তো আমি জানি।

সেয়ানা পাপী?

হ্যাঁ স্যার, আমাকে ওটা বলাই যায়। কিন্তু নন্দিনীর ছবি আঁকা নিয়ে আপনি কিছু জানতে চাইছিলেন।

হ্যাঁ। তার কারণ, নন্দিনীর মোবাইলে আমরা আপনার কয়েকটা ছবি পেয়েছি।

মাই গড! আমার ছবি! নন্দিনীর মোবাইলে? অসভ্য ছবি নয় তো স্যার?

কেন, সেরকম সম্ভাবনা আছে নাকি?

আজকাল মডার্ন টেকনোলজি দিয়ে কত কী করা যায়।

না, অসভ্য ছবি নয়। আর ছবিগুলো কোনো অ্যালবাম থেকে তোলা হয়েছে বলেই মনে হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, নন্দিনীর ফেসবুক অ্যাকাউন্টে আপনার ছবি থেকে করা একটা স্কেচ আপলোড করা আছে। পাশে লেখা 'মিস্টিরিয়াস বি. পি. ইজ মিরাজ টু মি।'

তার মানে কী স্যার?

আমার ডিডাকশন হল, নন্দিনী আপনার প্রেমে পড়েছিল।

এতে কি আমার খুশি হওয়া উচিত? কিন্তু স্যার, আমার তো শুনে কোনো খুশি হচ্ছে না।

খুশি না হওয়াই ভাল। কারণ এই মেসেজটা আপনাকে ফাঁসিয়ে দিতে পারে।

ওঃ গড!

নন্দিনীর দিকে আপনি কখনও কোনো ইশারা-ইংগিত পাননি? কখনও না? ভালো করে ভেবে দেখুন।

ইশারা-ইংগিত! বিশ্বাস করুন স্যার, নন্দিনী ওয়াজ এ ভেরি সিরিয়াস টাইপ অফ উওম্যান। সবসময়ে গম্ভীর, সবসময়ে এনগেজড ইন সাম ওয়ার্ক। ওর গলার স্বরও আমি বিশেষ শুনতে পেতাম না। আর আমি বাড়িতে থাকতামই বা কতক্ষণ বলুন। সকালে ব্রেকফাস্ট খেয়ে ন'টার মধ্যে বেরিয়ে যেতাম। ফিরতে রাত। বেশির ভাগ সময়েই ডিনার বাইরে খেয়ে আসতাম। আর শিবাঙ্গী বা নন্দিনীও তো বাড়িতে বসে থাকার লোক নয়। শিবাঙ্গীর ব্যবসা ছাড়াও নানা সোশ্যাল এনগেজমেন্ট আছে। সুতরাং নন্দিনী কী করে ইশারা-ইংগিত করতে পারে? বরং আমার মনে হয় শি হেটেড মি।

আমি আপনাকে আর একটু কনসেনট্রেট করতে বলছি। আর একটু ভাবুন। কোনোদিন কোনো ছোটোখাটো ইনসিগনিফিক্যান্ট কিছু মনে পড়ে কি?

স্যার, শিবাঙ্গী আমাকে ঘেন্না করে ঠিকই, কিন্তু কোনো মহিলা আমার প্রতি ইন্টারেস্টেড হলে শি উইল নো ইট ইমিডিয়েটলি। এবং সে ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নয়।

আর ইউ শিওর?

হ্যাঁ স্যার। আমাদের বিয়ের পরই ওর এক বান্ধবী আমার সঙ্গে একটু ঢলাঢলি করার চেষ্টা করেছিল। শিবাঙ্গী তাকে এমন অপমান করে যে সে আর কখনও মুখ দেখায়নি।

শুনুন মশাই, নন্দিনী সম্পর্কে আপনার ধারণা খুব নির্ভরযোগ্য নয়। আপনার ই-মেলের পাসওয়ার্ড নন্দিনী কী করে জানল?

আমার পাসওয়ার্ড! ইম্পসিবল।

নন্দিনীর ঘরের ডেস্কের ড্রয়ারের মধ্যে পুলিশ অন্তত ছয়-সাতটা ই-মেল-এর প্রিন্ট আউট পেয়েছে যেগুলো আপনার অ্যাড্রেসে এসেছিল।

মাই গড! এটা কীভাবে সম্ভব?

আপনি খুব ভালো অভিনেতা নন বিষাণবাবু।

না স্যার, আমি অ্যাকটিংটা পারি না। নেভার ইন মাই লাইফ। এখনও অ্যাকটিং করছি না। আমি সত্যিই বিস্মিত।

যদি প্রমাণ হয় যে নন্দিনীর সঙ্গে আপনার একটা গোপন সম্পর্ক ছিল তাহলে কিন্তু আপনি অগাধ জলে পড়বেন!

বুঝতে পারছি স্যার। আমার ভবিষ্যৎ খুব ভালো দিকে টার্ন করছে না। ই-মেল এ কি কিছু ক্লু পাওয়া গেছে স্যার?

অবশ্যই।

দেন আই অ্যাম ডুমড।

আপনি কি রেগুলার আপনার ই-মেল চেক করেন?

না স্যার, আমার ই-মেলের যোগাযোগ বেশি মানুষের সঙ্গে নেই। মাঝে মাঝে খুলে দেখি। জাঙ্ক মেল-ই বেশি থাকে। আমাকে কম্পিউটারে অনেক কাজ করতে হয় বটে, কিন্তু ই-মেল বড় একটা দেখা হয় না। কি আছে স্যার আমার ই-মেল এ?

একটা মেসেজ ছিল, ডু ইউ নো হু ওয়াজ হোল্ডিং ইওর হেড হোয়েন ইউ ওয়্যার ভমিটিং লাস্ট নাইট? ডিড ইউ হিয়ার মাই হাটবিট হোয়েন আই ওয়াজ হোল্ডিং ইউ ক্লোজ টু মাই ব্রেস্ট? ইউ পুয়োর রেচেড ম্যান।

এই মেসেজের মাথামুন্ডু আমি কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার।

আপনি বাড়িতে মাতাল অবস্থায় ফিরলে কেউ কি আপনাকে অ্যাটেন্ড করে রেগুলার?

আগে মাঝে মাঝে শিবাঙ্গী এসে ধরত। বমি-টমি করলে সব পরিষ্কার করত। সিমপ্যাথি ছিল স্যার। কিন্তু সেটা আমিই নষ্ট করে দিয়েছি।

মনে করে দেখুন, ইদানীং—

স্যার, মাতাল অবস্থায় যা ঘটে তা পরে আর মনে পড়ে না। তবে হ্যাঁ, আপনি ঠিকই বলেছেন। আবছা মনে পড়ছে, কিছুদিন আগে মাতাল অবস্থায় আমাকে কেউ দু-চারবার অ্যাটেন্ড করেছে। আমি ভেবেছিলাম, কাজের লোকজনই হয়তো হবে।

মহিলা না পুরুষ?

মনে হয় মহিলা।

ভালো করে ভেবে দেখুন, মহিলাটি নন্দিনী কিনা।

হলেও হতে পারে স্যার। মাতালের অবজার্ভেশন খুব একটা নির্ভরযোগ্য তো নয়। কিন্তু ব্যাপারটা একটা ধাঁধার মতো। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনার ল্যাপটপ আছে?

আছে।

নিয়ে আসুন।

এক মিনিট স্যার।

বলে বিষাণ উঠে তার স্টাডি থেকে ল্যাপটপটা নিয়ে এল। তারপর ল্যাপটপ খুলে মন দিয়ে তার ই-মেল খুলে ভালো করে পরীক্ষা করে বলল, দেখুন স্যার, ওরকম কোনো মেল আমার অ্যাকাউন্টে নেই।

এখন নেই, কিন্তু ছিল। কোনো কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট থেকে তা ডিলিট করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা করার আগে নন্দিনী একটি প্রিন্ট আউট বের করে নিয়েছে। মোট চারটি মেল। এবং মেলগুলো বেশ প্যাশনেট অ্যান্ড রোম্যান্টিক। ব্যাপারটা খুলে বললে ভালো হয় না?

জানা থাকলে বলতাম স্যার। কিন্তু রোম্যান্টিক সম্পর্কই যদি হবে তাহলে নন্দিনীকে খুন করব কেন সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

হ্যাঁ, সেটা একটা চিন্তার বিষয়।

স্যার, শুধু নন্দিনী কেন, আমার মতো একজন রুইনড ম্যানের সঙ্গে দুনিয়ার কোনো মেয়েই কি রিলেশন তৈরি করতে চাইবে?

দুনিয়াটা বড় অদ্ভুত জায়গা, কত কী যে হয় বা হতে পারে তার কোনো লজিক বা মাথামুন্ডু নেই।

স্যার, আমি আইনকানুন জানি না। আমাকেই কি খুনি বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে?

না, এখনও নয়। আমরা শিবাঙ্গীর ওপর নির্ভর করছি। উনি এখনও কোমায়। ডাক্তাররা কোনো ভরসার কথা বলছেন না। তবে এখুনি ফ্যাটাল কিছু হয়তো হবে না। উনি চেতনায় ফিরলে ভাইটাল উইটনেস হয়ে দাঁড়াবেন। এখন আপনার ভাগ্য।

আমার ভাগ্য ভালো নয় স্যার। আমাদের বাড়িতে প্রচুর জ্যোতিষীর চর্চা হয়। আমার মা আর বাবা দুজনেই খুব জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন। আমাদের বাড়িতে বড় বড় জ্যোতিষীর যাতায়াত আছে। তারাই বলেছে, আমার কুষ্ঠিতে নাকি অনেক খারাপ ব্যাপার আছে।

কীরকম?

তা আমি জানি না স্যার, আমার মা জানে। এক সময়ে আমাকে মায়ের চাপাচাপিতে অনেক আংটি আর তাবিচ-কবজ পরতে হয়েছিল। বড় হয়ে সেগুলো ত্যাগ করেছি।

আপনি জ্যোতিষে বিশ্বাস করেন?

না স্যার। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে জ্যোতিষীরা আমার ভাগ্য নিয়ে মিথ্যে হয়তো বলেনি।

আপনার কি মনে হয় শিবাঙ্গী আপনার ফেবারে সাক্ষী দেবে?

না স্যার। তা কী করে সম্ভব? পুলিশ বলছে খুন করতে এসেছিল ভাড়াটে খুনিরা। শিবাঙ্গী বড় জোর বলবে আততায়ীদের সে চেনে না। সেক্ষেত্রে তো আমার রেহাই পাওয়ার কথা নয়।

একজ্যাক্টলি। শিবাঙ্গীর সংজ্ঞা ফিরলেও আপনার লাভ নেই।

না স্যার। গত পাঁচদিন ধরে আমিও নানা অ্যাঙ্গেল থেকে ভেবেছি। মনে হচ্ছে আমার রেহাই পাওয়ার কোনো রাস্তা নেই।

বাই দি বাই, আমি শুনলাম, আপনি গত সাতদিন একফোঁটাও মদ্যপান করেননি! সত্যি নাকি?

সত্যি স্যার। ইন ফ্যাক্ট আমার মদ খাওয়ার কথা মনেই হয়নি। এতটা শকড যে, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছেগুলো সব হাওয়া হয়ে গেছে। সেই জায়গায় আমার মনের মধ্যে গুহার মতো একটা ভয়।

ভয় জিনিসটা কি গুহার মতো?

আমার যেন ওরকমই মনে হল।

গত পাঁচদিন কি আপনি বাড়িতেই বসে আছেন?

হ্যাঁ স্যার। প্রথম তিন-চারদিন তো সারাদিন ধরে পুলিশের জেরা চলেছে। প্রায় প্রতিদিনই থানায় টেনে নিয়ে গেছে। স্নান-খাওয়ার সময়ও পাইনি। আমি এত টায়ার্ড যে মনে হচ্ছে, বুড়ো হয়ে গেছি। স্যার, আমি তো **পুলিশ**কে বলেছি যে, আমি ফেঁসে গেছি। আমার আর বেশি কিছু বলার নেই।

বলার অনেক কিছু আছে। আপনি ঠিকমতো চেষ্টা করলে হয়তো ভাইটাল কোনো ক্লু পাওয়া যেত। বিশেষ করে নন্দিনী সম্পর্কে।

নন্দিনী সম্পর্কে আমি তো প্রায় কিছুই জানি না স্যার। যেটুকু জানা ছিল বলেছি।

আপনার পাসওয়ার্ড কি আপনি কাউকে জানিয়েছেন, বা কোথাও লিখে রেখেছিলেন?

না স্যার। আমি সজ্ঞানে অন্তত করিনি।

কিন্তু পাসওয়ার্ড নন্দিনী জানত। সেটা কীভাবে সম্ভব?

আমার কথা যে কেউ বিশ্বাস করছে না তা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার তো কিছুই করার নেই।

আপনার বেডরুম আর শিবাঙ্গীর বেডরুম কি আলাদা?

হ্যাঁ স্যার। পাশাপাশি।

বরাবর কি এরকমই বন্দোবস্ত ছিল? দুজন দুই ঘরে?

না। আগে আমরা একই বেডরুম আর বেড শেয়ার করতাম। পরে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকায় এই সিস্টেম চালু হয়।

দুই ঘরের মধ্যে একটা লিংকিং দরজা আছে। সেটা কি বন্ধ থাকত?

হ্যাঁ স্যার। শিবাঙ্গীর দিক থেকে বন্ধ থাকত।

আর হলঘরের দিকের দরজাটা?

শিবাঙ্গীর কথা জানি না। তবে আমার বেডরুমের হলঘরের দরজাটা লক করা থাকত না। কারণ, আমার ঘরে তেমন কোনো ভ্যালুয়েবলস নেই। আমার হাতঘড়িটা বেশ দামি, আর মোবাইল ফোনটাও। আর হ্যাঁ, ল্যাপটপ। এগুলোর জন্য দরজা লক করার দরকার ছিল না। বাইরে সিকিউরিটি আছে, ফ্ল্যাটের দরজাও রাতে বন্ধ থাকে।

আমি চুরির কথা ভাবছি না। একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন করছি। জবাবটা এড়িয়ে যাবেন না।

আমার লুকোনোর কিছু নেই।

শিবাঙ্গীর সঙ্গে আপনার সেক্সচুয়াল রিলেশন কি একদম ছিল না?

সেই অর্থে ছিল না বললেই হয়।

তার মানে কখনো-সখনো আপনারা মিলিত হতেন কি?

স্যার, সত্যি কথা বলতে কী, আমার দিক থেকে কোনো উদ্যোগ ছিল না। আপনাকে তো আগেই বলেছি, আমি শিবাঙ্গীকে খুব ভয় পেতাম। ওর সামনে খুব পাপবোধে ভুগতাম। নিজেকে ছোটো মনে হত। কিন্তু শিবাঙ্গী কখনো-সখনো চলে আসত গভীর রাতে। অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ দ্যাট।

কিন্তু আপনি তো রোজই মদ্যপান করে ঘুমোতেন?

কম বা বেশি এবং প্রায় রোজই। কিন্তু কখনো-সখনো বাদও গেছে। আমার দাদু গত বছর অনেক বয়সে মারা যান। হি ওয়াজ মাই মেন্টর। দাদুর মৃত্যুর পর আমি দিন পনেরো এক ফোঁটাও মদ খাইনি। আমি খুব একটা রিলিজিয়াস লোক নই, তবু পুজো-টুজোর দিনে আমি মদ খাই না।

আপনার কাজের লোকেরা অবশ্য তাই বলেছে। কিন্তু এবার আমি আপনাকে একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন করতে চাই।

করুন স্যার।

শিবাঙ্গীর সঙ্গে লাস্ট কবে আপনার ফিজিক্যাল রিলেশন হয়েছে?

একটু ভেবে বলতে হবে স্যার। দু'মিনিট।

ভাবুন।

মে মাসের শেষ দিকে। বোধহয় চব্বিশ বা পঁচিশ তারিখে।

ভেবে বলছেন তো!

খুব অ্যাকুরেট না হলেও দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা দিন। আর তার আগে, মে মাসের ষোলো তারিখে।

শিওর?

মোটামুটি শিওর।

আপনি কি ড্রাংকেন অবস্থায় এনগেজড হয়েছিলেন?

অন্তত খুব একটা সচেতনও ছিলাম না।

আপনি আপনার স্ত্রীর হোয়ার-অ্যাবাউটস সম্পর্কে কতটা খবর রাখেন?

খুব একটা নয়। উই লেড সেপারেট লাইভস।

উনি কি এসে আপনাকে ডেকে ঘুম থেকে তুলতেন?

না। কখন আসত আমি টের পেতাম না। এমব্রেস করত, চুমু খেত। অ্যান্ড...

বুঝেছি। আপনার কখনও সন্দেহ হয়নি যে মহিলাটি শিবাঙ্গী নাও হতে পারে?

কী বলছেন স্যার? ইমপসিবল! শিবাঙ্গী ছাড়া অন্য কেউ হতেই পারে না।

উত্তেজিত হবেন না বিষাণবাবু। এই ফ্ল্যাটে আপনি, শিবাঙ্গী আর নন্দিনী ছাড়া আর কেউ কি রাত্রিবাস করে?

জাহ্নবী। ও মেয়েটা শিবাঙ্গীর খুব ন্যাওটা। অল্প বয়স থেকে আছে। শুনছিলাম, শিবাঙ্গী তার বিয়ের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু এসবই তো পুলিশ জানে স্যার।

হ্যাঁ। তবু জানার তো শেষ নেই বিষাণবাবু। ফর ইওর ইনফর্মেশন মে মাসের চব্বিশ আর পঁচিশ তারিখে শিবাঙ্গী কলকাতায় ছিল না। ব্যাঙ্গালোর গিয়েছিল।

।। দুই ।।

জাহ্নবী গাড়ি চালাতে শিখে গিয়েছিল মাত্র পনেরো বছর বয়সে। রঘুবীর সিং শিখিয়েছিল ম্যাডামের হুকুমে। সবে যখন ষোলোয় পা তখন একদিন ম্যাডাম নিয়ে গেল তার ড্রাইভিং লাইসেন্স করাতে। বয়সের গড়বড় তো ছিলই, কিন্তু ম্যাডাম কলকাঠি নেড়ে বয়স বাড়িয়ে লাইসেন্স বের করে দিয়ে বললেন, এখন থেকে তুই আমার গাড়ি চালাবি।

জাহ্নবীর বুক ধড়ফড়, ওরে বাবা! কলকাতার রাস্তায় আমি চালাব?

ভয় পেলে থাক। কিন্তু সাহস করলে পেরে যাবি। আমি তোর চেয়েও অল্প বয়সে গাড়ি চালিয়েছি।

জাহ্নবীর সাহসের অভাব ছিল না। প্রথম কয়েকদিন ম্যাডাম সামনের সিটে তার পাশে বসে একটু-আধটু গাইড করত। মাসখানেকের মধ্যে হাত-পা সব সেট হয়ে গেল। সেই থেকে সে ম্যাডামের ড্রাইভার।

ওখানেই থেমে থাকতে দেয়নি ম্যাডাম। বাড়িতে ম্যাডামের যে সব বিউটিশিয়ান আসত তাদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে ভ্রূ প্লাক, ম্যানিকিওর, পেডিকিওর, মাস্ক তৈরি করা এবং কয়েক রকমের চুলের ছাঁট দিতেও শিখেছে সে। ম্যাডামের একটাই কথা ছিল, ট্রেনিং থাকলে ঝি খেটে মরতে হবে না, বুঝলি?

জাহ্নবীর এখন সতেরো বছর বয়স। ছিপছিপে জোরালো চেহারা। ম্যাডাম নিজের সঙ্গেই তাকে জিম করাত, ওয়েট ট্রেনিং আর যোগা। জাহ্নবী বুঝতে পারছিল, ম্যাডাম তাকে তৈরি করে দিচ্ছেন। ম্যাডামের পারফিউম ল্যাবেও সে কাজ করে। ভারী মজার কাজ। কনসেনট্রেটেড নির্যাস থেকে ব্যবহারযোগ্য পারফিউম তৈরি করা, খুব বড় ব্যবসা নয়। মাত্র কয়েকজন বাঁধা খদ্দের। তৈরি হতে না হতে বিক্রি হয়ে যায়। দামও খুব চড়া।

সতেরোতে এসে সব উল্টেপাল্টে গেল। ম্যাডাম হাসপাতালে আই সি ইউ-তে। বাঁচেন কিনা সন্দেহ। নন্দিনী ম্যাডাম খুন। পুলিশের জেরায় জেরায় ঝাঁঝরা হয়ে সে এখন বাধ্য হয়ে তাদের হাজরার বস্তিতে নিজের সংসারে এসে উঠেছে। ব্যাংকে তার অ্যাকাউন্টে টাকা কম নেই। মাসের বেতন ব্যাংকে জমা হয়ে যেত। কিন্তু এখন তার ভবিষ্যৎ কিছুটা অনিশ্চিত। কী হবে কে জানে। তবে জাহ্নবীর ভয়-ডর বিশেষ নেই।

তার মোটামুটি ভয়হীন জীবনে অনেকদিন বাদে হঠাৎ একটু যেন ভয়ের ব্যাপার ঘটল। খুন-জখম হয়ে যাওয়ার পর পুলিশের হুজ্জতে হয়রান হয়েও ভয়-টয় বিশেষ হয়নি তার। কিন্তু সোমবার সকালে জিনস-এর প্যান্ট আর সাদা হাওয়াই শার্ট পরা যে লোকটা তার সঙ্গে কথা বলতে এল তার চোখের দিকে এক পলক তাকিয়েই বুকটা ধড়পড় করে উঠল তার। অথচ লোকটা তেমন লম্বা-চওড়া নয়। বরং একটু ছোটোখাটো চেহারাই। পালোয়ানি শরীরও নয়। তবে গড়নটা মজবুত। কিন্তু চোখ দুটোই হাড় হিম করা। কাল রাতে মোবাইলে বড়বাবু তাকে ফোন করে বলে দিয়েছিলেন, সকালে সে যেন কোথাও না যায়, একজন গোয়েন্দা তাকে প্রশ্ন করতে আসবে।

যে এল তার নাম শবর দাশগুপ্ত। জিপ থেকে নেমে গলির রাস্তায় পা দিতেই বাচ্চু ছুটে এসে খবর দিল জাহ্নবীকে, কে এসেছে জানিস? শবর দাশগুপ্ত। সুপার কপ।

শবর দাশগুপ্তকে একটা চেয়ার দেওয়া হল। গোমড়ামুখো নয়। আবার বোকা-বোকা হাসিও নেই মুখে। চারদিকে চেয়ে তাদের ঘরদোর একটু দেখল, তারপর তার দিকে চেয়ে বলল, এখানে কবে এসেছো?

ছয় তারিখে।

শিবাঙ্গীর বাড়িতে কতদিন আছো?

তেরো বছর বয়স থেকে।

তেরো বছর!

হ্যাঁ।

তেরো বছর বয়সের কাউকে কাজে রাখা বে-আইনি তা জানো?

বাঃ রে! আমি যখন আমার মায়ের কাছে থাকতাম তখনও তো ঘরের কাজ করতে হত। সাত-আট বছর বয়স থেকেই জল আনা, বাসন মাজা, ঘর ঝ্যাঁটানো, ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করা, সব। সেটা বে-আইনি নয়?

শবর এবার হাসল। ঝকঝকে সাদা দাঁত। তাকে আর একবার ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, শুনেছি তুমি ষোলো বছর বয়স থেকেই গাড়ি চালাও!

হ্যাঁ। ম্যাডাম আমাকে সব কাজে পাকা করতে চেয়েছিলেন। আমি এক বছর যাবৎ গাড়ি চালাচ্ছি। কখনো কোনো অ্যাকসিডেন্ট করিনি। কোনো কেস খাইনি।

হ্যাঁ। আমি তোমার রেকর্ড চেক করেছি।

আপনি কি আমার লাইসেন্স ক্যানসেল করে দেবেন?

না। ওটা মোটর ভেহিকলস ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার। আর তুমি যখন গাড়ি ভালোই চালাও তখন আমার গরজ কিসের?

থ্যাংক ইউ।

তুমি পুলিশের জেরায় বলেছ, ঘটনার সময়ে তুমি বাড়িতে ছিলে না।

না। পুলিশকে আমি তো বলেইছি যে সেই রাতে আমি ম্যাডামের বোন শ্যামাঙ্গীকে রিসিভ করতে এয়ারপোর্টে গিয়েছিলাম বড়ো গাড়িটা নিয়ে। রাত বারোটায় সিঙ্গাপুর এয়ারলাইনসের ফ্লাইট ল্যান্ড করার কথা ছিল।

রাতের ফ্লাইটে রিসিভ করতে তোমাকে পাঠানো হয়েছিল কেন?

ওটা ইমার্জেন্সি ছিল। রঘুবীর সিং-এর মায়ের দয়া হয়েছিল সেদিনই সকালে। তাই ম্যাডাম আমাকে পাঠান।

তুমি একা?

না। সঙ্গে বুম্বা ছিল।

বুম্বা মানে ইস্তিরিওয়ালা? নীচে যার গুমটি আছে?

হ্যাঁ। শ্যামাঙ্গী ম্যাডামের ফ্লাইট আধঘণ্টা লেট ছিল। রাত একটায় আমি ওঁকে পিক আপ করি। তারপর সোজা বারুইপুর। ফেরার সময় অবশ্য বুম্বা বাইপাসে সায়েন্স সিটির কাছে নেমে ফিরে আসে।

তুমি রাতে বারুইপুরে শ্যামাঙ্গীদের বাড়িতেই ছিলে?

হ্যাঁ। অত রাতে ওঁরা ফিরতে দিলেন না।

তুমি কখন খবর পাও?

খবর পাইনি। শ্যামাঙ্গী ম্যাডাম অনেকবার আমাদের ম্যাডামকে ফোন করেন। নন্দিনী ম্যাডামের নম্বরেও ফোন করা হয়। নো রিপ্লাই। আমরা ভাবলাম ম্যাডামরা বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছেন। শোওয়ার সময় ম্যাডাম ফোন সাইলেন্ট মোডে রেখে শুতেন। ওঁর ঘুমের প্রবলেম ছিল।

ওখান থেকে কখন ফিরে এসেছিলে?

সকালে ব্রেকফাস্টের পর। রাতেই আমি ম্যাডামকে একটি মেসেজ করে রেখেছিলাম যে, সকালে ফিরব। আমি সাড়ে আটটায় পৌঁছাই এসে। তখন পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। বাইরেও খুব ভিড়।

তুমি কি শিবাঙ্গীর সঙ্গে ফ্ল্যাটের মধ্যেই থাকো?

সবসময়ে নয়। সারভ্যান্টস কোয়ার্টারে আমার ঘর আছে। তবে অনেক সময়েই ম্যাডাম রেখে দিতেন।

নন্দিনী ম্যাডাম সম্পর্কে কিছু বলবে?

সব বলা হয়ে গেছে। তিন-চারবার করে। আর কী শুনবেন?

যা বলা হয়নি! ধরো যদি জিজ্ঞেস করি বিষাণ রায়ের সঙ্গে নন্দিনীর সম্পর্কটা কেমন ছিল। বা তুমি ওই দুজনের মধ্যে কিছু লক্ষ করেছো কিনা।

না, কিছু ছিল না। দাদা ভীষণ ভাল লোক। ভীষণ ভাল।

বিষাণ রায়কে কি তুমি দাদা বলে ডাকো?

হ্যাঁ।

তাহলে শিবাঙ্গীকে বউদি নয় কেন?

উনি বউদি ডাক পছন্দ করেন না।

তুমি বিষাণ রায়কে পছন্দ করো?

কেন করব না? দাদা খুব ভাল।

বিষাণ মদ খায়, জানো তো!

ধুস। আজকাল কে না খাচ্ছে! ম্যাডাম খেতেন, নন্দিনী ম্যাডাম খেতেন, আমিও কতদিন খেয়েছি।

বুঝলাম। বিষাণের কী কী গুণ আছে বলতে পারো?

আমি তো অত জানি না। তবে দাদা কখনো মিথ্যে কথা বলে না, কখনো চেঁচামেচি করে না, কখনো কাউকে অপমান করে না, ম্যাডাম দাদাকে যা খুশি বললেও দাদা কখনো উলটে কিছু বলে না। মদ খাওয়া ছাড়া দাদার মধ্যে আমি কখনো কোনো বেচাল দেখিনি। আর ম্যাডাম ইচ্ছে করলেই দাদাকে মদ ছাড়াতে পারতেন।

কীরকম?

দাদা তো ম্যাডামকে ভীষণ ভয় পায়।

ভয় পায় কেন?

ম্যাডামের সব ভাল, কিন্তু বড্ড রগচটা। খুব সামান্য কারণেই ভীষণ রেগে যান। দাদা ওই রাগকেই বোধহয় ভয় পায়।

শিবাঙ্গীর সঙ্গে নন্দিনীর কীরকম ভাব ছিল?

দুজন তো বন্ধু। ভাব তো ভালই ছিল।

দুজনের কখনো ঝগড়া হত না?

ম্যাডামের সঙ্গে ঝগড়া! পাগল নাকি? ম্যাডামের চোখে চোখ রেখে কেউই কথা বলতে পারত না।

তুমিও কি ম্যাডামকে ভয় পাও?

ও বাবা! সাঙ্ঘাতিক। তবে হ্যাঁ, ম্যাডাম আমাকে খুবই ভালবাসেন।

অথচ ম্যাডামের চেয়ে বিষাণ রায়ের প্রতিই তোমার পক্ষপাত বেশি। তাই না?

জাহ্নবী হেসে ফেলল। তারপর বলল, কী করব, দাদা যে বড্ড বেচারা মানুষ। দেখলেই মায়া হয়।

যদি প্রমাণ হয় যে বিষাণ রায়ই নন্দিনী আর শিবাঙ্গীকে খুন করার পিছনে রয়েছে?

মরে গেলেও বিশ্বাস করি না। আপনি তো দাদাকে চেনেন না। একদিন সকালে ব্রেকফাস্টের সময় একটা বড় নীল মাছি চলে এসেছিল টেবিলের ওপর। রাঁধুনি নিতাইদা সেটাকে একটা ফ্লাই স্লাটার দিয়ে মারে। দাদা তো প্রায় কেঁদেই ফেলেছিল, কেন মারলি? কেন মারলি? বলে চোখ ছলছল। ভাল করে খেলই না সেদিন।

তুমি তো দেখছি বিষাণ রায়ের ডাই হার্ড ফ্যান!

হ্যাঁ তো। দাদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।

দাদাও কি তোমাকে ইকোয়্যলি ভালবাসে?

দাদা! নাঃ, দাদা তো বাড়িতে কারো সঙ্গে কথাই বলে না। কারও দিকে তাকিয়েও দেখে না। খুব চুপচাপ থাকে। আমার তো মনে হয় রাস্তায়-ঘাটে আমাকে মুখোমুখি দেখলে দাদা চিনতেও পারবে না।

বিষাণ রায় কি এতটাই অন্যমনস্ক?

ভীষণ। কিন্তু গম্ভীর মানুষ নয়। রাশভারী মানুষকে দেখলে যেমন ভয়-ভয় করে, দাদাকে দেখলে তেমনটা হয় না।

তোমার সঙ্গে কখনও কথা-টথা বলে না?

খুব কম। দাদা ফাইফরমাশ করতে পছন্দ করে না। তবে আমি মাঝে মাঝে গিয়ে ঘরটা একটু গুছিয়ে দিতাম।

ড্রাংক অবস্থায় বমি করলে তুমি কি কখনো ওঁকে অ্যাটেন্ড করেছো?

বমি-টমি খুব একটা করে না তো! একবার বা দু'বার গিয়ে ধরেছিলাম। অনেকদিন আগে। আর একবার জ্বর হয়েছিল, তখন জোর করেই মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলাম।

জোর করে কেন?

তখন ওঁর একশো চার ডিগ্রি জ্বর। বিছানা থেকে ওঠার শক্তি নেই। আমি মাথা ধোয়াতে চাইলে খুব আপত্তি করতে লাগলেন। কিন্তু আমি দেখলাম, মাথা না ধোয়ালে জ্বর হয়তো আরো বাড়বে। তাই নিতাইদাকে ডেকে এনে অয়েল ক্লথ বিছিয়ে একরকম জোর করে অনেকক্ষণ ধরে মাথা ধুইয়ে দিয়েছিলাম। তাতে খুব খুশি ছিলেন। জ্বর ছাড়বার পর একদিন আমাকে ডেকে দুশো টাকা দিয়ে বললেন, শাড়ি-টাড়ি কিছু কিনে নিও। আমি টাকা নিলাম না। বললাম, বাড়ির লোক সেবা করলে কি বকশিশ দিতে হয়! কথাটা ওঁর ভালো লেগেছিল।

বিষাণের সঙ্গে তোমার শেষ কবে দেখা হয়েছে?

রোজই তো হয়। কালও গিয়েছিলাম। আজও যাব। নার্সিংহোমে ম্যাডামকে দেখতেও যাই দু'বেলা।

তোমার তো ও বাড়িতেই থাকার কথা।

সেটা তো ভাল দেখাবে না। শত হলেও আমি তো বয়সের মেয়ে, দাদার সঙ্গে একা বাড়িতে থাকি কী করে? সকালে গিয়ে গাড়িটায় স্টার্ট দিই। ডাস্টিং করি। দাদার ঘর, ম্যাডামের ঘরও ডাস্টিং করতে হয়।

বিষাণবাবুর সঙ্গে মার্ডার নিয়ে কোনো কথা হয়েছে?

মার্ডার নিয়ে এত কথা হচ্ছে যে আর ওসব নিয়ে কথা কইতে ইচ্ছে করে না। দেখছি দাদা আজকাল ড্রিংক করছেন না, ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়াও করছেন না। সারাদিন চুপচাপ বসে থাকেন, না হলে কম্পিউটারে কাজ করেন। দাড়ি বড়ো হয়ে গেছে। ওঁর খেয়াল রাখার তো কেউ নেই। আমার খুব কষ্ট হয়, কিন্তু কিছু বলতে সাহস হয় না। শুনছি পুলিশ নাকি ওঁকে অ্যারেস্ট করবে?

হ্যাঁ, তা পারে।

কিন্তু সেটা খুব ভুল হবে। দাদা ওরকম লোক নয়।

তাহলে খুনটা কে করেছে বলে তোমার মনে হয়?

আমি জানি না তো!

নন্দিনীর সঙ্গে বা তোমার ম্যাডামের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল জানো?

না। নন্দিনী ম্যাডাম তো সারাদিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। আর কাজের লোকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটাও ওঁর কাজ ছিল। ফ্ল্যাটটা ছয় হাজার স্কোয়ার ফুটের। টুইন ফ্ল্যাট। অন্য ফ্ল্যাটটা তো ফাঁকাই পড়ে থাকে। তবু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে হয়।

তোমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই?

বয়ফ্রেন্ড! নাঃ, আমার কোনো বয়ফ্রেন্ড নেই।

কেন নেই?

কেন থাকবে? আজকালকার ছেলেগুলোকে দেখেছেন? সারাদিন ছোঁক ছোঁক করে মেয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে। যখন একা গাড়ি চালাই প্রায় সময়েই কিছু পয়সাওলা ছেলেছোকরা গাড়ি করে পিছু নেয়। পাশাপাশি এসে জানালা দিয়ে খারাপ খারাপ কথা বলে। আপনিই বলুন, এদের কাউকে বয়ফ্রেন্ড বলে ভাবা যায়?

তুমি তো খুব চুজি দেখছি!

একটু আছি।

বলতে পারো নন্দিনী ম্যাডামের কোনো অ্যাফেয়ার ছিল কিনা।

ঠিক জানি না, উনি তো খুব আপনমনে থাকতেন।

ওঁর বয়স সাতাশ-আঠাশ, চেহারা ভাল। ওঁর তো কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকারই কথা। কখনো কারো সঙ্গে ওঁকে দেখেছো?

না।

নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে তোমার কেমন ভাব ছিল?

ছিল না স্যার। উনি আমাকে পছন্দ করতেন বলে আমার মনে হয় না।

কেন, তুমি কী করেছো?

কিছুই তো করিনি।

অপছন্দটা কীভাবে বুঝতে পারতে?

ওসব বোঝা যায়। আমাকে দেখলেই মুখটা আঁশটে হয়ে যেত।

ব্যস? ওটুকুই?

না। আরো অনেক ব্যাপার ছিল। ছোটোখাটো ব্যাপার। তবে আমাকে ম্যাডাম তো বাইরের কাজেই বেশি পাঠাতেন, তাই আমাকে নন্দিনী ম্যাডামের মুখোমুখি বেশি হতে হত না।

তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। শুনে হয়তো তোমার ভাল লাগবে না।

কী কথা?

আমার সন্দেহ নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে বিষাণ রায়ের একটা অ্যাফেয়ার চলছিল।

অসম্ভব।

অসম্ভব কেন? বিষাণবাবুর সঙ্গে শিবাঙ্গীর সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিষাণবাবু একজন অ্যাট্রাকটিভ মানুষ এবং প্রচুর টাকার মালিক। নন্দিনী যথেষ্ট সুন্দরী, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী। অ্যাফেয়ার তো হওয়াই স্বাভাবিক।

দাদা নন্দিনী ম্যাডামকে পাত্তাই দিত না।

কী করে বুঝলে?

বুঝবো না কেন? আমার কি ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ নেই?

আছেই তো! এবং চোখ দুটো খুব সুন্দর। কথাটা নিশ্চয়ই তোমাকে অনেকেই বলেছে!

জাহ্নবী লজ্জা পেয়ে মাথা নীচু করে একটু হাসল। তারপর বলল, ছাই সুন্দর।

জানতে চাইছি, ওই দুটো সুন্দর চোখ দিয়ে তুমি ঠিক কী কী দেখেছো যাতে মনে হতে পারে যে বিষাণ রায় নন্দিনী ম্যাডামকে পাত্তা দিতেন না!

ইদানীং দেখছিলাম নন্দিনী ম্যাডাম সকালের দিকে প্রায়ই দাদার ব্রেকফাস্টের সময় এসে উলটো দিকে বসতেন। বেশ সেজেগুজে।

সেজেগুজে?

মানে ঠিক খুব বেশি সাজ নয়। হয়তো একটা বেশ চটকদার কিমোনো পরলেন, চুলটা একটু কায়দা করলেন, অল্প মেক-আপ, হালকা লিপস্টিক। ওসব আপনি বুঝবেন না। মেয়েরা বুঝতে পারে।

তা তো ঠিকই। কিন্তু উনি হয়তো ওই সময়ে ব্রেকফাস্ট করতেই এসে বসতেন!

মোটেই না। ম্যাডাম বা নন্দিনী ম্যাডাম তো ব্রেকফাস্ট করেনই না। শশা, দই আর কয়েক টুকরো ফল।

তবে এসে বসতেন কেন?

বুঝে নিন।

দুজনে কথাবার্তা হত না?

নন্দিনী ম্যাডাম বা দাদা কেউই খুব একটা বলিয়ে-কইয়ে মানুষ নয়। নন্দিনী ম্যাডামকে দেখেছি টোস্টে বাটার লাগিয়ে দিতে। দরদ দেখানো আর কী। দাদা তো তাকিয়েও দেখত না।

তার মানে নন্দিনীর বিষাণের ওপর দুর্বলতা ছিল?

ছিল।

কখনো বাড়াবাড়ি কিছু দেখোনি?

বললাম তো দাদা পাত্তা দিত না।

ব্যাপারটা তোমার ম্যাডামকে জানিয়েছিলে?

বাপ রে! ম্যাডামকে কে বলতে যাবে?

তুমি কি জানতে যে তোমার ম্যাডামের একটা পিস্তল ছিল?

না। তবে ওই ঘটনার পর পুলিশের কাছে শুনেছি।

তুমি তো শিবাঙ্গীর ঘর গোছগাছ করতে, কখনো দেখোনি?

না। আমার তো ক্যাবিনেট বা লকার খোলার হুকুম নেই।

শিবাঙ্গী তো মাঝে মাঝে কলকাতার বাইরে যেত, তাই না?

হ্যাঁ। ওঁর ব্যবসার কাজে যেতে হত। দিল্লি, বোম্বে, ব্যাঙ্গালোর, সিঙ্গাপুর, ব্যাংকক।

ঘটনার আগে কবে শেষবার বাইরে গেছে বলতে পারো?

পারি। ম্যাডামের ট্যুর আমার মনে রাখতে হয়। মে মাসের ষোলো আর সতেরো তারিখে উনি বোম্বে গিয়েছিলেন। চব্বিশ আর পঁচিশ তারিখে দিল্লি।

সেই সময়ে কি নন্দিনী আর বিষাণ একা ফ্ল্যাটে ছিল?

না। ম্যাডাম বাইরে গেলে আমাকে ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকতে হত। ম্যাডামের ঘরে। অনেক দামি জিনিস আছে তো, তাই।

অর্থাৎ তোমাকে পাহারা দিতে হয়?

হ্যাঁ।

ম্যাডামের বিছানাতেই কি শোও?

বাপ রে! ম্যাডামের বিছানায় কে শোবে! ম্যাডাম কেটে ফেলবে তাহলে। আমার একটা ফোল্ডিং খাট আছে, সেটা পেতে শুই।

তার মানে মে মাসের ষোলো, সতেরো, চব্বিশ আর পঁচিশ তুমি ম্যাডামের ঘরেই রাতে শুয়েছিলে?

হ্যাঁ। কিন্তু এসব জিজ্ঞেস করছেন কেন? পুলিশ তো জিজ্ঞেস করেনি!

আমিও তো পুলিশ!

হুঁ। কিন্তু আপনি একটু অন্যরকম। ঠিক পুলিশ-পুলিশ মনে হয় না। বাচ্চু বলছিল আপনি নাকি সুপার কপ!

তা তো আমার জানা নেই! শুধু এটুকু জানি যে, আমি একজন পুলিশ কর্মচারী। তুমি বোধহয় জানো সেদিন রাতে শিবাঙ্গী নিজেকে বাঁচাতে তার পিস্তল থেকে এক রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। গুলিটা খুনিদের একজনের গায়েও লাগে। ঘরের মেঝেতে তার রক্তের দাগ পাওয়া গেছে!

জানি। সব শুনেছি। ম্যাডামের হেভি সাহস।

আমি শুনেছি তুমিও খুব সাহসী মেয়ে!

জাহ্নবী কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে একটা বখাটে হাসি হাসল। তারপর বলল, এ বাজারে সাহসী না হলে আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কি চলে?

মারপিট করো নাকি?

না, শুধু শুধু মারপিট করবো কেন? তবে দরকার হলে হাত-পা চালিয়ে দিই।

এরকম কোনো ঘটনা কি ঘটেছে?

জাহ্নবী আবার হাসল, কেস দেবেন না তো স্যার?

আরে না। মেয়েরা মারপিট করলে আমি খুশিই হই।

তিন-চারবার মারপিট হয়েছে। বদমাশ ছেলেদের সঙ্গে।

বদমাশ ছেলেদের সঙ্গে! তুমি তো সাঙ্ঘাতিক মেয়ে! মেরেছো, না মার খেয়েছো?

মারপিট করলে মার খেতেও হয়। কোনো হিরো তো আর আমাদের বাঁচাতে আসে না, সিনেমার মতো।

ঠিক কথা। মেয়েরা হিরোর জন্য হা-পিত্যেশ করে বসে থাকবেই বা কেন? প্রত্যেকটা মেয়ের নিজেরই হিরো হয়ে ওঠা উচিত।

থ্যাংক ইউ স্যার। একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

করো।

দাদাকে কি আপনারা অ্যারেস্ট করবেন?

সেটা তদন্তের ওপর নির্ভর করছে। খুনিরা ধরা পড়ে গেলে এবং তোমার দাদার নাম বললে অ্যারেস্ট তো হবেই।

না স্যার, দাদার নাম বলবে কেন?

বলবে না, তুমি কী করে জানো?

দাদা ও কাজ করতেই পারে না।

বাইরে থেকে দেখে মানুষকে আর কতটুকু চেনা যায়! তবে এখনই অ্যারেস্ট করা হচ্ছে না, এটুকু বলতে পারি। কিন্তু তোমার দাদার চেয়েও তোমার ম্যাডামের বিপদ বেশি। তার হেড ইনজুরি, কোমায় আছেন। বাঁচার সম্ভাবনা মাত্র ত্রিশ পারসেন্ট। তার জন্য তোমার টেনশন হচ্ছে না?

হচ্ছে। খুব হচ্ছে। কিন্তু কাল ডাক্তার সেন দাদাকে বলেছেন, ম্যাডামের প্রাণের ভয় নেই। আমি নিজে শুনেছি।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ স্যার। কাল দাদাকে আমিই তো গাড়ি চালিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেছি।

তুমি কেন? বিষাণের তো আলাদা গাড়ি আছে।

আছে। কিন্তু ওঁর মনের যা অবস্থা, গাড়ি চালাতে গেলে অ্যাকসিডেন্ট করে বসবেন।

হুঁ। সে কথা ঠিক। উনি খুব নার্ভাসনেসে ভুগছেন।

খেতে চাইছেন না, ঘুমোচ্ছেন না ভালো করে। ওজন কমে অর্ধেক হয়ে গেছে। গালে বড়ো বড়ো দাড়ি। আমি গিয়ে হাতে-পায়ে ধরে খাওয়াই।

তুমি বললে খান?

খুব বিরক্ত হন। তবে সামান্য একটু মুখে তোলেন।

কতক্ষণ থাকো ওঁর কাছে রোজ?

কাছে থাকা তো সম্ভব নয়। উনি কম্পিউটারে কাজ করেন, কাগজ বা বই পড়েন, টেলিফোনে কথা বলেন। আজ তো পুলিশের পারমিশন নিয়ে অফিসেও যাবেন শুনেছি।

হ্যাঁ, ওঁকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে।

ওঁকে ছেড়ে দিন স্যার। উনি কিছু করেননি।

কিন্তু কেউ তো করেছে! সেটা না জানা অবধি ওঁকে তো সন্দেহের বাইরে রাখতে পারি না।
ওরকম ভাল একটা লোককে সন্দেহ করা কি ঠিক?

।। তিন ।।

কেমন আছেন ম্যাডাম?
আপনি কে বলুন তো! আপনাকে কি আমি চিনি?
না, আমাদের পূর্ব পরিচয় নেই। আমার নাম শবর দাশগুপ্ত। আমি পুলিশের গোয়েন্দা।
ওঃ। হ্যাঁ, এরা বলে রেখেছিল যে, পুলিশ থেকে কেউ আমাকে জেরা করতে আসবে।
না ম্যাডাম, জেরা নয়। জাস্ট একটু কনভারসেশন। কিন্তু আপনি এখন কেমন আছেন?
ভাল নেই। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা, তাকাতে কষ্ট হয়। তার চেয়েও বেশি কষ্ট মনের মধ্যে। আচ্ছা, আমি কি একটা লোককে খুন করেছি? সবাই বলছে আমি খুন করিনি। কিন্তু ওরা বোধহয় সত্যি কথাটা আমাকে বলতে চায় না। আপনি তো পুলিশ। আপনি তো জানেন আমি গুলি চালিয়ে একটা লোককে মেরে ফেলেছি!
না। আপনার গুলিতে সামান্য জখম হলেও কেউ মরেনি।
জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমি বড্ড পাপবোধে ভুগছি। অনুশোচনায় বুক পুড়ে যাচ্ছে।
অনুশোচনার কী আছে? আপনার ঘরে একজন ইনট্রিউডার ঢুকলে তার বিরুদ্ধে আপনি অ্যাকশন নিতেই পারেন। আমার মতে আপনি ঠিক কাজই করেছেন এবং সাহসের সঙ্গে।
পিস্তলটা জীবনে কখনো ব্যবহার করতে হবে বলে ভাবিনি। তাছাড়া কাউকে লক্ষ্য করেও গুলি চালাইনি। ভেবেছিলাম দেয়ালের দিকে তাক করে ফায়ার করবো, আর ওরা ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে।
ওরা অত সহজে ভয় পাওয়ার পাত্র নয়।
ওরা কারা বলুন তো!
সুপারি কিলার বললে বুঝতে পারবেন?
ওসব আজকাল সবাই বোঝে। আমি যাকে গুলি করেছি সে তাহলে বেঁচে আছে তো!
আছে বলেই মনে হয়। তবে সে ধরা পড়েনি, পালিয়ে গেছে।
লুটপাট করতে এসেছিল তো!
মনে হয় না। আপনার ঘর থেকে কিছু চুরি গিয়ে থাকলে আপনি ছাড়া আর কেউ ভাল করে বুঝতে পারবে না। তবে চুরি বা ডাকাতিটা উদ্দেশ্য ছিল না।
সুপারি কিলার বললেন না? তার মানে কন্ট্রাক্ট কিলার তো?
হ্যাঁ।
আমাকে মারতে এসেছিল?
তাই তো মনে হয়।
কিন্তু কেন?
সেটাই তো এখন লাখ টাকার প্রশ্ন, কেন?
ভারী আশ্চর্য ব্যাপার তো! আমাকে কেন খুন করবে কেউ? আমি তো কারও কোনো ক্ষতি করিনি! ভাবতেই যে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে!
উত্তেজিত হবেন না। আমি তো শুনেছি আপনি একজন তেজস্বিনী মহিলা।
কে বলেছে?
সবাই তো বলছে।
তেজস্বিনী-টিনি নই। তবে সাহসী বলতে পারেন। কিন্তু এই ঘটনার পর সব উলটে-পালটে গেছে। খুব ভয় ভয় করছে এখন।

মাত্র গতকাল বিকেলে আপনার জ্ঞান ফিরেছে। এখনও আপনি খুব দুর্বল। আর শরীর দুর্বল থাকলে মনটাও ওরকমই হয়ে যায়।

বোধহয় তাই।

সংক্ষেপে ঘটনাটা একটু বলতে পারেন?

ঘটনা! ঘটনাটার তো মাথামুন্ডুই নেই।

সেইটেই বলুন।

আমরা একটু আরলি শুতে যাই রাতে। ধরুন দশটা নাগাদ। খুব প্রয়োজন ছাড়া কখনো লেট-নাইট করি না। টিভি সিরিয়াল দেখার নেশা আমার নেই। তবে নন্দিনী বেশ রাত অবধি দেখে থাকে। 'ওয়ার্কহোলিক'। কাজ ছাড়া থাকতে পারে না। আচ্ছা একটা কথা বলবেন?

কী কথা!

গতকাল থেকে আজ অবধি নন্দিনী তো আমাকে দেখতে এল না? এরা এই হাসপাতালে পেশেন্টদের মোবাইল ফোন অ্যালাউ করে না। তবু আজ সকালে এক সিস্টারকে ধরেকরে ফোন করিয়েছিলাম। কিন্তু নন্দিনীর ফোন সুইচ অফ আসছে। কী ব্যাপার বলুন তো!

কিছু না ম্যাডাম। আসলে ঘটনার ফলে উনি ভীষণ শকড। ওঁর নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়েছে। এখন নার্সিংহোমে ভর্তি।

ওঃ গড! নন্দিনীও হাসপাতালে?

হ্যাঁ। আপনি কি ওঁকে খুব মিস করছেন?

ভীষণ। ও তো আমার মেন্টর। আমার গ্রুমিং তো ও-ই করে।

হ্যাঁ, যা বলছিলেন—

সেদিন আমি রাত দশটায় শুয়ে পড়েছিলাম। আমার ঘুমের প্রবলেম আছে বলে সেডেটিভ খেতে হয়। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভেঙে ডিম লাইটে দেখি ঘরের মধ্যে দুটো লোক। তাদের মুখ বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু হাতে কিছু ছিল।

কী ছিল?

পিস্তল বা ওরকম কিছু।

কথা বলেছিল?

আমি চেঁচিয়ে উঠেছিলাম 'কে?' বলে। তখন সামনের লোকটার হাতে একটা ছোরাও দেখতে পাই। আমার বালিশের পাশেই আমার পিস্তলটা থাকে। কোনোদিন কাজে লাগবে বলে ভাবিনি। ওই বিপদের মুখে পিস্তলটার কথা মনেও পড়েনি। কিন্তু হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে গিয়ে হঠাৎ ডান হাতে পিস্তলটা পেয়ে যাই। একটুও ভাবনাচিন্তা না করে গুলি চালিয়ে দিতেই লোকটা 'যাঃ শালা!' বলে একটা আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

তারপর?

তার পরের ব্যাপারটা ব্ল্যাংক অ্যান্ড ব্ল্যাক আউট। পরে শুনেছি আমার মাথায় গুলি করা হয়েছে। কিন্তু মাথায় গুলি লাগলে তো আমার বেঁচে থাকার কথা নয়।

আবার বলছি, আপনি তেজস্বী মহিলা। আর হ্যাঁ, গুলিটা মাথায় লাগলেও ভাইটাল পার্টে লাগেনি। ফ্যাটাল ইনজুরি নয়। তবে সিরিয়াস ইনজুরি। আপনি প্রায় পনেরো দিন কনশাস ছিলেন না।

আমার গুলিতে সত্যিই কেউ মরেনি তো!

না। আর মরলেও ভারতের সংবিধান অনুযায়ী তাতে আপনি অপরাধী সাব্যস্ত হন না! আত্মরক্ষার জন্য খুন করা অপরাধ নয়।

সংবিধান নিয়ে কি আমাদের জীবন চলে? আমার হাতে কেউ খুন হয়ে থাকলে—সে গুন্ডা-বদমাশ যা-ই হোক, আমার নিজেকে বরাবর অপরাধী মনে হবে।

আপনি ওদের কারও মুখ দেখতে পেয়েছিলেন?

আমার ঘরে জোরালো আলো থাকে না। আর ঘুমের সময় আমি আলো সহ্য করতে পারি না বলে খুব কম পাওয়ারের একটা আলো জ্বালানো থাকে। ফলে ঘরটা একরকম আবছা অন্ধকার ছিল। দুটো লোককে দেখেছিলাম, আবছা ভাবে। তবে তারা পুরুষ, আর মনে হয় বয়স খুব বেশি নয়।

লম্বা না বেঁটে?

লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। গড়পরতা হাইট।

পোশাক?

এই তো, আপনি তো আমাকে শেষ অবধি জেরাই করছেন। তাই না? অথচ বললেন কনভার্স করতে চান!

শবর হেসে ফেলল। তারপর বলল, মাপ করবেন। কেসটা এমন ঘাড়ে চেপে আছে যে, বে-খেয়ালে আপনার ওপর প্রেশার ক্রিয়েট করে ফেলেছি হয়তো।

আপনার হাসিটা কিন্তু ভারী সুন্দর! আচ্ছা আপনি কি একটু শক্ত ধাতুর লোক?

ওকথা বলছেন কেন?

আপনার চোখ দুটো কিন্তু ভীষণ পেনিট্রেটিং! তাকালে যে কেউ একটু ভয় পাবে।

দয়া করে আপনি যেন ভয় পাবেন না। কারণ আমি ইতিমধ্যেই আপনাকে সাহসী বলে মনে করতে শুরু করেছি।

আপনাকে দেখে মনে হয় না যে, আপনি মহিলাদের কমপ্লিমেন্ট দিতে পারেন।

ফাঁকা কমপ্লিমেন্ট নয় ম্যাডাম। যাক গে, আর কিছু যদি মনে পড়ে তাহলে বলুন। খুব বেশি স্ট্রেস-এর দরকার নেই। জাস্ট চোখ বুজে একটু ভেবে দেখুন সেই রাতের আর কোনো ডিটেলস মনে পড়ে কিনা।

নিশ্চয়ই চেষ্টা করবো। কিন্তু আমি যখন মারা যাইনি আর ডাকাতরাও তেমন কিছু নিতে পারেনি তখন তদন্তের কি আর খুব একটা দরকার আছে? এখন থেকে একটু অ্যালার্ট থাকলেই তো হবে।

কিন্তু পুলিশকে তো শেষ পর্যন্ত তদন্ত করে দেখতেই হবে। আমরা তো এইজন্যই বেতন পাই।

তা অবিশ্যি ঠিক। আপনি যখন বলছেন তখন আমি নিশ্চয়ই সেই রাতের ডিটেলস মনে করার চেষ্টা করবো। এখানে আমার একটুও ভালো লাগছে না। কবে যে এরা ছাড়বে!

আপনার কামব্যাকটা খুব অ্যামেজিং। ডাক্তাররা আশাই করেনি যে আপনার এত কুইক রিকভারি হবে। মনে হয় আর দু-চারদিনের মধ্যেই আপনি ছাড়া পেয়ে যাবেন। বাই দি বাই, আপনার হাজব্যান্ডের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল শিবাঙ্গী। তারপর সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বলল, হয়েছে। বেশ রোগা হয়ে গেছে, মুখভর্তি দাড়ি-গোঁফ। চিনতেই পারিনি প্রথমে।

কখন দেখা হল?

আমার কনশাসনেস ফিরেছে শুনে কাল রাতেই এসেছিল। সঙ্গে জাহ্নবী।

তখন তো ভিজিটিং আওয়ার্স নয়।

আপনি জাহ্নবীকে চেনেন না, একটা বিচ্ছু। ও কয়েকদিন এসেই হাসপাতালের সকলকে পটিয়ে নিয়েছে। ও তো যখন-তখন আসে-যায় বলে শুনেছি।

হ্যাঁ, মেয়েটা বেশ বুদ্ধিমতী। আপনার খুব প্রিয়পাত্রী বুঝি?

আমার তো ছেলেপুলে নেই। ওর ওপর একটু মায়া পড়ে গেছে।

আপনি ওকে অল্পবয়সেই গাড়ি চালানো শিখিয়ে লাইসেন্স বার দিয়েছেন, শুনলাম।

মাই গড! কী বোকা! পুলিশের কাছে ওসব বলতে হয়?

ভয় নেই। আমরা আইনের পথ ধরে আর ক'জন চলি? তবে মাইনরের গাড়ি চালানো তার নিজের এবং অন্যদের পক্ষে বিপজ্জনক।

সরি শবরবাবু, কাজটা অন্যায় হয়ে গেছে। কিন্তু ওকে আমি একটু তাড়াতাড়ি পাকিয়ে তুলতে চেয়েছিলাম। পড়াশোনাটা হয়নি, আর সব কাজে পাকা।

ওর বোধহয় নন্দিনী ম্যাডামের সঙ্গে একটু ইগো প্রবলেম আছে!

কী করে বুঝলেন? কিছু বলেছে বুঝি?

ভেঙে বলেনি। তবে বুঝিয়ে দিয়েছে।

ওই তো প্রবলেম। অথচ নন্দিনীকে যে ও কেন পছন্দ করে না তাও বুঝি না বাবা।

নন্দিনীও কি ওকে অপছন্দ করে?

না না! নন্দিনী সেরকম মেয়েই নয়। ভীষণ বুদ্ধিমতী। আপনি নিশ্চয়ই নন্দিনীকে মিট করেছেন?

করেছি।

চার্মিং না?

উনি সুস্থ নন বলে আমার সঙ্গে বিশেষ কথা হয়নি। নন্দিনীর সঙ্গে আপনার কবে, কোথায় পরিচয়?

পরিচয় তো অনেক দিনের। আমার যখন ষোলো-সতেরো, ওর তখন চৌদ্দো-পনেরো। ওই সময়েই ওরা আমাদের পণ্ডিতিয়া টেরাসে ফ্ল্যাট ভাড়া করে এল।

অর্থাৎ যখন আপনার বয়স ষোলো-সতেরো আর নন্দিনীর চৌদ্দো-পনেরো?

একজ্যাক্টলি।

ওঁর ব্যাকগ্রাউন্ড?

খুব সাদামাটা। বাবা পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে চাকরি করতেন। ওরা দুই ভাই-বোন। ভাই ছোটো। আমাদের বেশ ভাব হয়ে গেল।

নন্দিনী বিয়ে করেননি কেন?

বিয়ে করেনি মানে করবে না তো নয়। মাত্র তো পঁচিশ বছর বয়স।

কোনো বয়ফ্রেন্ড?

না। একটু চুজি। আচ্ছা নন্দিনীকে নিয়ে আমরা কথা বলছি কেন?

কৌতূহল। যাক গে। আপনি তাড়াতাড়ি সেরে উঠুন।

এ জায়গাটা বড্ড বিচ্ছিরি। ঘরে টিভি নেই, খবরের কাগজ দেওয়া হয় না, মোবাইল বা ল্যাপটপ কিছুই অ্যালাউ করে না এরা। শুনেছি নাকি বাইরে পুলিশও চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা দেয়। সত্যি নাকি?

হ্যাঁ। সাবধানের মার নেই। আর আপনি আছেন আই সি ইউ-তে। এখানে খবরের কাগজ, টিভি, মোবাইল সব নিষিদ্ধ।

সারাদিন কথা না বলে বা কাজ না করে কি থাকা যায়?

এখন বিশ্রাম নিন। কাজের জন্য সামনে লম্বা সময় পড়ে আছে। আজ তো কথাও অনেক বলেছেন। আমিই বকিয়েছি আপনাকে। এবার আসি?

চলে যাচ্ছেন? আবার আসবেন কিন্তু।

হাসালেন ম্যাডাম। পুলিশকে কেউ আবার আসতে বলে না। পুলিশ মানেই বিপদ।

তা হতে পারে। কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলে আমার তো বেশ লাগল। আমি বাড়ি ফিরে গেলে একদিন চা খেতে আসবেন।

আপনি এখন বোর হচ্ছেন বলে আমার সঙ্গে কথা বলতে ভাল লাগছে। নইলে আই অ্যাম অ্যান আনকমফোর্টেবল কোম্পানি।

একদম নয়। আবার এসে দেখুন না আমি আনকমফোর্টেবল ফিল করি কি না।
ঠিক আছে ম্যাডাম। বাই।
দাঁড়ান, দাঁড়ান! একটা কথা হঠাৎ মনে পড়ল।
কী কথা?
একটা নাম।
কার নাম?
তা জানি না। তবে ব্ল্যাক আউট হওয়ার সময় কে যেন বলল, বাচ্চু, আর চালাস না...
বাচ্চু?
হ্যাঁ।
আর কিছু মনে পড়ছে?
না।
থ্যাংক ইউ ফর দি লিড।
ফের বলছি। আবার আসবেন।

।। চার ।।

দু-দিন পর এক ভোরবেলা পুলিশ বাদু মণ্ডলকে তুলে নিল তিলজলা থেকে। তার দু-দিন পর ভিক্টর ধরা পড়ল পার্ক সার্কাসে। দুজনেরই প্রাথমিক স্টেটমেন্ট, তারা ডাকাতি করতে ঢুকেছিল। খুন করার উদ্দেশ্য ছিল না। কেউ সুপারি দেয়নি। বাধা পড়ায় গুলি চালিয়ে দিতে হয়। একই বিবরণ বার চারেক চার পুলিশ অফিসারকে দেওয়ার পর অবশেষে একদিন শবর দাশগুপ্তের মুখোমুখি হতে হল তাদের। এবং সঙ্গে সঙ্গে তারা বুঝতে পারল, বিপদ!

এই সাদা পোশাকের, সাদামাটা চেহারার লোকটা উঁচু গলায় কথা অবধি বলে না। ভারী মোলায়েম ভাষায় কথা কয়। গালাগাল দেয় না। ফালতু গরমও খায় না। একবার দুটো বাঘা চোখে দুজনের দিকে চেয়ে নিয়ে চোখ নামিয়ে টেবিলের ওপর একটা পেপারওয়েট এক হাত থেকে অন্য হাতে এবং অন্য হাত থেকে ফের আগের হাতে গড়াতে গড়াতে বলল, টারগেট একজন না দুজন?

মাইরি স্যার, খুনখারাপি আমাদের লাইন নয়। ধরা পড়ার ভয়ে মেরে দিতে হল স্যার।

শবর প্রশ্ন না করে অনেকক্ষণ দুজনের দিকে চুপ করে চেয়ে বসে রইল। যেন গভীরভাবে কিছু ভাবছে। মিনিট দুয়েক পর একটা বড়ো শ্বাস ফেলে বলল, একটা প্রশ্নের জবাব না পেলে আমার অঙ্কটা মিলছে না। তোদের টারগেট ক'জন ছিল, একজন না দুজন?

দুজনেই মুখ তাকাতাকি করে চুপ করে রইল অধোবদন হয়ে।

ভিক্টর! তুই বলবি? আমার যতদূর মনে হয় সেই রাতে তুই অপারেশনটা লিড করেছিলি। বাদু নয়।

কাউকে মারার ইচ্ছে ছিল না স্যার, বিশ্বাস করুন। গোলেমালে হয়ে গেল। আমাদের আপশোশ হচ্ছে স্যার।

তুই যাকে বাঁচানোর চেষ্টা করছিস সে একজন মাইনর। যদি ধরা পড়ে তাহলে জুভেনাইল কোর্টে ট্রায়াল হবে। বড়োজোর দু-তিন বছর কারেকশনাল হোমে সাজা কেটে বেরিয়ে আসবে। তাকে বাঁচানোর চেয়ে তোর নিজের গর্দান বাঁচানো অনেক ইম্পর্ট্যান্ট!

ভিক্টর শুকনো মুখে বলে, আমাদের গর্দান তো যাবেই স্যার। আপনি কেস নিলে কি আমরা বাঁচবো?

কেস নেওয়ার আমার কি দায়? চার্জশিট দেবে লোকাল পুলিশ। কেস স্ট্রং হলে ঘষে যাবি। আর যদি দাদা-ফাদা থাকে তো চার্জশিটে জল ঢুকে যাবে। কোর্টে কত ক্রিমিনাল কেস ঝুলে আছে জানিস? শুনলাম, তোদের হয়ে একজন ঝানু উকিল মাঠে নেমেছে।

দুজনেই একটু অধোবদন। তারপর ভিক্টর মুখ তুলে বলল, কথাটা কি কোর্টেও বলতে হবে?
জিজ্ঞেস করলে বলবি, তোর যদি ইচ্ছে হয়।
আমাদের টারগেট একজন ছিল স্যার! নন্দিনী।
তাহলে শিবাঙ্গীর ঘরে ঢুকেছিলি কেন?
কাজটা তো গ্র্যাটিসের ছিল স্যার। আমরা কন্ডিশন করেই নিয়েছিলাম ল্যান্ডলেডির ঘর থেকে কিছু মাল্লু কামিয়ে নেবো। কিন্তু ঘুমপাড়ানি রুমাল বের করারই সময় পাইনি, উনি গুলি চালিয়ে দিলেন। মরেও যেতে পারতাম স্যার!
তারপর?
বাদু ভয় পেয়ে পালটা ফায়ার করে। আমি বারণ না করলে আবার গুলি চালিয়ে দিত। কাজটা অন্যায় হয়েছে স্যার। ব্রিচ অফ ট্রাস্ট। শিবাঙ্গীকে আমাদের মারার কথা নয়।
শবর চিন্তিত মুখে বলে, আমার অঙ্কটা তবু মিলছে না।
কিসের অঙ্ক স্যার?
তোদের হয়ে যে উকিল মাঠে নেমেছে তার নাম জানিস?
না স্যার। একজন সেপাই বলছিল আমাদের জামিনের জন্য নাকি একজন উকিল চেষ্টা করছে। কথাটা বিশ্বাস হয়নি। আমাদের মা-বাবারাও চায় যে, আমরা জেলে বন্ধ থাকি।
হুঁ। কিন্তু ওখানেই তো গণ্ডগোল। তোদের উকিলের নাম ব্রজবাসী দত্ত। কখনও নাম শুনেছিস?
দুজনেই একসঙ্গে বলে, না স্যার।
কলকাতার টপ ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ারদের মধ্যে একজন। অনেক টাকা ফি। টাকাটা কে দিয়েছে জানিস?
না স্যার।
আর ওখানেই অঙ্কটা মিলছে না।
শবর আবার কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। বলল, ঠিক আছে। আজ এই পর্যন্ত। দরকার হলে আবার আসবো।

* * *

সকালে আজ অনেকদিন বাদে আয়নায় মুখ দেখল বিষাণ। নিজের দাড়িগোঁফওলা এই মুখটা তার চেনা নয়। যেন একটা অচেনা লোক তার সামনে।
অনভ্যস্ত দাড়িতে গাল কুটকুট করছে। একবার ভাবল কেটে ফেলবে কিনা। তারপর ভাবল, থাক। তার বেশ কিছু দাড়ি পেকে গেছে, এটা সে এতদিন টের পায়নি। তাকে বোধহয় এখন একটু বয়স্ক দেখাচ্ছে।
বয়স্কই। সে অনেকদিন জগিং করেনি। কোনোরকম ব্যায়াম করেনি। ফলে এখন তার শরীরের গাঁটে গাঁটে ব্যথা। বেশি পরিশ্রম করতে পারে না। সে যে একসময়ে দারুণ স্প্রিন্টার ছিল, এ তার নিজেরই বিশ্বাস হয় না। গত পঁচিশ দিন সে মদ খায়নি। অসম্ভব টেনশনে মদ ভালো কাজ করে। কিন্তু তার তেমন ইচ্ছে হয়নি। প্রথম চার-পাঁচদিন মদ পেটে না থাকায় ঘুম হচ্ছিল না। এখন হচ্ছে। খুব গাঢ় ঘুম নয়, তবু হচ্ছে তো।
আজ রবিবার। একা একটা ছুটির দিন কীভাবে কাটাবে সেটাই চিন্তার বিষয়। দিনটাও ভালো নয়। রাত থেকে এক নাগাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। কে যেন বলছিল, নিম্নচাপ। তবে এটা বর্ষাকাল, বৃষ্টি তো হওয়ারই কথা।
লিভিং রুমে এসে খবরের কাগজটা তুলে নিয়ে চেয়ারে বসতেই চমকে উঠল সে। মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে একটা পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে শবর দাশগুপ্ত।
আরে আপনি! কখন এসেছেন?
মিনিট পাঁচেক।
খবর দেননি তো!

দরজায় নক করেছিলাম, আপনার কাজের লোকদের মধ্যে একজন দরজা খুলে দিয়েছে। আমার তাড়া নেই বলে আপনাকে খবর দিতে বারণ করেছিলাম।

বাঃ! আমার তো বোধহয় সময় হয়ে এল, তাই না?

কিসের সময়?

শুনেছি খুনিরা ধরা পড়েছে এবং তদন্তও শেষের মুখে। আমার স্ত্রীও নিশ্চয়ই তাঁর ভারশন পুলিশকে বলেছেন। আমি তো এখন দিন গুনছি।

কেন? খুনটা কি আপনি করিয়েছেন?

না। কিন্তু সে কথা কে বিশ্বাস করবে বলুন।

পুলিশ যে আপনাকেই সাসপেক্ট ভাবছে তা কী করে বুঝলেন?

গাট ফিলিং।

আপনার ফিলিং নির্ভুল নয়।

আপনি কি কিছু বলতে এসেছেন শবরবাবু? সিরিয়াস কিছু? আপনাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে!

আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই। বিরক্ত হবেন না তো!

আরে না। আমার লুকোনোর কিছু নেই। আমি চাই তদন্তটা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

আপনি কি কখনোই টের পাননি যে, নন্দিনী আপনার প্রতি আসক্ত?

এ প্রশ্নের জবাব তো দিয়েছি।

না দেননি। আপনি এড়িয়ে গেছেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে চিন্তিত মুখে রইল বিষাণ। তারপর বলল, আমার তেমন সূক্ষ্ম

অনুভূতি নেই।

তার মানে কী? একটু এক্সপ্যান্ড করবেন?

শুনলে আমার ওপর আপনার হয়তো ঘেন্না হবে।

আমি ক্রিমিন্যাল ঘেঁটে বুড়ো হলাম, আমার রি-অ্যাকশন অত সহজে হয় না।

এটাও হয়তো ক্রাইম। পনেরো-ষোলো বছর বয়সেই আই ওয়াজ সিডিউসড বাই এ উওম্যান। আমার দূরসম্পর্কের এক বউদি, বয়সে সাত-আট বছরের বড়ো। সিডাকশনটা চার-পাঁচ বছর ধরে চলেছিল। প্রেম নয়, জাস্ট সেক্স। সেক্স অ্যান্ড সেক্স। কোনো অদ্ভুত কারণে আমি মেয়েদের ইজি টারগেট। ওই শুরু। তারপর আরো ঘটনা। কী বলব, আই ওয়াজ অলমোস্ট ড্রেইনড আউট বাই উইমেন ইন দ্যাট আরলি এজ। কাউকেই রিফিউজ করতাম না, একটা অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দও তো ছিল।

তারপর? গো অ্যাহেড।

এর ফলে আমার রোমান্টিক সেন্সটাই ভোঁতা হয়ে গেল। আপনাকে তো বলেইছি আমরা বন্ধুরা অনেক সময়েই পয়সা দিয়ে মহিলা জুটিয়ে নিতাম। এখন বোধহয় আমার তেত্রিশ বছর বয়স। এখন টের পাই মহিলাদের প্রতি আমার কোনো লাগামছাড়া আকর্ষণ নেই। বড্ড বেশি ব্যবহৃত হলে বোধহয় এরকমই হয়। আপনার নিশ্চয়ই আমাকে লম্পট বলে মনে হচ্ছে!

লম্পট নন, তা বলছি না। তবে লাম্পট্য থাকলেও আপনি বোধহয় কোনো মহিলাকে কখনও সিডিউস করেননি!

না। তার দরকার হয়নি। বরাবর আমিই সিডিউসড হয়েছি।

তার কারণ আপনার ভালো চেহারা এবং সুইট পারসোন্যালিটি।

কে জানে কী। তবে মেয়েদের কাছে অ্যাট্রাকটিভ হওয়ার জন্য আমি কোনোদিনই কোনো চেষ্টা করিনি। যা হয়েছে এমনিতেই হয়েছে। তবে ইদানীং আমি মাঝে মাঝে রিমোর্সও ফিল করি। আমার ভীষণ প্রিয় এক বন্ধু আছে, ইন্দ্রনীল। সে সন্তুর বাজায় এবং নানা জায়গায় প্রোগ্রাম করে। সে বিয়ে করার পর তার নতুন

বউটি যখন আমাকে ইশারা-ইঙ্গিত করতে শুরু করল এবং টেলিফোনে নানা সাংকেতিক কথা বলতে এবং মেসেজ পাঠাতে শুরু করল, তখন হঠাৎ খুব আত্মগ্লানি হল আমার। মনে হল ইন্দ্রনীলের স্ত্রীকে ভোগ করলে আমি আর আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকাতে পারব না। জোর করে সব কমিউনিকেশন বন্ধ করে দিলাম। মেয়েটা মরিয়া হয়ে অনেক পাগলামি করেছিল। ফলে শিবাঙ্গীর সঙ্গেও আমার ভুল বোঝাবুঝি হয়।

তার মানে, আপনি কখনো তেমন করে কারও প্রেমে পড়ার সময় পাননি।

প্রবলেমটা অ্যাটিচুডের। সময়ের নয়। কিন্তু আপনি আমাকে বোধহয় নন্দিনীর বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেন।

যদি আপত্তি না থাকে তাহলে বলুন।

প্রথমেই ক্ষমা চাইছি যে, আমি আপনাকে একটু মিথ্যে কথা বলেছিলাম। আসলে মেয়েটি মারা গেছে, তার সম্পর্কে তাই কথাটা বলতে ইচ্ছে করেনি আমার। এখন ভাবছি সত্য গোপন করলে হয়তো পুলিশের কাজের অসুবিধে হবে। তাই বলছি যে হ্যাঁ, নন্দিনীও আমাকে সিডিউস করেছে। কয়েকবার।

শিবাঙ্গী পাশের ঘরেই আছে, জেনেও?

হ্যাঁ। বোধহয় মেয়েদের এসব ব্যাপারে সাহস একটু বেশিই। আর নন্দিনী বোধহয় চাইত ধরা পড়তেই। তাতে শিবাঙ্গীর সঙ্গে আমার দূরত্ব আরও বাড়বে।

শিবাঙ্গী কি টের পেয়েছিলেন?

না। ও ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমোয়।

আপনার ধারণাটা বোধহয় ভুল।

কেন ওকথা বলছেন?

সেটা পরে বলছি। এবার আরও একটা সেনসিটিভ প্রশ্ন।

বলুন।

নন্দিনী ছাড়া আর কেউ কি আপনার সঙ্গে উপগত হতে চেয়েছে এ বাড়িতে?

না না, আর কে।

একটু ভেবে বলুন।

এসব কি আর ভেবে বলতে হয়!

আপনি বলতে চাইছেন না, কিন্তু আমি যে জানি!

হঠাৎ বিষাণের মুখটা লাল হয়ে উঠল। টেবিলের ওপর রাখা একটা জলের বোতল থেকে খানিকটা জল খেল। তারপর কেমন যেন কুঁকড়ে গিয়ে দু-হাতে মুখটা ঢেকে চাপা গলায় বলল, প্লিজ, প্লিজ মিস্টার দাশগুপ্ত, লিভ হার অ্যালোন। শি ইজ এ কিড ওনলি। এ মাইনর।

শুনুন বিষাণবাবু, ভারতের সংবিধান মতে একটি মেয়ে আঠারো বছরের আগে অ্যাডাল্ট বলে গণ্য হয় না। কিন্তু মানুষের যৌবন তো সংবিধান মেনে আসে না! তেরো-চৌদ্দো বছর বয়সে একটা মেয়ের ঋতুচক্র শুরু হয়, দেহবোধ আসে। সংবিধানের নিয়মে আঠেরো বছর বয়সের আগে মেয়েদের বিয়ে করা নিষিদ্ধ। কিন্তু সংবিধান তো বলেনি আঠারোর আগে প্রেমেও পড়া চলবে না!

কিছুক্ষণ ঝুম হয়ে চোখ বুজে বসে রইল বিষাণ। তারপর বলল, আপনি জানেন না, আমার মেয়ের বয়সও এখন সতেরো।

আপনার মেয়ে?

হ্যাঁ। আমার যে বউদির কথা আপনাকে বলেছিলাম, মাই ফার্স্ট অ্যাডভেঞ্চার, তার ফলেই মেয়ের জন্ম। যদিও অবৈধ।

কী করে শিওর হলেন যে, আপনারই মেয়ে! ডি এন এ টেস্ট করিয়েছেন?

তার দরকার হয়নি। সেই মেয়েকে দেখলেই আপনিও বুঝতে পারবেন। তার মুখে হুবহু আমার মুখের ছাপ। পাছে কেউ মিলটা ধরে ফেলে সেই ভয়ে আমি ওদের বাড়ির ত্রিসীমানাতেও যাই না। আরও একটা ভয়। মেয়ে তো জানে না যে, আমি ওর বাবা। তাই যদি বাবা হিসেবে না দেখে পুরুষ হিসেবে দেখতে শুরু করে তাহলেই সর্বনাশ!

শবর একটু হাসল, আপনার ট্রাজেডিটা আমি বুঝতে পারছি।

লম্পট হলেও বর্বর তো নই। তাই এই মেয়েটা যেদিন আমার বিছানায় ঢুকেছিল সেদিন আমার নিজের ওপরেই খুব ঘেন্না হল। ওকে ঘর থেকে বের করে দিলাম। খুব রাগারাগিও করেছিলাম, মনে আছে। পরদিন এসে পায়ে ধরে ক্ষমা চাইল। বলল, আর ওরকম করবো না। আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না। আমি শুধু আপনার দেখাশোনা করবো। মিস্টার দাশগুপ্ত, আপনি কি ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন?

পারছি। কিন্তু একটা মুশকিল কী জানেন?

কী?

এই পুরো ক্রাইমটার পিছনেই আপনি রয়েছেন। অথচ আপনি কিছুই করেননি। কিন্তু রয়েছেন অনুঘটকের মতো। গোটা ব্যাপারটাই ঘটেছে আপনাকে কেন্দ্র করে এবং আপনার জন্যই। কিন্তু আপনি ক্যাটালিস্ট মাত্র।

আমি বুঝতে পারছি না।

ব্যাপারটা একটু জটিল। তবে একটু কনসেনট্রেট করলে বুঝতে পারবেন। আপনি যে চেহারা এবং স্বভাব নিয়ে জন্মেছেন তাতেই আপনার চারদিকে কিছু সমস্যা তৈরি হয়ে গেছে। তাতে আপনার কিছু করারও নেই। শক্ত মানুষ হলে আত্মরক্ষার কিছু পন্থা অবলম্বন করতে পারতেন। কিন্তু আপনি তেমন শক্ত মানুষ নন, তাই ভেসে গেছেন। এই বাড়িতেই দু-দুটি অসমবয়সি মহিলা আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে। একজন নন্দিনী। নন্দিনীর সঙ্গে আপনার গোপন অভিসার প্রথম টের পায় জাহ্নবী। কারণ জাহ্নবীও আপনার অনুরাগিণী। তার বয়স অল্প, তাই হিংসের জ্বালাপোড়াও বেশি। সে ব্যাপারটা শিবাঙ্গীকে বলে দেয়। লক্ষ করলে দেখতে পেতেন, আপনার আর শিবাঙ্গীর ঘরের বন্ধ দরজায় খুব সূক্ষ্ম ইলেকট্রনিক আই বসানোর জন্য একটা ছ্যাঁদা করা আছে। চালাকি করে সেটা মোম দিয়ে আটকানো। দরকার মতো যন্ত্রটা বসিয়ে নিয়ে আপনার ঘরের সব দৃশ্যই দেখা সম্ভব। পুলিশ যন্ত্রটা শিবাঙ্গীর ক্যাবিনেটে খুঁজেও পেয়েছে।

মাই গড!

সুতরাং আপনার আর নন্দিনীর ব্যাপারটা শিবাঙ্গীর কাছে গোপন ছিল না। নন্দিনী শিবাঙ্গীর বন্ধু হয়েও ওকে অ্যাসেসমেন্ট করতে ভুল করেছিল। ভেবেছিল, ধরা পড়লেও শিবাঙ্গী বড়োজোর রাগারাগি করবে, তাড়াতাড়ি ডিভোর্সের মামলা করবে আর বড়োজোর নন্দিনীকে তাড়িয়ে দেবে। শিবাঙ্গী তা করেনি। নন্দিনী যে তার বিশ্বাসের মর্যাদা দিল না এটাতেই শিবাঙ্গী বোধহয় ফিউরিয়াস হয়ে ওঠে। আমি শুনেছি শিবাঙ্গী খুবই রাগি।

ঠিকই শুনেছেন। রাগলে ওর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না।

শিবাঙ্গী আর জাহ্নবী মিলে ঠিক করে নন্দিনীকে সবক শেখাতে হবে। জাহ্নবী ভিক্টরকে ঠিক করে দেয়। ভিক্টর ছোটোখাটো উঠতি মস্তান। বোধহয় দু’লাখ টাকার কন্ট্রাক্টে রাজি হয়ে যায়। পুলিশ শিবাঙ্গীর ব্যাংকে ক্যাশ উইথড্রয়াল চেক করে দেখেছে, জুন মাসের এক তারিখে এক লাখ টাকা ক্যাশ তোলা হয়।

তারপর?

কাহিনিটা একটু জটিল। কথা ছিল খুনটা করবে একা ভিক্টর। সিকিউরিটিকে এড়িয়ে বাড়ি ঢোকার পথ সম্ভবত ছক করে দিয়েছিল জাহ্নবী। ভিক্টর পেছনের দেওয়াল টপকে ঢোকে, গ্যারাজের গাড়ির আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে ওপরে ওঠে। ওর ফ্ল্যাটে ঢোকার ব্যবস্থা শিবাঙ্গীই করে দেয়। কিন্তু একটা মস্ত গণ্ডগোল হয়েছিল।

কিসের গণ্ডগোল?

শিবাঙ্গী শত্রুর শেষ রাখতে চায়নি। ভিক্টরকে বলা ছিল সে একা আসবে, নন্দিনীকে খুন করবে, তারপর শিবাঙ্গীর কাছ থেকে বাকি এক লাখ টাকা নিয়ে সরে পড়বে। শিবাঙ্গীর প্ল্যান ছিল, ভিক্টর টাকা নিতে ঢুকলেই আগে থেকে প্রস্তুত শিবাঙ্গী তাকে গুলি করে মেরে দেবে।

সর্বনাশ! শিবাঙ্গী কি এতটা নিষ্ঠুর হতে পারে?

পারে। এবং তার পিছনে আপনি। এবং শিবাঙ্গীর ইগো। তার প্ল্যান মতো ঘটনাটা ঘটলে শিবাঙ্গী হয়তো উতরেও যেত। কিন্তু গণ্ডগোল হল ভিক্টর একা খুন করতে আসেনি। সঙ্গে বাদুকেও এনেছিল। হয়তো একা আসতে সাহস পায়নি। আর ওই জন্যই প্ল্যানটা ভেস্তে গিয়েছিল। নন্দিনী অনেক রাত অবধি জেগে তার ঘরে কাজ করে। সম্ভবত বাইরের দরজা খুলে কেউ ঢুকেছে টের পেয়ে সে ব্যাপারটা দেখতে আসে এবং খুন হয়ে যায়। তারপর বাকি টাকা নিতে ভিক্টর শিবাঙ্গীর ঘরে যায়। শিবাঙ্গী তৈরি হয়েই ছিল। ভিক্টর কাছাকাছি হতেই সে গুলি চালায়। কিন্তু প্রবলেম হল, ম্যাডামের শুটিং প্র্যাকটিস ছিল না। আর হ্যান্ডগানগুলোর ব্যারেল ছোটো বলে বেশির ভাগ সময়েই তা হয়ে যায় এরাটিক। গুলি লাগে ভিক্টরের বাঁ কাঁধে। সে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায়। ম্যাডাম হয়তো তাকে ফিনিশ করতে পারত, কিন্তু বাদ সাধল বাদু। সে গুলির আওয়াজ পেয়েই ছুটে এসে ম্যাডামের হাতে পিস্তল দেখেই ফায়ার করে।

আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে! আমি কি একটু জল খেতে পারি?

অবশ্যই।

এবার জল খেতে গিয়ে কাঁপা হাতে জল চলকে পড়ল বিষাণের বুকে। জল খেয়ে দম ধরে বসে রইল একটু। তারপর ধরা গলায় বলল, এবার বাকিটা বলুন মিস্টার দাশগুপ্ত।

ম্যাডাম আগুন নিয়ে খেলছিলেন, বুঝতে পারেননি। বাদুর গুলিতে ওঁর মারা যাওয়ার কথা। কপালজোরে বেঁচে গেছেন।

হ্যাঁ, ডাক্তাররাও বলছিলেন, উনি খুব অল্পের জন্য বেঁচে গেছেন। স্কালে ঢুকলেও গুলি ভাইটাল জায়গাগুলোকে টাচ করেনি।

জ্ঞান ফেরার পর শিবাঙ্গীর নতুন প্রবলেম দেখা দিয়েছে। উনি জানেন না, নন্দিনী সত্যিই মারা গিয়েছে কিনা বা খুনিরা ধরা পড়েছে কিনা। ওঁর কাছে খবরের কাগজ, মোবাইল বা টিভি নেই। ডাক্তাররা সবাইকে বলে দিয়েছে ওঁকে কোনো খবর দেওয়া চলবে না। আমাকে উনি বারবার নন্দিনীর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

আমাকেও করেছে। জাহ্নবীকেও।

তবে মনে হয় তিন-চারদিন আগে উনি সত্যটা জানতে পেরেছেন যে, নন্দিনী মারা গেছে এবং খুনিরা ধরা পড়েছে।

কী করে বোঝা গেল?

উনি এখন ড্যামেজ কন্ট্রোল করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন।

কীভাবে?

তিনদিন আগে উনি জাহ্নবীকে দিয়ে ওঁর অ্যাকাউন্ট থেকে এক লাখ টাকা ক্যাশ তুলে ভিক্টরের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। আর ভিক্টরের পক্ষে ব্রজবাসী দত্তকে দাঁড় করিয়েছেন। ব্রজবাসী একজন ধুরন্ধর ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার। উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট। যাতে ভিক্টর কিছু কবুল না করে। আমার কাছে ও যা বলেছে তার রেকর্ড নেই। সুতরাং আদালতে ও বয়ান পাল্টাবে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিষাণ বলল, অ্যাডভোকেট ব্রজবাসী দত্তকে কন্ট্যাক্ট করার জন্য শিবাঙ্গীই আমাকে বলেছিল। ওঁকে আমিই কন্ট্যাক্ট করি। আমি কি কোনো অন্যায় করেছি মিস্টার দাশগুপ্ত?

না। উনি এখনও আপনার স্ত্রী। আর স্ত্রী অন্যায় করে থাকলেও আপনার কাজ হল যতদূর সম্ভব তাঁকে প্রোটেকশন দেওয়া।

শিবাঙ্গী সম্পর্কে যা বললেন তাতে মনে হয় ওর বিরুদ্ধে কেসটা খুবই স্ট্রং। ওকে যদি অ্যারেস্ট করা হয় তবে আমাদের ফেস লস হবে। দুটো পরিবারই মর্যাদা হারাবে।

দেখুন, আপনাকে একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত করতে চাই। এই কেসটা অফিসিয়ালি সি আই ডিকে দেওয়া হয়নি। আপনাদের থানার ওসি দিবাকর গুপ্ত আমার দাদার মতো। উনি কেসটায় একটু অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছিলেন। ডাকাতি এবং ডাকাতি করতে গিয়ে খুন বলে ওঁর বিশ্বাস হচ্ছিল না। আপনার ওপর ওঁর সবচেয়ে বেশি সন্দেহ ছিল, অথচ আপনার সঙ্গে কথা বলে ওঁর দ্বিধাও হচ্ছিল। ফলে উনি আমাকে বলেন সাহায্য করতে। আমি আমার হানচ এবং ইনফর্মেশন ওঁকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন উনি কী অ্যাকশন নেবেন তা আমি জানি না। তবে সম্ভবত শিবাঙ্গী আর জাহ্নবীর গ্রেফতার এড়ানো যাবে না।

হতাশা মাখা মুখে করুণ গলায় বিষাণ বলল, এর চেয়ে খুনের দায়টা আমার ঘাড়ে চাপলেই বোধহয় ভালো ছিল। আমি তো একজন রুইনড ম্যান, বাজে লোক, মাতাল, লম্পট! প্রতি মুহূর্তেই তো পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

শবর হেসে বলল, এ যাত্রায় সেটা বোধহয় হচ্ছে না। তবে আপনি যতই দাড়ি-গোঁফ রেখে বিষণ্ণ মুখে থাকুন না কেন, আমার মনে হচ্ছে আপনার চেহারা একটু বেটার হয়েছে। মদটা আর খাবেন না।

খাচ্ছি না। কিন্তু বড্ড একা হয়ে গেলাম মিস্টার দাশগুপ্ত।

একাই তো ছিলেন! কিন্তু আপনি তো নাকি মায়ের আদুরে ছেলে। কয়েকদিন মায়ের কাছ থেকে ঘুরে আসুন।

কোন মুখে যাবো?

একমাত্র মায়ের কাছেই সব মুখ নিয়ে যাওয়া যায়।

[বৈশাখ ১৪২১]

—

মনের অসুখ

গাড়িটা কি খুব জোরে চলছে বলে মনে হচ্ছে আপনার?

না, গাড়ি তো মিডিয়াম স্পিডেই চলছে।

আসলে আমার রিফ্লেক্স আজ ভাল কাজ করছে না।

কেন বলুন তো! কোনো টেনশন আছে কি?

ঠিক তাও নয়। স্পিডোমিটারে দেখছি গাড়ি পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্নয় চলছে, তবু মনে হচ্ছে গাড়িটা বড্ড স্পিডে যাচ্ছে।

ড্রাইভ করতে আপনার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কি?

না, সেরকম কিছু নয়। আসলে আমি একটু মেন্টাল তো।

তার মানে কী?

মানে আমি মেন্টালি খুব সাউন্ড নই।

কী করে বুঝলেন?

বুঝতে পারি। মাথাটা এলোমেলো চিন্তার জাহাজ। টোটাল ডিসঅর্ডার। কোনো কিছুই খুব পয়েন্টেডলি ভাবতে পারি না। অবান্তর নানা কথা এসে কনসেন্ট্রেশন নষ্ট করে দেয়। মাঝে মাঝে নিজের গলার স্বরও শুনতে পাই, কী যেন বলছি, কিন্তু সেটা কোহেরন্ট নয়।

আপনাকে দেখে আমার তো মেন্টাল বলে মনে হয়নি কখনো।

হয়নি?

না।

তার কারণ হয়তো খুব ভাল করে লক্ষ করেন না।

তা হতে পারে। কিন্তু আপনাকে খুব ক্লোজলি স্টাডি করার জন্য একটা বাস্তব কারণ থাকা চাই তো! আপনার মধ্যে আমি তো তেমন কোনো অস্বাভাবিকতা দেখতে পাই না। অ্যাপারেন্টলি আপনাকে কখনো কখনো একটু রেস্টলেস বা অস্থির বলে মনে হয়। কিন্তু একটা বড়ো বিজনেস তো আপনি চালাচ্ছেন।

বড়ো বিজনেস চালাতে হয় না। আপনিই চলে।

হাল ধরতে হয় না বলছেন? হাল ধরাটা সহজ কাজ নয়। তা যদি হত তাহলে আপনার বাবা আপনাদের তিন ভাইকে ম্যানেজমেন্ট পাশ করিয়ে আনাতেন না।

ট্রেনিং থাকলে বিজনেস চালানো কোনো ডিফিকাল্ট কাজ নয়। আর আপনার তো অজানা নেই যে, আমার বাবা আমাদের পাশেই সবসময়ে থাকেন। থাকগে, আমরা অন্য দিকে চলে যাচ্ছি।

নিজের এই অস্বাভাবিকতা আপনি কবে থেকে টের পাচ্ছেন?

অনেক দিন। বছর তিন-চারেক তো হবেই।

আমার মনে হয় ওটা আপনার অটো সাজেশন। আমি কেন, আপনার ক্লোজ সারকেলের কেউ যদি আপনার অস্বাভাবিকতা টের পেত তাহলে আপনি অবশ্যই জানতে পারতেন।

হুঁ। হয়তো সৌজন্যবশত তারা আমাকে কিছু বলে না। সম্ভবত নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

আপনার কোনো বান্ধবী নেই?

না, বান্ধবী জোটাবো তার সময় কোথায়?

এবার একজনকে জুটিয়ে নিন। বয়স কত হল?

উনত্রিশ। বান্ধবী আর হবে না। মা আর বাবা মিলে কাউকে একটা ধরে-বেঁধে গলায় ঝুলিয়ে দেবে। ওটা আর এক আতঙ্ক।

মহিলাদের ভয় পান বুঝি?

হ্যাঁ, আমার মহিলাদের সম্পর্কে ভয় আছে। ছেলেবেলা থেকেই।

আজকালকার জেনারেশনের তো ওরকম কমপ্লেক্স থাকার কথা নয়। আপনার অফিসেও অনেক মহিলা স্টাফ রয়েছে। এমনকি আপনার সেক্রেটারিও তো একজন মহিলাই। রাগিণী মালহোত্রা।

উনি বয়স্কা, মাতৃসমা।

তাহলে মাতৃসমা বা বয়স্কা মহিলাদের আপনি ভয় পান না?

না। আমার ভয় অল্পবয়সিদের নিয়ে।

ছেলেবেলায় কিছু ঘটেছিল কি? অনভিপ্রেত কোনো ঘটনা?

ঠিক স্পষ্ট কিছু মনে পড়ে না। তবে আমি শিশুকাল থেকেই মহিলা পরিবেষ্টিত হয়ে মানুষ হয়েছি। জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিল। মা, কাকিমা, জ্যেঠিমা, মাসি, পিসিরা তো ছিলই। তাছাড়া একগাদা দিদি আর বোন মিলে অনেকের ঘেরাটোপের মধ্যে বড়ো হয়েছি। সুতরাং কমপ্লেক্স থাকার কথা নয়।

তবু আছে কেন? কেউ রিফিউজ করেছিল কি?

তিমির চুপ করে রইল। জবাব দিল না। খুব মন দিয়ে গাড়িটা চালাতে লাগল। সামনে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে। মসৃণ রাস্তা। তবে নিরিবিলি নয়। রাত আটটা কুড়ি মিনিট বলে রাস্তায় প্রচুর গাড়ি এবং ট্রাক রয়েছে।

সুবর্ণও প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করল না। সে তিমিরের উকিল। কাজের সূত্রেই তার সঙ্গে তিমিরের যা কিছু বন্ধুত্ব। তবে সম্পর্কটা শুধু উকিল-মক্কেলের নয়। বয়স কাছাকাছি হওয়ায় একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। তবে খুব ঘনিষ্ঠ নয়। যেথায় থামতে হবে, সুবর্ণ জানে।

ডানকুনি টোল প্লাজায় গাড়ি দাঁড়াল। তিমির হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনি কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভ এজেন্সিকে চেনেন? সত্যিকারের ভাল এজেন্সি। এলেবেলে হলে চলবে না।

হ্যাঁ, কেন?

আমার দরকার।

আমার চেনা একটা খুব ভাল এজেন্সি আছে। সুপ্রিয় সরকার একসময়ে লালবাজারের সি আই ডি অফিসার ছিলেন। শুধু চাকরি করতেন না, ক্রিমিনোলজি নিয়ে অগাধ পড়াশুনো। রিটায়ার করে একটা এজেন্সি খুলেছেন। যতদূর জানি, উনি খুবই সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। প্রায় জনা দশেক অপারেটর আছে ওঁর।

আমার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেবেন?

সেটা কোনো ব্যাপারই নয়।

সিক্রেট ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় নেই তো!

না। ওদের ব্যবসার সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস হল গুডউইল। ব্ল্যাকমেল করে টাকা কামানোর ধান্ধা থাকলে ব্যবসা লাটে উঠবে। সুপ্রিয়দা হান্ড্রেড পারসেন্ট ভদ্রলোক। বিশ্বাস করা না-করা অবশ্য আপনার চয়েস। কিন্তু সিক্রেটটা কি? আপত্তি না থাকলে বলতে পারেন। আমি আপনার উকিল হিসেবে অনেক সিক্রেট অলরেডি জানি।

জানালা গলিয়ে টোল ট্যাক্স দিয়ে ফের জানালার কাচ তুলে দিয়ে তিমির গাড়ি ছাড়ল। প্রথমে কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর বলল, হ্যাঁ, আমাকে একজন রিফিউজ করেছিল। দু'বছর আগে। তবে রিফিউজ করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছিল।

ও।

ফের কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপর সুবর্ণ বলে, কিন্তু গোয়েন্দা খুঁজছেন কেন?

মেয়েটা আমার জীবন থেকে হারিয়ে গেছে। শুনেছি তাকে প্রায় জোর করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে। কলকাতায় নেই। কোথায় আছে তা জানি না। তার একটা গুন্ডা দাদা আছে। সে আমাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল। তারপর আমার ওপর ছোটোখাটো একটা হামলাও হয়।

কীরকম হামলা?

সকালে ন'টা নাগাদ অফিসে বেরোনোর সময় আমার গাড়ি ঘিরে ধরে চার-পাঁচটা মোটরবাইকে সওয়ার আট-দশটা ছেলে। গাড়ির কাচ-ফাচ ভাঙে, আমাকে বেধড়ক পেটায়। নার্সিংহোমে দিন দশেক থাকতে হয়েছিল।

পুলিশকে জানাননি?

জানিয়েছিলাম। লাভ হয়নি।

ছেলেগুলোকে চিনতে পেরেছিলেন?

না।

তারপর?

আমি যাতে মেয়েটার জীবনে আর এন্ট্রি নিতে না পারি তার জন্যই এসব করা হয়েছিল বলে আমার ধারণা। যখন আমি নার্সিংহোমে তখনই মেয়েটার বিয়ে হয়। তারপর না পাত্তা।

ওরা কি ইনফ্লুয়েনশিয়াল মানুষ?

হুঁ, মহারাষ্ট্রে ওদের বল বিয়ারিং কারখানা আছে। কাকা এম পি, বাবা বরো চেয়ারম্যান। দাদা আগে কাস্টমসে হকি খেলত, পরে তিনটে ক্লাব বানিয়েছে জমি জবর-দখল করে। প্রোমোটারি করে। হাতে অনেক অ্যান্টিসোশ্যাল।

আপনাকে ওদের অপছন্দ কেন? আপনার তো বেশ স্মার্ট চেহারা। তাছাড়া আপনি তো একজন অত্যন্ত ধনী মানুষ। অসুবিধেটা কোথায় হল?

অসুবিধে ছিল। মধ্যমগ্রামে আমাদের একটা ছয় বিঘে প্লট আছে।

তা তো জানি। আপনার দাদা সেখানে একটা নার্সিংহোম বানাচ্ছেন।

হ্যাঁ। ওই জমিটা বিটু চেয়েছিল। দামও ভালোই অফার করেছিল। কিন্তু নার্সিংহোমটা আমার দাদার ড্রিম প্রোজেক্ট। অনেক দিনের প্ল্যানিং। কাজেই বিটুকে রিফিউজ করতে হয়েছিল। ওর ইগো সাঙ্ঘাতিক। রেগে গেলে কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। সম্পর্কটা সেই থেকেই বিষিয়ে যায়।

আপনাদের প্রেমটা কত দিনের?

ওই পরিবারের সঙ্গে আমাদের বিজনেস রিলেশন অনেক দিনের।

বাল্যপ্রেম?

না, তা নয়। বৃতীর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা হয় আকস্মিক। তখন আমার বয়স পঁচিশ, বৃতীর উনিশ-কুড়ি। চমৎকার ভারতনাট্যম নাচত মেয়েটা। একসময়ে আমিও নাচের তালিম নিয়েছিলাম। ওর একটা প্রোগ্রাম

দেখে ভাল লেগে যায়। আর হয়তো আমার প্রতি ওর একটু দুর্বলতা আগে থেকেই ছিল। তারপর রিলেশন তৈরি হয়। বছর দুই বাদে আমরা বিয়ে করব বলে সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু মাঝখানে ছয় বিঘা জমির কাজিয়া ঢুকে পড়ল। প্রথমে নানারকম টোপ ফেলা, তারপর জুলুম আর জবরদস্তি, শেষে বোনের ওপর কর্তৃত্ব ফলানো এবং আমাকে মারধর করা, খুনের হুমকি। বৃতী নরম মেয়ে, এরকম অ্যাগ্রেশন দেখে ভয় পেয়ে, বোধহয় আমাকে বাঁচাতেই পিছিয়ে যায়।

কোনো চিঠি দিয়েছিল?

আজকাল কি চিঠি-ফিটি কেউ লেখে? ফোন করেছিল। বলল, দাদা তোমায় খুন করাবে। আমাকে বিয়ে করার চেষ্টা কোরো না। বরং বেঁচে থাকো, সেই আমার ঢের। এরকম আরও সব কথা।

এই ফোন যখন আসে তখন কি আপনি হাসপাতালে?

না। তার অনেক আগে। ওকে নিয়ে পালানোর প্ল্যান করেছিলাম। কিন্তু ততদিনে পাহারা বসে গেছে।

যা ঘটে গেছে আপনি কি ফের সেই খতিয়ান খুলতে চান? নইলে প্রাইভেট ডিটেকটিভ খুঁজছেন কেন?

আমি শুধু বৃতীর সন্ধান চাই।

তার জন্য গোয়েন্দা লাগানোর দরকার কী? ওদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলেই জানা যাবে। বলুন তো গোয়েন্দার কাজ আমিই করে দিতে পারি।

না। আমার কিছু ডিটেলসও দরকার।

আপনি প্রতিশোধের কথা ভাবছেন কি?

ভাবাটা কি দোষের?

হ্যাঁ, প্রতিশোধ জিনিসটা ভাল নয়। যা ঘটে গেছে তা আর আনডান তো করা যাবে না। বিবাহিতা বৃতী কিছুতেই আর আগের মতো নেই। তাকে যদি নিজের জীবনে কোনোভাবে ফিরিয়েও আনেন তবু সেই বৃতীকে তো আর পাবেন না।

সেটা হয়তো সম্ভবও নয়। আমি জানতে চাই বৃতী ঠিক কেমন আছে। যার ঘর করছে সে কেমন লোক!

আর কিছু?

ওদের একজ্যাক্ট লোকেশন। আমি বৃতীর সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করতে চাই।

তাই বা কেন?

কারণটা ব্যক্তিগত। আই হ্যাভ টু সেটল মাই অ্যাকাউন্টস উইথ হার।

যা করবেন ঠান্ডা মাথায় ভেবে করবেন কিন্তু।

আমি আপনাকে আমার মেন্টাল ডিসব্যালান্সের কথা বলেছি।

বলেছেন, কিন্তু সেটা আপনার নিজের মত। আমার মনে হয় না কোনো সাইকিয়াট্রিস্ট আপনার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা খুঁজে পাবেন।

আমার মনের ভিতরটা তো আমিই টের পাই। তবে আপনি যা ভয় করছেন তেমন কিছু নয়। আমি অ্যাগ্রেসিভ নই। সেন্টিমেন্টাল মে বি। আমার আবেগ আছে, হিংস্রতা নেই।

সেটা আমি জানি।

ধন্যবাদ।

কিন্তু বৃতী আপনার ততটা ক্ষতি করেনি। বরং আপনাকে বাঁচানোরই চেষ্টা করেছে। আপনার আসল শত্রু তো ওর দাদা বিটু।

হ্যাঁ, বিটু। আমি অ্যাগ্রেসিভ হলে বিটু এতদিন বেঁচে থাকত না। বিটু গুন্ডা, কিন্তু ওর চেয়ে ঢের বড়ো গুন্ডা আছে। আমার খুড়তুতো ভাই পিন্টুকে লাগালে তিন দিনের মধ্যে বিটু খালাস হয়ে যাবে। কিন্তু ওসব আমার সহ্য হয় না।

পিন্টু কি গুন্ডা?

অ্যাপারেন্টলি নয়। কাকার বিশাল ট্র্যান্সপোর্টের ব্যবসা। পিন্টু সেটা সামলায়। ওর একটা রেস্টুরেন্ট কাম বার আছে। ক্যারাটে-ফ্যারাটে জানে। পুলিশের খাতায় ওর নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু ওর বিরুদ্ধতা যে করে প্রায় সময়েই সে লাশ হয়ে যায়।

বাপ রে!

পিন্টু আমার ভাইও বটে, বন্ধুও বটে। যখন হাসপাতালে ছিলাম তখন একদিন বলেছিল, বিটুকে খালাস করে দিই? আমি ওর হাত ধরে বলেছিলাম, না। তাহলে বাকি জীবনটা আমি আর ঘুমোতে পারব না। পিন্টু কিছু করেনি।

ঠিক আছে, কাল সুপ্রিয়দার এজেন্ট আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

উনি নিজে আসবেন না?

উনি ক্লায়েন্টের কাছে যান না বড়ো একটা। কী একটা রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত আছেন শুনেছি। তবে ভাববেন না, ওঁর অপারেটররা খুব পাকা এবং পোক্ত লোক।

ঠিক আছে।

তিমির বালি হয়ে এয়ারপোর্টের রাস্তা ধরল।

আমি কি গাড়ি ঠিকঠাক চালাচ্ছি?

হ্যাঁ। পারফেক্ট।

।। দুই ।।

শোনো, তোমাকে একটা কথা বলছি। শুনে আবার হেসে উড়িয়ে দিও না যেন!

কী কথা ডারলিং?

কয়েকদিন ধরে আমার একটা আনক্যানি ফিলিং হচ্ছে।

কীরকম?

কেবল মনে হচ্ছে আড়াল থেকে কেউ আমাকে নজরে নজরে রাখছে।

কবে থেকে?

কলকাতায় আসার আগে থেকেই। দিল্লিতেও গত কয়েকদিন ধরে কেবল মনে হচ্ছিল, রাস্তায়-ঘাটে কেউ আমাকে ফলো করছে।

জাস্ট ফিলিং! নাকি কাউকে সত্যিকারের মার্ক করেছো?

কাউকে মার্ক করতে পারিনি। তবে ফিলিংটা উড়িয়েও দিতে পারছি না। আমার ভয়-ভয় করছে।

তোমার কথাটাকে হেসে উড়িয়ে দিচ্ছি না। কিন্তু তুমি তো একজন নির্ভেজাল হাউজওয়াইফ। তোমার কোনো রহস্যময় অতীত নেই। তবে কে তোমাকে ফলো করবে এবং কেনই বা! এক হতে পারে, তুমি সুন্দরী বলে কোনো রোমিও যদি পিছু নিয়ে থাকে।

ইয়ার্কি কোরো না। এটা সে ব্যাপার নয়। আর আমার রহস্যময় অতীত নেই কে বলল, আমার তো একজন বয়ফ্রেন্ড ছিল, তুমি জানো।

আরে সে তো সকলেরই বয়সকালে থাকে। আর তিমির সম্পর্কে আমি যা শুনেছি তাতে মনে হয় সে অ্যাবসলিউটলি হার্মলেস।

আমি তিমিরদার কথা ভাবছি না। কিন্তু আমি অস্বস্তি বোধ করছি। ভেবেছিলাম কলকাতায় এসে ব্যাপারটা বন্ধ হবে। কিন্তু হয়নি। সামওয়ান ইজ কিপিং আই অন মি। হাসি-ঠাট্টার ব্যাপার নয়, ব্যাপারটা সিরিয়াস।

সে তো বুঝলাম, কিন্তু শুধু সন্দেহের ওপর তো কোনো অ্যাকশন নেওয়া যায় না! তুমি বরং অ্যালার্ট থাকো। নজর যদি কেউ রেখেই থাকে, তবে সে নিশ্চয়ই একজন রক্ত-মাংসের মানুষ, এবং তাকে কোনো না কোনো সময়ে অবশ্যই স্পট করা যাবে। তোমার কি মনে হয়, সবসময়ে তোমার ওপর নজর রাখা হচ্ছে?

না। যখন বেরোই তখন। আর গতকাল সন্ধেবেলা কিছুক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলাম তখনও ফিলিংটা হয়েছিল। আমি চাঁদুকে ডেকে বাগানের চারপাশ আর দেয়ালের ওপাশটা দেখতে বলেছিলাম। ও খুঁজে-টুঁজে এসে বলল, তেমন কাউকে দেখেনি।

দেয়ালের ওপাশে তো রাস্তা। সেখানে লোকজন থাকবেই। জনে জনে তো আর সন্দেহ করা যায় না।

আচ্ছা শুভ, আমার কিছু হবে না তো?

দূর পাগল, কী হবে?

আমার কেন যেন ভয়-ভয় করছে।

আমি তো আছি।

ওঃ, তুমি বুঝি খুব বীরপুরুষ?

তা বলছি না। তবে প্রিয়জনের জন্য মানুষের তো জান কবুল হতে হয়।

শোনো, আমি বলি কী, বাড়ির সবাইকে অ্যালার্ট করে দেওয়াই কি উচিত হবে না?

না। বোকামি হবে। পরে সবাই এ নিয়ে হাসাহাসি করবে।

হুঁ। তাহলে কী করা যায় বলো তো?

আমি দেখছি। দরকার হলে পুলিশকে জানাবো। এখন চুপচাপ আমরা দুজনেই একটু অ্যালার্ট থাকব। তোমার মনের ভুলও হতে পারে তো!

আমার তা মনে হয় না। আমি ভীতু মেয়ে নই। অকারণে ছায়া দেখে ভয় পাই না।

সেটা জানি। ঠিক আছে, আজ আর কাল দুটো দিন আমরা একটু অ্যালার্ট থেকে দেখি, সত্যিই কেউ নজর রাখছে কিনা।

ঠিক আছে। আমি এখন গাড়ি নিয়ে একটু বেরোচ্ছি। পুরোনো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে হবে। দুপুরে কোথাও খেয়ে নেবো।

বিপদ বুঝলে ফোন কোরো। আমার অফিসের মিটিং আছে। ফোনটা হয়তো কিছুক্ষণ সাইলেন্ট রাখতে হবে। যদি ফোনে না পাও একটা মেসেজ করে রেখো অন্তত।

ডান।

বৃতীর বাপের বাড়ি গল্ফগ্রিনে। বিশাল তিনতলা। চারদিকে অনেকটা জমি নিয়ে বাগান। একতলার আধখানা জুড়ে নিজেদের গ্যারাজ। তাতে অন্তত চারখানা গাড়ি। দুখানা গাড়ি দুই দাদার, একখানা বাবার। চতুর্থটা বাড়ির অন্যদের জন্য, যার যখন দরকার হয়। বৃতী কলকাতায় এলে তাই মনজিৎ সিং-এর গ্যারাজ থেকে গাড়ি ভাড়া নেয়। মনজিৎ তাদের অনেকদিনের চেনা। বৃতীর প্রিয় ড্রাইভার হল পরিতোষ। বরাবর বৃতী গাড়ি নিলে পরিতোষকেই পাঠায় মনজিৎ।

আজ একটা বেশ ঝকমকে ক্রিম রঙের নতুন ইনোভা গাড়ি পাঠিয়েছে মনজিৎ।

কেমন আছো পরিতোষদা?

ভাল আছি দিদিমণি। তুমি ভাল তো?

হ্যাঁ।

গাড়িতে ওঠার পর পরিতোষ বলল, কলকাতায় এবার নভেম্বরেই বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে। এসি চালাবো কি?

হ্যাঁ, অল্প করে চালাও। আমার তো ডাস্ট অ্যালার্জি আছে।

ঠিক আছে।

শোনো পরিতোষদা, একটু লক্ষ রেখো তো আমার গাড়িটা কেউ ফলো করছে কিনা।

পরিতোষ অবাক হয়ে বলে, কে ফলো করবে দিদিমণি?

তা জানি না। কিন্তু আমার সন্দেহ, ইদানীং গত কয়েকদিন যাবৎ কেউ আমাকে নজরে রাখছে।

ঠিক আছে দিদিমণি, খেয়াল রাখব।

গল্ফগ্রিনের রাস্তাটা তারা ঘটনাহীন ভাবেই পেরিয়ে গেল। বৃতী রিয়ার ভিউ মিররে নজর রাখছিল। কেউ ফলো করছে বলে মনে হল না। লর্ডসের কাছাকাছি এসে বৃতী বলল, পরিতোষদা, সোজা রহিম ওস্তাগর রোডে ঢুকে যোধপুর পার্কের ভিতর দিয়ে ঢাকুরিয়া হয়ে বালিগঞ্জ চলো তো।

ঠিক আছে।

এই রাস্তাটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। কেউ ফলো করলে বোঝা যাবে।

হঠাৎ বৃতীর মনে হল, একটা মোটরবাইক লর্ডসের কাছাকাছি থেকে হঠাৎ উদয় হয়েছে এবং তার গাড়িকে অনুসরণ করছে। কয়েকদিন ধরে গোপন সন্দেহ তাকে এতটাই দুর্বল করে ফেলেছে যে, মোটরবাইকটাকে দেখেই তার বুক দুরদুর করতে লাগল। সামনে গলিঘুঁজির রাস্তা। পথটা সহজ এবং সরল নয়। অনুসরণকারী ছাড়া এই গোলকধাঁধায় কেউ তার পিছু নেবে না। সুতরাং আর একটু দেখা যাক।

বৃতী একটু বাদে নিশ্চিন্ত হল, মোটরবাইকটা তারই পিছু নিয়েছে। যে লোকটা বাইকে বসে আছে তার মুখ একটা হেলমেটে পুরোটাই ঢাকা। হাতে গ্লাভস, গায়ে ফুলহাতা চেক শার্ট, পরনে জিনস। অত্যন্ত রহস্যময় চেহারা।

ডাইনে-বাঁয়ে, ডাইনে-বাঁয়ে কয়েকবার মোড় ঘুরে যোধপুর পার্কের চওড়া রাস্তায় পড়ার মুখেই বৃতী বলল, পিছনের মোটরবাইকটাকে আটকাতে পারবে?

আটকাবো? গণ্ডগোল হবে না তো!

না পরিতোষদা, আমি ব্যাপারটা বুঝতে চাই।

পরিতোষ রাস্তার মাঝবরাবর গাড়িটা থামাল। পেরিয়ে যাওয়ার ফাঁক না পেয়ে মোটরবাইকটাও ঘ্যাঁচ করে থামল।

বৃতী দরজা খুলে নেমে সটান বাইকওয়ালার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, আপনি কি আমাকে ফলো করছেন?

হেলমেটের জন্য লোকটা বোধহয় কথাটা শুনতে পেল না। তাই হেলমেটটা খুলে বলল, কিছু বলছেন?

বৃতী একটু থতমত খেয়ে গেল। বাইকের আরোহী একজন অতিশয় সুদর্শন চেহারার বছর কুড়ি-বাইশের যুবক। মাথায় কোঁকড়া চুল, গ্রিক দেবতার মতো অত্যন্ত সুন্দর মুখ, টকটকে ফর্সা রং এবং অত্যন্ত সুগঠিত তার দেহ।

বৃতী একটু ঝাঁঝ কমিয়ে বলল, আপনি আমাকে ফলো করছেন কেন?

ছেলেটা অকপট বিস্ময়ে বলে, ফলো! আপনাকে? কী যা-তা বলছেন? আমি আপনাকে ফলো করবো কেন?

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছি আপনি আমার গাড়ির পিছু পিছু আসছেন।

ছেলেটার ফর্সা মুখটা একটু লাল হল। কিন্তু সংযত গলায় বলল, না ম্যাডাম, আপনার কিছু ভুল হচ্ছে। আমি আপনাকে ফলো করবো কেন? আমি তো জীবনে এই প্রথম আপনাকে দেখছি!

এই দুর্দান্ত হ্যান্ডসাম ছেলেটার দিকে তাকিয়ে বৃতীরও মনে হচ্ছে, ভুলটা তারই। এ কোনো দুষ্টচক্রের লোক হতে পারে না। কিন্তু তার অহং প্রবল। নিজের মুখরক্ষার জন্য বলল, ফলো করছিলেন বলেই বললাম। আজ বলে নয়, যেন কয়েকদিন ধরেই করছেন।

ছেলেটা কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল তার মুখের দিকে। তারপর তার মুখখানা টকটকে লাল হয়ে গেল রাগে। কিন্তু চিৎকার বা চেঁচামেচি না করে সে একটু নরম ব্যঙ্গের গলায় বলল, আপনাকে ফলো করার কি বিশেষ কোনো কারণ আছে ম্যাডাম? আপনি নিশ্চয়ই নিজেকে সাংঘাতিক সুন্দরী বা অ্যাট্র্যাকটিভ বলে মনে করেন না?

বৃতীকে কেউ যেন ঠাস করে একটা চড় মারল। কিছুক্ষণ মুখে কথা এল না। তারপর হঠাৎ মাথাটা দপ করে জ্বলে উঠল, আপনার এত সাহস! অসভ্য, ইতর কোথাকার! মেয়েদের সম্মান করতে শেখেননি?

শুনুন ম্যাডাম, আপনারও উচিত পুরুষদের সম্মান করা। দুম করে গাড়ি থামিয়ে যাকে-তাকে হ্যারাস করার উদ্দেশ্য কী? হিরোইন হতে চান নাকি?

পরিতোষ নেমে এসে বৃতীকে আগলে দাঁড়িয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না ভাই, দিদিমণি একটু টেনশনে আছেন। কেউ ওঁকে ডিস্টার্ব করছে বলেই টেনশন। আমি আপনাকে চিনি, আপনি পাপান ব্যানার্জির ছেলে। দিদিমণি দিল্লিতে থাকেন তো, তাই আপনাকে চেনেন না।

ছেলেটা আর কথা বাড়াল না, মাথায় হেলমেটটা পরার আগে বলল, ঠিক আছে। গাড়িটা সাইড করুন, আমি বেরিয়ে যাই। আর দিদিমণিকে মাথা ঠান্ডা করতে বলুন।

পরিতোষ গাড়ি সাইড করল, পাপান ব্যানার্জির ছেলে মোটরবাইক হাঁকিয়ে বেরিয়ে গেল।

রাগে গরগর করতে করতে বৃতী জিজ্ঞেস করল, কে ছেলেটা?

পাপান ব্যানার্জি লেক গার্ডেনসে থাকে, শতরূপ ফিল্মসের মালিক। বিরাট প্রোডিউসার। এ হচ্ছে পাপান ব্যানার্জির ছোটো ছেলে পিতুন। শোনা যাচ্ছে, শিগগিরই বোম্বে ছবির হিরো হবে।

ওঃ, তাই এত গরম?

না দিদিমণি, পিতুন ছেলে খুব ভালো।

ও আমাকে ঠিকই ফলো করছিল। আমি জানি। কীরকম মুখের ওপর অপমান করে গেল, দেখলে?

আজকালকার ছেলেদের মাথা এমনিতেই গরম দিদিমণি।

পাপান ব্যানার্জির ছেলে তো! দাঁড়াও, ব্যবস্থা করছি।

পরিতোষ চুপ করে রইল। দিদিমণির মাথা এখন আগুন, কিছু আলটপকা বলে বসলে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হবে।

বুধন আর প্রিয়া তার জন্যই আজ ছুটি নিয়ে অপেক্ষা করছে ওদের বালিগঞ্জের স্টুডিয়োতে। বুধন প্যারিস ফেরত ফ্যাশন ডিজাইনার, প্রিয়া বিউটিশিয়ান। পাশাপাশি তাদের স্টুডিয়ো আর পারলার। দুজনেরই প্রচুর পয়সা, খ্যাতি আর গুডউইল আছে। আজ দুজনেই কাজ থেকে ছুটি নিয়েছে, কর্মচারীরা ব্যবসা চালাবে। অন্য বন্ধুরা অপেক্ষা করবে পার্ক স্ট্রিটের একটা রেস্তোরাঁয়। দিনটা ভালই কাটবার কথা ছিল। কিন্তু বৃতীর মন ভাল নেই। তার একই সঙ্গে ভয়, সন্দেহ, রাগ ও অপমান বোধ হচ্ছে।

পরিতোষদা, গাড়িটা ঘুরিয়ে একটু সাউথ সিটি চলো তো?

ঠিক আছে দিদিমণি।

আজ সাপ্তাহিক কাজের দিন। সাউথ সিটি মল-এ তাই ভিড় নেই। ভিড় পছন্দও করে না বৃতী। সাউথ সিটিতে নেমে সে সোজা স্টারমার্কে চলে এল। মনকে শান্ত করতে হলে কিছু একটা করতে হবে। হাতে এখনও ঘণ্টা দেড়েক সময় আছে। মনটাকে ভারমুক্ত করার জন্য তার সবচেয়ে ভাল ওষুধ হল অ্যাস্টারিক্সের কমিক্স পড়া।

স্টারমার্ক আজ প্রায় ক্রেতাশূন্য। বৃতী কয়েকটা না-পড়া অ্যাস্টারিক্সের কমিক্সের বই তুলে নিয়ে একটা টুলে বসে পড়তে শুরু করল। কিন্তু প্রত্যাশিত ব্যাপারটা ঘটল না। আবার হঠাৎ সেই অস্বস্তি। কেন যেন মনে হচ্ছে, এখানেও কেউ তার ওপর নজর রাখছে। তেমন কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছে না সে। দোকানের কর্মচারী ছাড়া ছড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকজন মানুষ বইপত্র দেখছে। তাদের মধ্যে জনাদুয়েক বয়স্ক মানুষ। জনা চারেক মহিলা, তবে শেলফের আড়ালে, এপাশে-ওপাশে কেউ থাকতে পারে। সবাইকে তো দেখা যাচ্ছে না। বইগুলো রেখে বৃতী উঠল। তারপর দৃঢ় পায়ে গোটা স্টোরটা একপাক ঘুরে দেখল। একথা সত্যি যে, বইয়ের র‍্যাকের আড়ালে-আবডালে বেশ কিছু লোক আছে। কিন্তু যে যার নিজের নিজের পছন্দের বই বা সিডি

দেখছে। তার দিকে কেউ লক্ষ করছে না। কিন্তু কেউ না কেউ যে করছে সেটা টের পাচ্ছে একমাত্র বৃতী। কিন্তু আজ একবার সন্দেহের বশে ভুল করেছে, তাই দ্বিতীয়বার ভুল করতে চায় না।

মাথাটা গরম, বুকের ভিতর ঢিব-ঢিব। ব্যাপারটা কি তার মনের ভুল? মাথাটা কি খারাপ হয়ে যাচ্ছে তার? কে তার ওপর নজর রাখবে, আর কেনই বা? কমিক্সের বই আবার খুলে বসল বৃতী। কিন্তু একটু পরেই নিজেই বুঝতে পারল যে, তার মন মোটেই অ্যাস্টারিক্সের কাণ্ডকারখানায় আবদ্ধ হয়ে নেই। বই খুলে সে বসে আছে মাত্র, সম্পূর্ণ ভূতগ্রস্ত।

হঠাৎ তাকে চমকে দিয়ে কানের কাছে কেউ চাপা গলায় বলল, ম্যাডাম, আপনি কি কোনো প্রবলেমের মধ্যে আছেন?

বাঁদিকে মুখ ফিরিয়ে সে যাকে দেখতে পেল সে একজন খুব সাধারণ চেহারার ছেলে। বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ বয়স হবে। পরনে একটা ঢোলা স্ট্রাইপ-দেওয়া ক্রিম রঙের হাওয়াই শার্ট, পরনে জিনস। মুখটা একটু ভাঙাচোরা, গাল বসা, রোগাটে চেহারা। তবে চোখে বুদ্ধির ছাপ আছে।

বৃতী একটা বড়ো শ্বাস ফেলে বলল, আপনি আমাকে খুব চমকে দিয়েছেন! আপনি কে বলুন তো!

আমার নাম সুজিত দে। একটা ট্রাভেল এজেন্সিতে চাকরি করি।

আপনি কি আমাকে চেনেন?

আপনার সঙ্গে আমার পরিচয় নেই ঠিকই, তবে আমি জানি আপনি বিটুদার বোন। দিল্লিতে থাকেন। আপনার বিয়ের পর পদবি পাল্টে নাম হয়েছে বৃতী দাশগুপ্ত।

আপনি তাহলে আমার দাদার বন্ধু?

সুজিত জিভ কেটে বলে, আরে না। বিটুদার বন্ধু হওয়ার মতো স্ট্যাটাস আমার নয়। বিটুদা কোথাও গেলে আমার এজেন্সি থেকেই প্লেন বা ট্রেনের টিকিট কাটেন। সেই সূত্রেই আপনাদের বাড়িতে আমাকে যাতায়াত করতে হয়। বিটুদা আমাকে খুবই স্নেহ করেন। এমনকি আপনার বিয়ের সময়েও আমি ডেকোরেটর আর ক্যাটারার ঠিক করে দিয়েছিলাম। আপনি আমাকে কয়েকবার হয়তো দেখেছেনও। তবে আমার চেহারাটা ইমপ্রেসিভ নয় বলে হয়তো মনে রাখেননি।

একটু নিশ্চিন্ত হয়ে বৃতী বলল, আপনি কী করে বুঝলেন আমার প্রবলেম চলছে? আপনিই বা এখানে কী করছেন?

আমার চাকরির বেতন সামান্য। তাই আমাকে পেট চালাতে সাইড বিজনেস করতে হয়। আমি এরকম কয়েকটা স্টোরে স্টেশনারিজ সাপ্লাই করি। আমি একজন অনেস্ট অ্যান্ড হার্মলেস মানুষ, ম্যাডাম।

বৃতী এ কথাটায় হেসে ফেলল, নিজেকে দিব্যি একটা সার্টিফিকেট দিয়ে বসল তো ছেলেটা! তারপর একটু গম্ভীর হয়ে ভেবে নিয়ে বলল, আপনি খুব একটা ভুল সন্দেহ করেননি। কয়েকদিন ধরেই মনে হচ্ছে, কেউ আমাকে মাঝে মাঝেই ফলো করছে এবং আমার ওপর নজর রাখছে। সন্দেহটা অমূলক বা ভুলও হতে পারে। কিন্তু আমি একটু টেনশনে আছি।

সুজিত চাপা গলায় বলল, আপনার সন্দেহ মোটেই অমূলক নয় ম্যাডাম। আপনার সিক্সথ সেন্স ভালোই কাজ করছে। আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল আপনি বেশ টেনশনে আছেন। একটু আগে আপনি গোটা স্টোরে একটা চক্করও দিয়ে এলেন। আপনাকে চিনি বলেই আমি একটু কনসার্নড ফিল করি, নিজের মতো করে একটু নজরও রাখি। আমার মনে হয়েছে, ইউ আর বিয়িং ফলোড।

বৃতীর বুকটা ধক করে উঠল। উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলল, কে বলুন তো!

ম্যাডাম, লোকটাকে আমি চিনি না। তবে কালোমতো, লম্বা আর টাফ চেহারার একজন লোক। আমার বয়সিই হবে। গায়ে একটা সাদা টিশার্ট আর গ্রে ট্রাউজার্স। বাঁ হাতে একটা স্টিলের বালা আছে। আধঘণ্টা বা চল্লিশ মিনিট আগে আপনি যখন স্টোরে ঢুকলেন, লোকটা তার এক মিনিটের মধ্যেই ঢুকল। ক্রিমিন্যালদের দেখেই বোঝা যায় যে তারা ক্রিমিন্যাল।

বৃতী সাদা মুখে বলল, লোকটাকে ক্রিমিন্যাল বলেই কি মনে হল আপনার?

হ্যাঁ ম্যাডাম। অনেক ঘাটের জল খেয়ে তো আমাদের বেঁচে থাকতে হয়, তাই ওসব চিনে নিতে অসুবিধে হয় না। লোকটা আপনার কাছে কিন্তু যায়নি। ওই পাশে একটা বুকর‍্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল। লোকটা যে পড়ুয়া নয় তা ওর হাবভাব থেকেই বুঝে গিয়েছিলাম। তারপর দেখলাম, আপনিও বেশ নার্ভাস। আপনাকে আমি চিনি, কিন্তু ফট করে এসে পরিচয় দিতে সাহস হচ্ছিল না। আমি সব কাজ ফেলে লোকটাকে লক্ষ করতে থাকি। আমার মনে হল, লোকটা আপনারই পিছু নিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে।

লোকটা কি গুন্ডা বা খুনি বা...?

ওসব নিয়ে ভাবছেন কেন? বিটুদাকে জানিয়ে দিন না, দু'দিনেই টিট হয়ে যাবে।

বৃতী সুজিতের দিকে চেয়ে বলল, লোকটার পরিচয় না জানলে দাদাকে কী বলব?

ঘটনাটা বললেই হবে। বিটুদার নেটওয়ার্ক তো খুব ভাল। দেখবেন দু'দিনেই লোকটাকে আইডেন্টিফাই করে ফেলবেন বিটুদা।

বৃতী শুকনো মুখে বলল, অতটা করতে চাইছিলাম না। এখন দেখছি দাদাকে জানাতেই হবে।

হ্যাঁ ম্যাডাম, লোকটাকে আমার খুব একটা ভাল লোক বলে মনে হল না। বিটুদাকে জানানোই ভাল। পুলিশকেও জানিয়ে রাখতে পারেন।

ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ ফর ইওর হেল্প।

বৃতী উঠে দাঁড়াল। এবার তার যাওয়া উচিত। বন্ধুরা অপেক্ষা করছে।

ম্যাডাম, একটা কথা।

কী কথা?

আমার মোবাইলটা সস্তা জিনিস। তবু আমি লোকটার গোটাকয়েক ছবি তুলে নিয়েছি। মুখোমুখি নিতে সাহস হয়নি, পাশ থেকে নিয়েছি।

বৃতী অবাক হয়ে বলে, সত্যি?

হ্যাঁ ম্যাডাম।

দেখি!

সুজিত তার মোবাইল তুলে মোট তিনটে ছবি দেখাল। মোবাইলটা সত্যিই খারাপ। স্ক্রিনটা আবছা, ছবিও ভাল ওঠেনি। শুধু একটা কালোমতো লোককে দেখা যাচ্ছে, বেশ লম্বা। কিন্তু পাশ ফেরানো মুখটা ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে, বোঝা যায়। কিন্তু ফিচার কিছু বুঝবার উপায় নেই।

আমার মোবাইলের ছবি খুব খারাপ আসে, ম্যাডাম।

তাই দেখছি। মুখটা তো বোঝাই যাচ্ছে না।

সরি ম্যাডাম, ছবিগুলো তেমন কাজে লাগবে না বোধহয়।

তা না লাগুক, আপনি তো দেখেছেন লোকটাকে? দরকার হলে আইডেন্টিফাই করতে পারবেন।

তা পারবো ম্যাডাম। আমার মেমোরি খারাপ নয়।

তাহলেই হবে। আমি আপনার ফোন নম্বরটা পেতে পারি কি?

পারেন। আর বিটুদাও জানেন।

বিটুদা সবসময়ে অ্যাভেলেবল নন, উনি তো রাজনীতিও করেন। আমার ফোনে সেভ করে রাখছি।

ঠিক আছে ম্যাডাম।

থ্যাংক ইউ সুজিতবাবু। আমাকে এখন যেতে হবে। বন্ধুরা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

আপনার সঙ্গে কি গাড়ি আছে?

আছে।

যদি বলেন তো আপনাকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি।

তার দরকার নেই। চারদিকে লোকজন আছে। আর আমি খুব একটা ভীতু মেয়ে নই।

ঠিক আছে ম্যাডাম। যখন দরকার হয় ডাকবেন।

কার পার্কে এসে গাড়িতে উঠে বৃতী বলল, পরিতোষদা, ভাল করে লক্ষ রেখো তো, কোনো কালো লম্বা চেহারার ছেলে, গায়ে সাদা টিশার্ট আর গ্রে রঙের প্যান্ট পরা, ধারে-কাছে আসছে কিনা। মাথায় ঝাঁকড়া চুল আছে।

পরিতোষ একটু অবাক হয়ে বলল, কালো লম্বা চেহারার একটা ছেলে তো? গায়ে সাদা টিশার্ট?

হ্যাঁ।

সে তো একটু আগেই এসে আমার সঙ্গে কথা বলে গেল।

সে কী?

হ্যাঁ। আমার পাশেই তার মোটরবাইকটা পার্ক করা ছিল।

কী বলল?

তেমন কিছু নয়। প্রথমেই জানালায় উঁকি দিয়ে বলল, মিঠুকাকা না? আমি বললাম, না, আমি মিঠুকাকা নই। তখন বলল, ও সরি, আমার ভুল হয়েছিল। তারপর দু-চারটে হালকা কথা। তারপর বাইক চালিয়ে চলে গেল।

নম্বরটা দেখেছো?

না। তবে বাইকটা রয়াল এনফিল্ড।

মুখটা দেখেছো তো?

না দিদিমণি, হেলমেটে মুখ ঢাকা ছিল। কথা বলার সময় হুডটা একটু তুলে কথা বলছিল।

কী জিজ্ঞেস করল তোমাকে?

তেমন কিছু নয়। বলল, এটা কি ভাড়া করা গাড়ি? আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর বলল, আমি মাঝে মাঝে গাড়ি ভাড়া নিই, আপনাদের নম্বরটা দেবেন তো। আমার কাছে কার্ড ছিল, দিয়ে দিলাম। ব্যস, আর কিছু নয়। কেন কী হয়েছে দিদিমণি?

চিন্তিত মুখে বৃতী বলে, ঠিক বুঝতে পারছি না। ছেলেটা ফলো করছে বুঝতে পারলে আমাকে বোলো। এখন চলো, অনেক দেরি হয়ে গেছে। এটা ভাড়া করা গাড়ি তা কী করে বুঝল বলো তো?

তা তো জানি না দিদিমণি।

তার মানে ছেলেটা খবর রাখে যে, এটা ভাড়ার গাড়ি।

।। তিন ।।

খবরটা কি শুনেছেন তিমিরবাবু?

না শুনে কি উপায় আছে? খবরের কাগজ, টিভি সর্বত্র হটেস্ট খবর।

আপনার রিঅ্যাকশন কী?

আই ফিল রেচেড অ্যান্ড হোপলেস।

শুনুন, আমি আপনার উকিল। যদিও আমি আপনার কাছ থেকে কোনো কনফেশন চাইছি না। শুধু অনেস্টলি জিজ্ঞেস করছি, এই ব্যাপারটায় আপনার কোনো হাত নেই তো?

সুবর্ণবাবু, আপনার কি আমাকে এতটাই খারাপ লোক বলে মনে হয়? অথচ সেদিনও আপনি বলতেন আপনি আমার বন্ধু?

বন্ধু বলেই তো বলছি। বন্ধুর সম্পর্কে সবসময়ে একটা ভাল ধারণা থাকা দরকার।

আপনার মত পরিবর্তন করা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমি তাতে কন্ট্রিবিউট করতে পারি না। তবে নিজের বন্ধু সম্পর্কে আপনার সন্দেহের কোনো কারণ নেই। আপনার কি মনে হয়, পুলিশ আমাকেও

জড়াতে পারে?

পুলিশের ব্যাপার পুলিশ বুঝবে। আমার কমনসেন্স বলছে, পুলিশ আপনাকে জড়াবে না। কারণ নেই। তবু যদি চান তো আমার এক ক্রিমিন্যাল ল-ইয়ার বন্ধু আছে, তার সঙ্গে যোগাযোগ করে দিতে পারি।

না। তার দরকার নেই।

সুপ্রিয়দার অপারেটরটিকে কি আপনি কাজে লাগিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

এনি রেজাল্ট?

হ্যাঁ। সে দু'দিনের মাথায় খবর দিয়েছিল যে, বৃতী তার হাজব্যান্ডকে নিয়ে কলকাতায় এসেছে।

বাপের বাড়িতে?

অফকোর্স। ওর বর শুভর বেস হচ্ছে বেনারস। কলকাতায় ওদের তেমন কেউ নেই। আর বৃতীদের গল্ফগ্রিনের বাড়িটা তো বিশাল।

ডিড ইউ ট্রাই টু মিট হার?

না। সাহস হল না।

তাহলে খোঁজ নিলেন কেন?

ভেবেছিলাম একবার গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াবো। কয়েকটা প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমি বেসিক্যালি কাপুরুষ। আজ অবধি কোনো সাহসের কাজ করিনি।

সাহসের কাজটা না করে ভালই করেছেন। করলে বিপদ ছিল। বাই দি বাই, আপনি সেদিন বলেছিলেন, বৃতীর হাজব্যান্ডের পরিচয় আপনি জানেন না। অথচ আজ দিব্যি তার নাম এবং ধামও বলে দিলেন! ব্যাপারটা কী?

এটা কোনো প্রশ্ন হল? সুপ্রিয়বাবুর অপারেটর পরাশর তো আর এমনি পয়সা নেয়নি? কাজ করেই পয়সা নিয়েছে।

তাই তো! ভুলে গিয়েছিলাম।

ছেলেটি চটপটে এবং স্মার্ট। মাত্র দু'দিনেই সব ইনফর্মেশন, এমনকি বৃতীর মোবাইল নম্বরও জোগাড় করে এনেছিল।

ফোন করেছিলেন নাকি?

না।

বৃতীর ফোনে আপনার কথা রেকর্ড পেলে ঝামেলা হত।

আমি ফোন করিনি সুবর্ণবাবু। বললাম না, আমার সাহসের বড়ো অভাব। তবে আমার মোবাইল ফোনটা কাল থেকে পাচ্ছি না। কোথায় রেখেছি কে জানে।

এই রে! থানায় ডায়েরি করেছেন?

আমার তো প্রায়ই মোবাইল হারায়। থানায় ডায়েরি করি না তো!

এক্ষুনি গিয়ে ডায়েরি করুন। আর নিজের আই ডি প্রুফ নিয়ে গিয়ে সেম নম্বরের সিমকার্ডের জন্য দরখাস্ত করুন।

এসব করার কোনো দরকার আছে কি?

আছে। সময়টা আপনার পক্ষে ভালো নয়। আর আজকাল পুলিশ ক্রিমিন্যাল কেস-এ মোবাইল নিয়ে বিস্তর জলঘোলা করে। মোবাইল একদিক দিয়ে উপকারী জিনিস বটে, কিন্তু অন্য দিক দিয়ে ডেনজারাস। যান, দেরি করবেন না।

ঠিক আছে। যাচ্ছি।

আচ্ছা মশাই, আমি তো আপনার সঙ্গে আপনার মোবাইল নম্বরেই কথা বলছি।

তিমির হেসে উঠে বলল, তা তো বলছেনই।

তাহলে ব্যাপারটা কী?

আপনাকে একটু চমকে দিলাম আর কী। উকিল মানুষের কি এতটা অন্যমনস্ক থাকা উচিত?

আচ্ছা পাজি লোক মশাই আপনি।

সুবর্ণবাবু, মোবাইলের কল রেকর্ড মুছে ফেলা যায়। পুলিশ কল রেকর্ড কালেক্ট করে নেটওয়ার্ক থেকে। আমার মোবাইল হারালেও পুলিশকে ঠেকানো সম্ভব নয়। আপনি অকারণ দুশ্চিন্তা করছেন।

হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। আমার আই কিউ বোধহয় আজ তেমন কাজ করছে না।

শুনুন, আপনাকে দু-একটা ইমপর্ট্যান্ট কথা বলার আছে।

কী কথা?

দিন তিনেক আগে হঠাৎ বৃতীর সঙ্গে আমার দেখা হয়।

হঠাৎ?

হঠাৎ মানে বাই চান্স নয়। দেখাটা হয়েছিল বৃতীর অনুরোধেই।

এসব কথা আগে বলতে হয়।

কথাটা প্রকাশ করার মতো ছিল না। বৃতী আমাকে এক রাতে হঠাৎ ফোন করে বলে, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আমি খুব অবাক হই। যার হোয়্যার-অ্যাবাউটস জানার জন্য আমি প্রাইভেট ডিকেটটিভ লাগিয়েছি সেই হঠাৎ আমাকে উপযাচক হয়ে ফোন করছে, ভাবা যায়?

ইন্টারেস্টিং। কী বলল?

আমরা টলি ক্লাবে মিট করি। পরদিন দুপুরবেলা। বিয়ের পর চেহারাটা একটু পাল্টে গেছে। যাওয়াই স্বাভাবিক। মেক-আপটাও যেন একটু বেশি করেছিল। কিন্তু চোখমুখের উদ্বেগ তাতে চাপা থাকেনি।

উদ্বেগ?

হ্যাঁ। শি ওয়াজ ভেরি মার্চ আপসেট।

কেন?

আরে মশাই, সেটাই তো বলছি, ধৈর্য ধরে শুনুন। কিছুক্ষণ পুরোনো সম্পর্ক নিয়ে কথা হল। একটু কান্নাকাটি করল। শি ওয়াজ এ গুড গার্ল। আমাকে ডিচ করেছিল বটে, কিন্তু সে আমার ভালোই চেয়েছিল। চাপে পড়ে বিয়ে করতে হয়েছিল, কিন্তু সেটাও মেনে নিয়েছিল। মোটামুটি একটা বাঁধা গতের জীবন-যাপন করছিল বৃতী। কিন্তু হঠাৎ একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কেউ নাকি দিল্লি থেকেই তাকে ফলো করছে। সবসময়ে নয়। রাস্তায়-ঘাটে, রেস্তোরাঁয় বা আউটডোরে। তার চলাফেরার ওপর নজর রাখছে। কিন্তু লোকটা কে তা বুঝতে পারছে না। কিছুদিন ওয়াচ করার পর ওর বরকেও জানায়। দুজনে ঠিক করে যে, অ্যালার্ট থাকবে। প্রথমেই পুলিশ-টুলিশকে জানিয়ে একটা মেলোড্রামা করতে চায়নি। এসব শুনে আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কারণ ওর পিছনে আমিই তো একজন প্রাইভেট গোয়েন্দা লাগিয়েছি। বৃতী হয়তো সেটাই টের পেয়েছে। আই ওয়াজ রিপোটেন্ট। বৃতীকে বললাম, তুমি অত আপসেট হয়ো না, আসলে তোমার খোঁজখবর নেওয়ার জন্য আমিই একজনকে লাগিয়েছিলাম। শুনে বৃতী খুব রাগ করল। উঠে চলেও যাচ্ছিল। আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফের ওকে বসাই এবং পরাশরকে টেলিফোন করে ডেকে পাঠাই। ইমার্জেন্সি বুঝে পরাশর ট্যাক্সি করে এসে আধঘণ্টার মধ্যে হাজির হয়।

তারপর?

বলছি। পরাশর নিরীহ ছেলে। চালাক-চতুর হলেও সে এমনিতে ভালমানুষ গোছের। তাকে দেখে বৃতী অবাকই হল। বলল, না, এ তো নয়! সে অন্য লোক। পরাশরও কবুল করল, সে বৃতীকে দিল্লিতে ফলো করেনি, কলকাতাতেও না। সে নানা সোর্স থেকে বৃতীর খবর সংগ্রহ করেছে। দিন-রাত ফলো করার প্রয়োজনই হয়নি।

তাহলে ব্যাপারটা কী দাঁড়াল?

সেটাই তো আপনাকে জিজ্ঞেস করবো বলে ভাবছিলাম। কেউ বৃতীকে কোনো গূঢ় কারণে ফলো করেছে এবং শেষ অবধি তাকে মেরেছে। হু ইজ দি কালপ্রিট?

বুঝলাম। কালপ্রিট পুলিশ খুঁজবে। আপনি এ ব্যাপারে হাত ধুয়ে ফেলুন। পরাশরের ব্যাপারটাও কাউকে বলতে যাবেন না যেন, ফেঁসে যেতে পারেন।

আমি পাগল হতে পারি, গাধা নই।

আপনি পাগল তো ননই, গাধাও নন, জানি। তবু মানুষ আপসেট হলে বুদ্ধি স্থির থাকে না। তাই বললাম।

থ্যাংক ইউ। আমার মনটা খারাপ ঠিকই, কিন্তু বুদ্ধি ঘোলাটে হয়নি।

বৃতী যে আপনার সঙ্গে দেখা করেছিল এটা কেউ জানে?

তা কী করে বলবো? আমি কাউকে বলিনি। তবে টলি ক্লাবে আমি তো নোন ফেস, অনেকেই চেনে। ওই ক্লাবে বিটুরও যাতায়াত আছে। সুতরাং আমাদের সাক্ষাৎকারটা খুব গোপন থাকবে বলে আশা করা যায় না। যদিও একটা আলাদা ঘরে বসেছিলাম।

কতক্ষণ একসঙ্গে ছিলেন?

আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা।

অনেকটা সময়।

হ্যাঁ। অনেক কথা জমে ছিল তো! সময়টা খেয়ালই ছিল না। ওর হাজব্যান্ডের একটা ফোন আসার পর ও তাড়াহুড়ো করে চলে গেল।

ওই একবারই দেখা হয়েছিল?

তিমির একটু চুপ করে থেকে বলল, ধরে নিন, তাই।

কিছু লুকোতে চাইছেন?

ধরুন তাই।

সেটা আপনার ইচ্ছে, কিন্তু উকিল এবং বন্ধুর কাছে চেপে গেলে কাজটা ঠিক হবে না। সব কিছু আগে জানা থাকলে একটা লাইন অফ ডিফেন্স তৈরি করে রাখা যায়।

হ্যাঁ, উই মেট এগেন।

কবে?

পরদিন। ওর হাজব্যান্ড অফিসের কাজে গৌহাটি গিয়েছিল। দুপুরে আমরা ফের মিট করি।

আবার টলি ক্লাবে?

সব কিছুই কি বলতে হবে?

বলাই ভাল।

আমরা একসঙ্গে রাজপুরে গিয়েছিলাম।

তার মানে রাজপুরে আপনার যে বাংলো আছে সেখানে?

হ্যাঁ।

মাই গড! অ্যান্ড ইউ হ্যাড ইন্টিম্যাসি?

হোয়াই নট? বৃতী নিজেই বলেছিল, আমি তোমাকে বঞ্চিত করেছি। তার কিছুটা শোধ করতে চাই।

সে তো বুঝলাম। মর‍্যাল অ্যাঙ্গেলটা না হয় বাদ দিচ্ছি। কিন্তু বৃতী ওয়াজ বিয়িং শ্যাডোড। সুতরাং আপনাদের রোম্যান্টিক অভিসারটা হয়তো গোপন থাকেনি।

হুঁ। তবে সে সব মাথায় ছিল না আমাদের। আবেগে একটু ভেসে গিয়েছিলাম।

কিন্তু আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেললেন। পুলিশ কতদূর কী খোঁড়াখুঁড়ি করবে কে জানে। এনিওয়ে এখন একদম লক্ষ্মীছেলের মতো চুপচাপ থাকুন। আর কারও কাছে কিছু বলবেন না।

ঠিক আছে।

।। চার ।।

শবর দাশগুপ্ত বলছি।

নমস্কার।

হ্যাঁ, নমস্কার। বলুন।

আপনি বৃতী দাশগুপ্তের মার্ডার কেসটা দেখছেন তো?

হ্যাঁ। আপনি কে বলছেন?

পরিচয়টা একটু পরে দেবো। বৃতী দাশগুপ্ত গল্ফগ্রিনের রাস্তায় রাত এগারোটায় গাড়ির মধ্যে খুন হয়। ড্রাইভার পরিতোষ উন্ডেড। সে একজন কালো লম্বা লোককে মোটরবাইকে চেপে গুলি চালাতে দেখে। ইজ ইট ওকে?

হ্যাঁ। আপনি কিছু যোগ করতে চান কি?

হ্যাঁ মিস্টার দাশগুপ্ত। ওবভিয়াসলি লোকটা সুপারি কিলার।

হতে পারে।

আপনারা কি তাকে অ্যারেস্ট করেছেন?

এখনও নয়। আপনি কি তার খোঁজখবর রাখেন?

না মিস্টার দাশগুপ্ত। সুপারি কিলার মানে ভাড়াটে খুনি। তারা কাজটা করে দেয়। তবে তাদের টাকা ছাড়া কোনো মোটিভ থাকে না। খুনটা যে বা যারা করায় মোটিভ থাকে তাদের।

সে তো ঠিক কথা। আর কোনো হিন্ট দেবেন?

হ্যাঁ। আমি আপনাকে একটা ভিডিয়ো সিডির কপি পাঠাতে চাই।

কী আছে তাতে?

আপনি দেখলেই বুঝবেন।

ওকে।

* * *

মিস্টার দাশগুপ্ত, সিডিটা দেখলেন?

হ্যাঁ, দেখলাম।

কিছু বুঝলেন?

সিডিটা কয়েকটা হোটেলের ঘরে তোলা হয়েছে। একজন পুরুষ ও মহিলার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে তোলা। ছেলেটি ডিসিসড বৃতী দাশগুপ্তর স্বামী শুভ। মহিলাটিকেও আইডেন্টিফাই করা গেছে। পারমিতা গর্গ। কিন্তু আমি জানতে চাই এই সিডিটা আপনি পেলেন কোথায়?

ইট ওয়াজ হ্যান্ডেড ওভার টু মি বাই বৃতী দাশগুপ্ত।

একটা কথা বলবো?

বলুন।

হোটেলের ঘরে কিন্তু সিসি টিভি থাকে না। তাতে গেস্টদের প্রাইভেসি নষ্ট হয়। তাহলে এই ছবি তুলেছে কে এবং কীভাবে?

বৃতী একজন প্রফেশনালকে লাগিয়েছিল।

শুনুন মশাই, আজকাল ফটোগ্রাফির অনেক ট্রিক আছে। কাজেই আমি এই সিডিটা আসল না সুপারইমপোজড তা জানবার জন্য ল্যাব-এ পাঠিয়েছি। রেজাল্ট না এলে কিছু বলা যাবে না। আপনি আর দেরি না করে সারেন্ডার করুন।

তার মানে?

আমার অনুমান কদাচিৎ ভুল হয়। সম্ভবত আপনি তিমির রায়। বৃতীর প্রেমিক। ঠিক বলছি কি?

হুঁ।

আমাদের হোমওয়ার্ক হয়ে গেছে, তিমিরবাবু। শুধু সময়ের অপেক্ষা। কনসিডার ইওরসেলফ আন্ডার অ্যারেস্ট।

[বৈশাখ ১৪২২]

—

নেকলেস

বলুবাবু, এই জনপদটি কি আপনার পছন্দ হয় নাই?

খারাপ কি? মোটামুটি গ্রামাঞ্চল যেমন হয় তেমনি আর কি।

না মহাশয়, ইহার কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। যদি কয়েকদিন অবস্থান করেন তবে ক্রমে ক্রমে লক্ষ করিবেন।

কী বৈশিষ্ট্য শাসনবাবু? পুরাকীর্তি নাকি? আপনি তো পুরাকীর্তির একজন আবিষ্কারক।

শাসন মৃদু হাসল। তারপর বলল, তাহা বলিতে পারেন। এই স্থানে পুরাকীর্তি কিছু আছে। তবে তাহা খুব একটা পুরাতন নহে। দুই-চারিশত বৎসরের পুরাতন কিছু মন্দির ভগ্নদশাগ্রস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ভারতের সর্বত্রই এরূপ দেখা যায়। না মহাশয়, আমি পুরাকীর্তির কথা কহিতেছি না।

তবে?

এই স্থানে বাস করিলে মনে একটা পবিত্র ভাব আইসে।

বলু হেসে মাথা নেড়ে বলে, না মশাই, আমি নিতান্ত পাপী-তাপী মানুষ। পবিত্র ভাব থাকলেও তা বুঝবার মতো সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার নেই। তার ওপর আমি ঘোর নাস্তিক।

তাহা আমি জানি। আস্তিক-নাস্তিক লইয়া বড় বিরোধ। যাহা হউক, এই স্থানের একটা ভাবগত মাহাত্ম্য আছে বলিয়াই মনে হয়। দুই-চারিদিন অবস্থান করিলে বোধ করি আপনিও অনুভব করিবেন।

বলু কাল রাতে এসে পৌঁছেছে। রাতের অন্ধকারে বাড়িটার শ্রীছাঁদ লক্ষ করেনি। এখন সকালের শারদীয় নরম আলোয় লক্ষ করল, বাড়িটা আর পাঁচটা গাঁয়ের বাড়ির মতোই। পাকা মেঝে এবং ইটের দেয়াল আর টিনের চালওলা দুখানি ঘর, সামনে বারান্দা, একটুখানিক একটা উঠোন, উঠোনের একধারে টালির চাল আর বাঁশের বেড়া দেওয়া রান্নাঘর আর ঠাকুরঘর পাশাপাশি। একটু দূরে একটা স্যানিটারি পায়খানা। দারিদ্র্যের চিহ্ন আছে, কিন্তু অপরিচ্ছন্নতা নেই। চারদিকটা তকতকে ঝকঝকে পরিষ্কার। সম্ভবত শাসন ভট্টাচার্যের দ্বিতীয় বউ লক্ষ্মীমন্ত। কাল রাতে আর আজ সকালে দু-ঝলক তাকে দেখেছে বলু। সাদামাটা গেঁয়ো চেহারা, তবে মুখখানায় একটা হাসি-হাসি ভাব আছে সর্বদাই। শাসনের প্রথম বউ ছিল খুবই সুন্দরী এবং দুশ্চরিত্রা। সে খুন হয়ে যায় তার জায়ের হাতেই। শাসনকে খুন করারই পরিকল্পনা ছিল, বরাতজোরে শাসন বেঁচে যায়। সেই বউকে বলু দেখেনি। তবে সেই বিয়ের তিক্ত অভিজ্ঞতায় শাসন সারা জীবন আর বিয়েই করবে না বলে স্থির করেছিল। কিন্তু বছর পাঁচেক একা থাকার পর সিদ্ধান্ত বদল করে মাত্র ছয় মাস আগে বিয়ে করেছে। শাসন চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। তার স্থায়ী বাসস্থান বলতে কিছু নেই।

বলু জিজ্ঞেস করল, এটা কি আপনার নিজের বাড়ি?

না মহাশয়, অদ্যাবধি আমার ভদ্রাসন বলিয়া কিছু নাই। ইহা আমার যজমানের বাড়ি। দয়া করিয়া থাকিতে দিয়াছেন।

যজমান মানে কী বলুন তো! কথাটা শুনেছি, মানে জানি না।

আমি ইহাদের পুরোহিত।

এখনও কি পুরুতগিরি করেই আপনার চলছে? তাতে আর কীই বা আয় হয়?

শাসন মৃদু হেসে বলে, না মহাশয়, পুরোহিতদিগের আজকাল আর তেমন সমাদর নাই। অবসর সময়ে আমি মানুষকে মামলা-মোকদ্দমার করাজে পরামর্শ দিয়া থাকি। নানাপ্রকার দরখাস্ত বা দলিলে মুসাবিদা করিয়া দিই। তাহাতে কিছু আয় হয় বটে, কিন্তু উঞ্ছবৃত্তি আর ঘুচিবার নহে।

চাকরিও তো করতে পারেন। শুনেছি আপনার কয়েকজন বেশ ক্ষমতাবান ভক্ত আছে।

বাপ-পিতামহের নিষেধ ছিল। চাকুরি আমাদের বংশে কেহ কখনও করে নাই।

আপনি একটি আশ্চর্য লোক।

হাঁ মহাশয়, সকলেই সেই কথা বলে।

বিবাহিত জীবন কেমন কাটাচ্ছেন শাসনবাবু?

সংসারও একটি ধর্ম, সেই ধর্মই পালন করিতেছি। আপনার কথাও ভাসা ভাসা শুনিয়াছি। বড়ই দুঃখের কাহিনি।

বলু একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কনজুগাল লাইফে আমি একেবারেই আনসাকসেসফুল।

ভাল।

এটাকে ভাল বলছেন?

না মহাশয়, ঘটনাটিকে ভাল কহিতেছি না। তবে আপনি যে দোষটি নিজের ঘাড়ে লইলেন তাহা শুনিয়া ভাল লাগিল। দাম্পত্য কলহ, তো একে অন্যকেই দুষে।

তা ঠিক। তবে আমি আজ ভেবেচিন্তে বুঝতে পেরেছি, বিবাহিত জীবনযাপন করা আমার মতো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

কী হইয়াছিল মহাশয়?

কী আর হবে! আমার জীবন তো জানেন, ক্যামেরাম্যানদের আজ এখানে কাল সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। হাড়ভাঙা খাটনি। তার ওপর প্রচণ্ড মদ খেতাম। বনানী আর কতদিন এসব সহ্য করবে? সে আগে থেকেই একটু নারীবাদী ছিল। খুব স্বাধীনচেতা। বলত, মদ খাবে খাও, কিন্তু মাত্রা রাখবে না কেন? আমার তো জানেন, একবার খেতে শুরু করলে অজ্ঞান না হওয়া পর্যন্ত খেয়েই যেতাম।

জানি মহাশয়।

সেই জন্যই বনানীকে আমি দোষ দিই না। যাকে বিয়ে করেছে সেও আমার বন্ধু অনিমেষ। অনিমেষ খুব গৃহী ছেলে।

আপনাদের মধ্যে কি দেখাসাক্ষাৎ হয়?

হয়। হবে না কেন? মাঝে মাঝে ওরা আমাকে নেমন্তন্ন করেও খাওয়ায়। উই আর ফ্রেন্ডস নাউ।

শাসন হাসল, ইহা বড়ই কৌতুককর ঘটনা। দাম্পত্য সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পর বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা বোধহয় এইকালেই সম্ভব। নহিলে আহত অহং তো সহজে আপসরফা করিতে পারে না।

হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। গিঁট মেরে রেখে লাভ কি? ও তো আর আমার নিজস্ব সম্পত্তি নয়। চলে যেতেই পারে স্বাধীন ইচ্ছায়। দোষ কিছু করেনি।

মহাশয়, গতকাল হইতে আপনি মদ্যপান করেন নাই। মদ্যপান কি ত্যাগ করিয়াছেন?

হ্যাঁ শাসনবাবু। একজন পাঞ্জাবি কবিরাজের ওষুধ খেয়ে মদ ছেড়েছি। তবে ওষুধটা ডেনজারাস।

কেন মহাশয়?

সেই ওষুধ খেলে মদের গন্ধ অসহ্য লাগে, খিদে কমে যায়। কিন্তু বিপদ হল, ওষুধের রিঅ্যাকশনে লিভার এফেকটেড হয়। আমাকে ওই ওষুধ খেয়ে জন্ডিসে ভুগতে হয়েছে। তবে যাই হোক, মদ আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না।

কাজকর্ম কীরূপ চলিতেছে?

মাথা নেড়ে বলু বলে, একসময়ে যেমন কাজ জুটত এখন সেরকম নয়। বেশির ভাগ সময়ে হাতে কাজ থাকে না। আমাদের লাইনে এখন দারুণ কম্পিটিশন।

বলু একটু হাসল।

শাসন বলল, আমার দারপরিগ্রহ করিবার সময়ে বিশেষ অনুষ্ঠান কিছু হয় নাই। তবু স্বজন বন্ধু কয়েকজনকে আহ্বান করিয়াছিলাম। তাঁহারা কয়েকজন আসিয়াছিলেন। আপনি আসেন নাই।

না। তার কারণ তখন ডিভোর্সটা সদ্য হয়েছে। আমার তখন মনের অবস্থা ভাল ছিল না। তবে আপনি আবার বিয়ে করছেন জেনে খুশি হয়েছিলাম।

শাসনের বউ সন্ধ্যা দুটো থালায় সযত্নে সাজানো মুড়ি আর বেগুনি এনে রাখল দুজনের সামনে। থালার একধারে শশার টুকরো, নারকেল কোরা আর কাঁচালঙ্কা। শশার ওপর বিটনুন ছড়ানো।

মহাশয়, এই জলপান আপনার চলিবে কি?

খুব চলবে। মুড়ি আমি ভীষণ ভালবাসি।

সন্ধ্যা বলল, বেগুনি আরও ভাজা হচ্ছে। গরম গরম দিচ্ছি।

শাসন বলল, আহার করুন। এই মুড়ি সন্ধ্যা নিজহস্তে ভাজিয়াছে। ইউরিয়া নাই। খাইয়া একটু ভ্রমণে যাইবেন কি?

যাবো। ঘরে বসে থেকে কী হবে? আচ্ছা শাসনবাবু, আপনি কি স্ত্রীর সঙ্গেও সাধু ভাষায় কথা বলেন?

কেন বলিব না? সাধু ভাষা ছাড়া অন্য ভাষা আমি কদাচ ব্যবহার করি না। তবু তো সাধু ভাষা। আমার পিতামহ বিশুদ্ধ সংস্কৃতে কথা কহিতেন। কদাচ বাংলায় নহে।

ওরে বাবা! আপনার ঠাকুমা বুঝতে পারতেন?

অভ্যাস অনুশীলনে সবই পারা যায়। আমার পিতামহী শেষদিকে কিছু সংস্কৃত কহিতেও পারিতেন।

খেতে খেতে বলু বলল, আপনার কাছে এসে বেশ ভাল লাগছে।

কয়েকদিন এখানে বিশ্রাম করুন। আমি অকিঞ্চন হইলেও যত্নের অভাব হইবে না।

মাথা নেড়ে বলু বলল, মশাই, তা হয় না। আমাকেও তো পেটের ধান্দায় বেরোতে হবে। বিশ্রাম নিলে চলবে কেন?

আর কি বিবাহ করিবেন?

পাগল নাকি? ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার?

সংসারও একটা ধর্ম।

হ্যাঁ, সে তো বললেন। সংসারধর্ম করতেই দু-নম্বর বিয়ে করেছেন তাও বললেন। কিন্তু আমার তো ধর্ম বলতে কিছু নেই। তবে আর সংসারধর্ম কিসের জন্য করব? বিয়ের মধ্যে কী আছে বলুন তো! নিজের জীবনেই তো দেখলাম, অন্তহীন খটাখটি আর তিক্ততা। না মশাই, বিয়ে না করলেই বরং জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটানো যাবে। আর আমার প্রফেশনটাও তো জানেন, স্থিতু হয়ে থাকার উপায় নেই। বউকে সঙ্গ দেওয়া কঠিন।

শাসন শুধু বলল, হুঁ।

মুড়ির পর চা এল। বিস্ময়ের কথা, গাঁয়ের চা যেমন হয়—বেশি মিষ্টি, কড়া লিকার এবং আসাম চায়ের গন্ধ—এ চা সেরকম নয়। বেশ দামি সুগন্ধী চা এবং মিষ্টিও মাপা। বলু খুব উপভোগ করল চা-টা।

কোথায় বেড়াতে যাবো আমরা শাসনবাবু?

মহাশয়, আপনি নাস্তিক, তবু আজ যাহার কাছে লইয়া যাইব তিনি এক সাধুগোছের মানুষ।
তান্ত্রিক নাকি?
হইবে।
তার কাছে কেন?
তিনি আপনাকে কিছু কহিতে চাহেন। আমাকে! আমার সঙ্গে তার কী কথা? শাসন মাথা নেড়ে বলল, বলিতে পারি না।
তিনি তো আমাকে চেনেন না।
তিনি আপনাকে চিনেন এমন কথা তিনি কহেন নাই।
তবে?
চক্ষু-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করিবেন চলুন।
আপনি তো ধন্ধে ফেলে দিলেন মশাই।
শাসন একটু হাসল, ধন্ধ একটু থাকুক। তাহাই মঙ্গল।
কেন বলুন তো, ধন্ধ থাকবে কেন?
নাইলে জীবনটা বড় আলুনি হইয়া যায়।
কিন্তু তা বলে সাধুবাবা আবার ধর্মোপদেশ দেবে না তো?
তাহাও দিতে পারে।
সর্বনাশ!
ধর্মকথা সকলের নিকট অরুচিকর নহে।
তা তো ঠিকই। কিন্তু ধর্মকথা শুনলে যে আমার অ্যালার্জি হয়।
গিয়াই দেখিবেন।
আচ্ছা শাসনবাবু, উনি আমার কথা আপনাকে ঠিক কী বলেছেন তা বলবেন?
তিনি আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।
ভাল জ্বালা। তিনি আমার নাম জানেন?
জানেন।
অদ্ভুত ব্যাপার।
হয়তো এখন অদ্ভুত মনে হইতেছে, পরে তেমন অদ্ভুত মনে হইবে না।
কিন্তু তিনি আমার নাম জানলেন কী করে? আমি তো কোনো বিখ্যাত লোক নই।
তিনি তেমন কথাও কহেন নাই।
তবে কী বলেছেন সেটা বলবেন তো!
আপনি অকারণ উদ্বিগ্ন হইতেছেন। নির্বাণানন্দ কাহারও সাতে-পাঁচে থাকেন না। তাহার সহিত আমার বিশেষ প্রীতির সম্পর্ক।
ভাল জ্বালা, তো হোন না তিনি ভাল লোক, হোন না তিনি আপনার বন্ধু, কিন্তু আমাকে তাঁর কী দরকার?
মহাশয়, আপনাকে যেরূপ মানুষ বলিয়া জানি তাহাতে আপনার উদ্বেগ আশঙ্কার বদলে কৌতূহল প্রবল হওয়ার কথা। আপনি কৌতুকপ্রিয় সাহসী মানুষ ছিলেন।
বলু একথা শুনে একটু থম ধরে রইল। তারপর একটু অন্যরকম গলায় বলল, কী জানেন, আমি সত্যিই আর আগের মতো নেই। একটা ডেসপারেট ভাব ছিল আগে। এখন নানারকম চিন্তাভাবনা এসে পড়ে।
শাসন একটু হেসে উঠে পড়ে বলল, মহাশয়, চলুন, যাওয়া যাক। নির্বাণানন্দ বাস্তবিক আপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী।
একটা কথা শাসনবাবু, আপনি কি এজন্যই আমাকে ঘন ঘন চিঠি দিয়ে এখানে আনিয়েছেন?

মহাশয়, আমার কথা আপনার বিশ্বাস হইবে কি?

হবে। বলুন।

আমার আপনার সঙ্গ করিবারও ইচ্ছা হইয়াছিল। আপনার কথা আমার প্রায়শই মনে হয়। না মহাশয়, নির্বাণানন্দের জন্যই যে আপনাকে আহ্বান জানাইয়াছি তাহা নহে।

নির্বাণানন্দ কি এই গাঁয়ের লোক?

মাথা নেড়ে শাসন বলল, না মহাশয়, তিনি স্থানীয় মানুষ নহেন। বস্তুত তাঁহার সম্পর্কে এই স্থানের মানুষেরা তেমন কিছুই জানেন না।

সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেক জোচ্চোর আছে। ইনি কেমন লোক?

বলা কঠিন। জুয়াচোর হইলেও অতি উচ্চস্তরের জুয়াচোর। আমাদের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তাহা ধরা পড়িবার নহে।

লোকটার বয়স কত?

আপনি গোয়েন্দার মতো প্রশ্ন করিতেছেন।

জানা দরকার। সব ব্যাপারেই একটু হোমওয়ার্ক থাকা ভাল।

বয়ঃক্রম অনুমান কিঞ্চিদধিক পঞ্চচত্বারিংশৎ বর্ষ হইবে।

পঞ্চ! পঞ্চ কত বললেন?

পঞ্চচত্বারিংশৎ।

সেটা পঁচানব্বই না পঁচাশি?

শাসন মৃদু হেসে বলল, পঞ্চোর্ধ্ব চল্লিশ। এবার বুঝিলেন?

পঁয়তাল্লিশ তো!

হাঁ মহাশয়।

ঠিক আছে, চলুন। আমার পুরোনো শত্রু কেউ নয় তো?

তাহাও হইতে পারে।

গেরো।

।। দুই ।।

নির্বাণানন্দ লতার দিকে চেয়ে ছিল। চোখ কিছুটা করুণ। বলল, তোর সেই এক কথা। মন্তর-তন্তর আমি কাউকে দিই না। কতবার কথাটা বলব তোকে?

লতার বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। কালো পেটানো গড়নের শরীর। মুখখানা গোল এবং চোখ বড় বড়। দেখতে সুন্দর না হলেও তার একটা শ্রী আছে। বলল, তা বললে হবে কেন? এই সাধন-ভজন করছ আর মন্তর চাইলেই অমন সিঁটকে যাও কেন?

নির্বাণানন্দের চেহারায় একটা বৈশিষ্ট্য হল, সে বেশ লম্বা এবং ছিপছিপে। রংটা হয়তো কখনও ফর্সাই ছিল। এখন তাম্রাভ। নির্বাণানন্দের মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের একখানা বাউল কায়দার ঝুঁটি, মুখে কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি এবং গোঁফ। নাক তীক্ষ্ণ, চোখমুখ বেশ কাটা কাটা। নির্বাণানন্দও বেশ সুপুরুষ। অতি দীন একখানা চৌকির ওপর পাতা শতরঞ্চি আর সাদা চাদরের বিছানায় বসে সে লতার দিকে তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিক্ষেপ করে বলল, আমাকে সিদ্ধাই পেয়েছিস?

তবে তুমি কী?

আমি একটা বুজরুক।

বুজরুক হলে কেউ ওকথা বলতে পারে?

দ্যাখ, আর জ্বালাসনি। মন্তর-তন্তর আমি জানি না। সাধু সেজে থাকি বটে কিন্তু সাধন-ভজন করতে দেখিস কখনও?

সে তো নিশুতরাতে করো, তখন কি দেখতে আসে কেউ?

ভাল জ্বালা, নিজে জীবনে গুরুকরণ করলাম না, সাধন-ভজন হবেটা কী দিয়ে?

লোকে যে বলে, তুমি রাতবিরেতে শ্মশানে যাও, মড়ার ওপর বসে তপস্যা করো।

তোর মুন্ডু। ভাল একটা সাধু-টাধু খুঁজে নে গা! মন্তর জানলে ঠিক তোকে দিতাম।

শোনো ঠাকুর, অন্যকে যা বোঝাও বোঝাও, এ বাঁদি তেমন মানুষ নয়। তোমাকে আমি ঠিক চিনেছি। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকব দোরে, তখন গাঁক গাঁক করে দেবে।

নির্বাণানন্দ বিরক্ত হয়ে বলল, মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে হয় জানিস? তোর হাত থেকে বাঁচার জন্য অংবং যা খুশি একটা মন্তর তোর কানে দিই।

ওম্মা গো! তাই দাও না ঠাকুর! আমি তো তাই চাইছি।

তবু নিস্তার দিবি না?

নিজে সিদ্ধ হবে আর আমরা আঁটি চুষবো, না? অত সহজে ছাড় পাচ্ছো না বাপু। দু-বছর ধরে বিনি মাগনা মেলামেশা দিয়েছি মন্তর পাওয়ার আশায়। অংবং হয় তো তাই দাও।

নির্বাণানন্দ এবার হেসে বলল, তাই বল, সেটা দেওয়ার পেছনেও অন্য মতলব?

খারাপ মতলব তো আর নয় গো ঠাকুর। টাকাপয়সা তো আর চাইনি, মন্তর চেয়েছি। নিশীথবাবুকে দিয়েছো, বরুণবাবুকে দিয়েছো, আর এই লতা মণ্ডলকে বঞ্চিত করবে?

তাদের যা দিয়েছি তা হল ওই অং-বং। ফুসমন্তরও বলতে পারিস। তোকে কি ঠকাতে পারি রে? যক্ষিণীর মতো আগলে রাখিস আমাকে, তুই না থাকলে কি বাঁচতাম? তোকে স্নেহ করি বলেই বলছি, মন্তর ভাল লোকের কাছে নিস।

একটু নাকি সুরে লতা বলে, তুমি ওইসব বলে কেবল আমাকে ঠেকিয়ে রাখছো। পাপী-তাপী বলেই না মন্তর দিচ্ছো না আমায়। সব বুঝি, সব জানি।

নির্বাণানন্দ হাসতে হাসতে মাথা নাড়ে, ওরে না না। আমাকে যে তুই কেন সাধু ভাবিস তা তুই-ই জানিস। আমিও একজন পাপী-তাপী লোক।

ওকথা বোলো না গো। শুনলেও আমাদের পাপ হয়। তোমার শরীরে পাপবস্তু নেই।

ছোটো ঘরখানার মেঝে আর দেয়াল পাকা, ওপরে টিনের চাল। পাশে একখানা খুপরি রান্নাঘর। সামনে একটু মুঠোভর উঠোন। তাতে কিছু ফুলগাছ আর তুলসীগাছ আছে। ফটকের পাশে একখানা পুরোনো ছোট্টো শিবমন্দির। এ মন্দিরটা একরকম এ বাড়িরই অঙ্গ। নির্বাণানন্দই পুজো করে। ফটকের দিক থেকে একটা পরিচিত গলা পাওয়া গেল, ঠাকুরমহাশয়, গৃহে আছেন কি?

লতা সচকিত হয়ে বলল, ওই অলপ্পেয়ে শাসন ভশ্চায এল।

তুই এখন যা।

শোনো ঠাকুর, শাসনকে বেশি প্রশ্রয় দিও না। ওর অনেক বুদ্ধি, মারণ উচাটন জানে।

জানে নাকি? সে তো ভাল কথা।

চোখ দুখানা দেখেছো! সবসময়ে যেন মাকুর মতো এদিক-ওদিক করছে। ও বড় সোজা লোক নয়।

নির্বাণানন্দ হাসল। তারপর একটু গলা তুলে বলল, আসুন শাসনবাবু, আমি ঘরেই আছি।

লতা উঠে ঘরের অন্য দরজা দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল।

শাসন ও তার পিছু পিছু বলু ঘরে ঢুকতেই উঠে দাঁড়াল নির্বাণানন্দ। চৌকির তলা থেকে দুখানা মোড়া বের করে পেতে দিয়ে বলল, বসুন। চেয়ার-টেয়ার তো নেই, বলুবাবুর হয়তো একটু অসুবিধে হবে।

বলু তার বড় বড় চোখে নির্বাণানন্দের দিকে চেয়ে ছিল। এইসব অদ্রতা-ভদ্রতার তুচ্ছ কথা তার কানে গেল না।

নির্বাণানন্দ বলুর দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, কী, চেনা মনে হচ্ছে?

বলু একটু বিস্ময়াবিষ্ট গলায় বলল, হ্যাঁ। খুব চেনা ঠেকছে। কে বলুন তো আপনি?

আপনিই অনুমান করুন না।

বলুর চোখ হঠাৎ বিস্ফারিত হল। সে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে থেকে বলল, এটাও কি সম্ভব?

শাসন হঠাৎ বলে ওঠে, মহাশয়, অসম্ভব বলিয়া কি কিছু আছে? সকলই সম্ভব।

বলু মাথা নেড়ে বলল, কি করে সম্ভব হয় বলুন! এঁকে দেখে কানু দত্ত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কানু দত্ত পাঁচ বছর আগে প্লেন ক্র্যাশে মারা গেছেন। কনফার্মড নিউজ।

শাসন বলল, কত মিথ্যা সংবাদ প্রতিদিন সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইতেছে।

বলু নির্বাণানন্দের দিকে চেয়ে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করে, আপনি কি সত্যিই কানু দত্ত?

নির্বাণানন্দ মৃদু হেসে বলে, আপনি আমার দুটো ছবির ক্যামেরার কাজ করেছেন। আমাকে চিনতে আপনার অসুবিধে হওয়ার কথা নয়।

হ্যাঁ, আমি তখন মৃদুলদার অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যামেরাম্যান ছিলাম। চিনতেও পারছি। কিন্তু খবরটাও যে সত্যি! ডেডবডি আইডেন্টিফাইও করা হয়েছিল।

নির্বাণানন্দের মুখের হাসিটা যেমন ছিল তেমনি রইল। মৃদু মৃদু মাথা নেড়ে বলল, সব জানি।

প্লেন ক্র্যাশের খবরটা তো আর মিথ্যে নয়। প্লেনের একজন যাত্রীও বাঁচেনি।

জানালা দিয়ে বাইরের উঠোনের দিকে একটু আনমনে চেয়ে রইল নির্বাণানন্দ। তারপর মৃদুস্বরে বলল, প্লেনে একাত্তর জন যাত্রী ছিল। সত্তর জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়। আর একজনের হদিশ যে পাওয়া যায়নি তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামায়নি। ধরে নেওয়া হয়েছিল ওইসব শনাক্তকরণের অতীত সব পোড়া বিকৃত দেহগুলির টুকরো-টাকরার মধ্যেই আর একজনেরও মৃতদেহ ছড়িয়ে আছে। ডিজইন্টিগ্রেটেড।

আমি অবশ্য ততটা ভাল জানি না।

আমি জানি।

ওইরকম ভয়ঙ্কর অ্যাকসিডেন্ট থেকে আপনি কী করে বাঁচলেন?

বললে বলতে হয় দৈব।

আপনি সত্যিই কানু দত্ত?

হ্যাঁ। কিন্তু আলোচনাটা এখন থাক। আমার কাজের মেয়েটি রান্নাঘরে আছে। আপনাদের চা দিয়ে সে চলে যাবে, তারপর কথা হতে পারবে।

লতা চা আর চিঁড়েভাজা নিয়ে এল। তাকে এসব বলতে হয় না। কেউ এলে সে নিজে থেকেই আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে।

বলু চায়ের কাপ হাতে নিল, চিঁড়েভাজা ছুঁল না। দেখল, শাসন অম্লান বদনে চিঁড়েভাজা সাঁটিয়ে যাচ্ছে। গাঁয়ের লোকের খিদে একটু বেশিই হয়ে থাকে।

চা খাওয়া হলে কাপ-টাপ সরিয়ে নিয়ে গেল লতা। তারপর 'আসছি' বলে শাসনের দিকে একটা বিরূপ কটাক্ষ হেনে চলে গেল।

শাসন হঠাৎ বলল, ঠাকুর মহাশয়, আপনার পরিচারিকাটি আমাকে বিশেষ পছন্দ করে না।

নির্বাণানন্দ একটু হাসল। বলল, ওর সন্দেহ আপনি মারণ উচাটন জানেন।

আহা, যদি জানিতাম! মারণ উচাটন জানিলে কতক আয় পয় হইত।

বলু ধৈর্য হারাচ্ছিল। বলল, এবার বলুন।

নির্বাণানন্দ চোখ দুটো একটু বুজে থেকে ধীর স্বরে বলল, ডিটেলসে যাবো না। পাটনা থেকে কাঠমান্ডুর ফ্লাইট ছিল সেটা। প্লেজার ট্রিপ। আপনার কাছে লুকোবো না, সঙ্গে একজন বান্ধবীও ছিল। পাটনা ছাড়ার দশ মিনিট বাদেই ক্র্যাশ হয়। ক্র্যাশ হওয়ার আগে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল কেবিনের মধ্যে। আমি বসেছিলাম ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং দরজার পাশেই। সেটা খুলতে চেষ্টা করেও পারিনি। কিন্তু প্লেনটা যখন মাটিতে আছড়ে পড়ল তার এক সেকেন্ড আগে দরজাটা খুলে যায়।

কীভাবে?

বলতে পারব না। হয়তো প্লেনটা ভয়ঙ্কর কাঁপছিল বলে সেই কাঁপুনি বা দুলুনির জন্যই হবে। আমি দরজাটা খোলা মাত্র নীচে ঝাঁপ দিয়েছিলাম। ততক্ষণে অবশ্য আগুনের হলকায় গা একটু ঝলসে গিয়েছিল, জামাকাপড়েও লেগে গিয়েছিল খানিকটা। ঝাঁপ খেলে যে বেঁচে যাবো এমন কথা ছিল না। বাঁচার কথাও নয়, কারণ আমি পড়েছিলাম অন্তত আট-দশতলার হাইট থেকে। পড়লাম প্রথমে একটা গাছের ডালপালায় এবং তারপর একটা পুকুরের জলে। প্লেনটা পড়তে পড়তে আরও অনেকটা গিয়ে একটা খেতের মধ্যে পড়েছিল। জলে পড়ায় বেঁচে যাই। জায়গাটা খুব নির্জন আর ধারে-কাছে তেমন লোকজন ছিল না। জল থেকে উঠে হতভম্ব ভাবটা কাটাতে অনেকটা সময় লেগেছিল। সে বিবরণ আর দেবো না। আমি যে বেঁচে আছি এ খবরটা আর কাউকে জানাতে ইচ্ছে হল না।

কেন?

নির্বাণানন্দ একটু হাসল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না। ডিভোর্সের কথা দুজনেই ভাবছিলাম। তাছাড়া বাজারে কিছু ধারদেনা ছিল। ফিল্মে আমি সাইড রোলেই অভিনয় করে আসছি বরাবর। দুটো ছবিতে হিরো হয়েছিলাম বটে, তা চলেনি। উঞ্ছবৃত্তি আর ভাল লাগছিল না। তাই ভাবলাম, আর পুরোনো জীবনে না-ফেরাই ভাল। একটা পেট চলে যাবে। আর একটা পাটোয়ারি বুদ্ধিও কাজ করছিল। জানতাম প্লেন অ্যাকসিডেন্টে মারা গেলে পরিবার মোটা কমপেনসেশন পায়। আমার দুটো মেয়ে বড় হচ্ছে। তাদের পড়াশুনো, বিয়ে ইত্যাদির মোটা খরচ আছে। তাই ভেবেছিলাম প্লেন অ্যাকসিডেন্টে পোড়া এবং তালগোল পাকানো মানুষের ভিতর আমাকে তো আর আলাদা করে খোঁজা হবে না। ওরে ধরে নেবে আমি মরেছি। তাই ফিরলাম না। পুকুরের কাছে একটা মন্দির ছিল। পূজারি ব্রাহ্মণের কাছে দু-দিন বিশ্রাম নিয়ে প্লেন অ্যাকসিডেন্টের স্থানীয় বিবরণ সব সংগ্রহ করলাম। পকেটে কিছু টাকা ছিল। তাই প্রথমে খুব একটা অসুবিধে হয়নি। ঘুরতে ঘুরতে এই গাঁয়ে এসে থানা গেড়েছি।

বলু একটা বড় শ্বাস ফেলে বলল, এ যে রোমাঞ্চকর গল্প। অবিশ্বাস্য।

হ্যাঁ। সত্যিকারের কোনও কোনও ঘটনা কল্পনাকেও ছাপিয়ে যায় বলুবাবু।

এখানে আপনার কী করে চলে?

সাধু হইনি বটে, কিন্তু সাধুর ভেক ধরলে এ দেশে এখনও বেশ চলে যায়। আমি অবশ্য নিজেকে কখনও সাধু বলে প্রচার করিনি, লোকে ধরে নিয়েছে।

এ বাড়ি কি আপনার?

না না। একজন থাকতে দিয়েছে। ওই শিবমন্দিরটি তার। আমি পুজো করি।

বলু অর্থাৎ বলেন্দ্র এবার একটু হাসল, আপনার যে ফার্স্ট লাইফ ছিল তার কথা আমার কিছু জানা আছে।

সবাই জানে। মদ, মেয়েমানুষের দোষ তো? বেশ ভাল রকমই ছিল। তবে এখন কে জানে কেন, ও জীবনটাই আর টানে না।

মদ ছেড়েছেন?

ছাড়িনি, ছেড়ে গেছে।

বিয়েও তো করতে পারতেন?

কেন? কোনও দরকার হয় না। একাই ভাল। অতি ভাল।

আমাকে কি বিশেষ কিছু বলবেন?

হ্যাঁ, এই শাসনবাবুর সঙ্গে কিছুকাল আগে আলাপ হয়েছে, বুদ্ধিমান লোক। উনি আমার অতীত সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। একদিন আমি ওঁকে ঘটনাটা বলি। এখন আর বললেও ক্ষতি নেই। আমার বউ কবেই কমপেনসেশনের টাকা পেয়ে গেছে। তবু কী দরকার লোককে বলে? তা এই শাসনবাবু যখন শুনলেন যে আমি ফিল্মে অভিনয় করতাম তখনই উনি আমাকে আপনার কথা বলেন। বলামাত্রই যে চিনেছিলাম এমন নয়, তবে বিবরণ শুনে অনেক ভেবে ভেবে আবছা মনে পড়েছিল। শাসনবাবুর কাছে যখন শুনলাম আপনি এখানে আসছেন তখন মনে হল আপনি ইচ্ছে করলে আমার একটা কাজ করে দিতে পারেন।

কী কাজ?

আমি আমার পরিবারের কোনও খবর জানি না এবং জানার আগ্রহও নেই। এই জীবনটা তাদের কাছে মৃত হয়েই থেকে যাবো। কিন্তু আমার মেয়ে দুটোর কথা আমার খুব মনে হয়। মায়ার বন্ধন তো। ওরা আমাকে বড় ভালবাসত। কিন্তু তা বলে ভাববেন না যে আমি তাদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চাই। ওসব নয়। আমার বড় মেয়ের একটা জিনিস আমার কাছে ছিল। একটা নেকলেস। ওর বড়লোক মেজোমামা ওর জন্মদিনে দিয়েছিল। আমি সেই নেকলেসটা সরিয়ে ফেলেছিলাম আমার সেই বান্ধবীটিকে দেবো বলে। নেকলেসটা আমার হ্যান্ডব্যাগে ছিল, সেটা আজও আমার কাছে আছে। সেটার জন্য বড্ড অপরাধবোধে ভুগি। আমার খুব ইচ্ছে হয় নেকলেসটা তার কাছে ফেরত পাঠাই। কিন্তু কীভাবে সেটা সম্ভব তা এতদিন ভেবে উঠতে পারিনি। মনে হল, এ কাজটা আপনাকে দিয়ে হতে পারে।

শুধু নেকলেসটা পৌঁছে দিলেই যদি হয় তো সেটা অনায়াসে পারব। কিন্তু আপনার মেয়ে প্রশ্ন তুলবে হয়তো, তখন কী বলব?

সেই কারণেই কাজটা শক্ত। নেকলেসটা যে আমিই চুরি করেছি এটা সে জানে না। ফেরত দেওয়ার সময়ে যদি কথাটা ফাঁস হয়ে যায় তাহলে বাপের ওপর তার শ্রদ্ধা থাকবে না। তার চেয়েও বড় কথা সে হয়তো সূত্র খুঁজতে থাকবে। আপনি কিছু করতে পারেন না?

আপনার নিজের অস্তিত্ব তাদের জানালে ক্ষতি কী? পাঁচ বছর পর আর কোনও গণ্ডগোল হওয়ার কথা নয়।

না বলুবাবু, না। সম্পর্কটা আমি আর নতুন করে স্থাপন করতে চাই না। ও পাট চুকে যাওয়াই ভাল। সংসার এক নরক। কোনটা বাঁচল, কোনটা মরল এই নিয়েও উদ্বেগ থাকে। কোনটা মানুষ হল, কোনটা হনুমান সেসব নিয়েও মাথাব্যাথার অন্ত থাকে না। এখানে আমার নিরুদ্বেগ জীবন। বড় ভাল আছি।

তা তো বুঝলাম। কিন্তু নেকলেস পৌঁছোনোর কী করব বলুন!

কোনও কৌশল করা যায় না?

চট করে মাথায় কিছু আসছে না। তবে যদি বলেন তো জানলা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে আসতে পারি, যদি সেই সুযোগ থাকে।

নির্বাণানন্দ মাথা নাড়ল, সে সুযোগ নেই। আমার পৈতৃক বাড়ি তিনতলা। তারা তিনতলায় থাকে।

।। তিন।।

গল্পটা একটু নড়বড়ে। কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে বলুন তো?

মহাশয় কি নির্বাণানন্দের কথা কহিতেছেন?

হ্যাঁ।

আজ্ঞা গল্পটির ভিতরে কিছু অসঙ্গতি আছে বলিয়া আমারও মনে হয়। তবে তাহা ধরিতে পারিতেছি না। আপনি পারিলেন কি?

বলু মাথা নাড়ে, না শাসনবাবু, ভাববার সময় পাইনি। আপনি নির্বাণানন্দকে কি বিশেষ পছন্দ করেন?

শাসন হাসল, কোনও মনুষ্যই সর্বাংশে ভাল হইতে পারে না। নির্বাণানন্দেরও ত্রুটি থাকিতেই পারে। তবে লক্ষ করিয়াছি তাঁহার বিশেষ লোভ বা লালসা নাই। জীবনে কোনও গভীর আঘাত পাইলে মনুষ্য বিমূঢ় এবং নির্বিকার হইয়া যায়। নির্বাণ ঠাকুরের সম্ভবত সেই অবস্থা।

আঘাত পেয়েছেন কী করে বুঝলেন?

সুস্পষ্ট বুঝি নাই। অনুমান করি।

লোকটা কি মিথ্যেবাদী হতে পারে?

তাহাও হইতে পারে। তবে লক্ষ করিয়াছি উনি নিজেকে কদাচ সাধু-মহাত্মা বলিয়া প্রচার করেন না। বরং বলেন তিনি সাধুর ভেক ধরিয়াছেন মাত্র।

ভেক মানে কি ভড়ং?

আজ্ঞে হাঁ।

লোকে কি ওঁকে মানে?

আজ্ঞা মহাশয়, এই গ্রামের লোকেদের মধ্যে নির্বাণানন্দের নামে অনেক কিংবদন্তি প্রচলিত আছে।

বলু চিন্তিত হয়ে বলল, কানু দত্তের অতীত ইতিহাস ভাল নয়। ফিল্মের লোকেদের দুর্নাম থাকেই। কানু দত্তেরও ছিল। লোকটা টাকা ওড়াত, সংসার থাকত অভাবে।

উনি কিছুই গোপন করেন না, সম্ভবত সেইখানেই নির্বাণ ঠাকুরের জোর।

হ্যাঁ, তাও দেখলাম। আমার কাছেও অকপটে নিজের দোষের কথা বলে গেল, একবার চোখের পাতাটি পর্যন্ত কাঁপল না।

নির্বাণ ঠাকুরকে আপনার বিশেষ পছন্দ হয় নাই, বুঝিতেছি।

না না, অপছন্দেরও কিছু নেই। তবে আমার মতো আধচেনা একজন লোককে এরকম একটা দামি নেকলেস দিয়ে পাঠানোটাও একটু অদ্ভুত। ইচ্ছে করলে তো উনি আপনাকে দিয়েও পাঠাতে পারতেন।

মহাশয়, আমাকে বিশ্বাস কী? আমার সহিত তাহার পরিচয়ও অধুনাই ঘটিয়াছে। ওইরূপ মূল্যবান একটি কণ্ঠহার উনি আমার হাত দিয়া পাঠাইবেন কেন?

আমাকেই বা বিশ্বাস কী?

ঠিক কথা, আপনাকেও বিশ্বাস করিবার কারণ নাই। কিন্তু আপনি সম্পন্ন কায়স্থ বংশের সন্তান। সদ্বংশজাত নির্বাণ ঠাকুর সদ্বংশের রক্তধারায় আস্থাবান। তিনি মনে করেন সদ্বংশজাত কেহ বিশ্বাসঘাতকতা করিবে না।

দূর মশাই, কত ভাল হেরেডিটির ছেলে চুরি করে ফাঁক করে দিচ্ছে।

শাসন মাথা নেড়ে বলল, না মহাশয়, কথাটা ঠিক হইল না।

কেন?

সদ্বংশে যখন বিবাহাদির বৈলক্ষণ ঘটে তখনই অপজাতকের আবির্ভাব হয়। নচেৎ প্রকৃত সদ্বংশজাত কেহ সহজে চুরি করে না, সহজে মিথ্যা কথা কহে না, সহজে হিংস্র হয় না। আমিও ওই তত্ত্বে বিশ্বাসী।

মানতে পারছি না।

মহাশয়, মূল্যবান কণ্ঠহারটি তো আপনার পকেটেই রহিয়াছে। বলুন তো, আপনার কি উহা আত্মসাৎ করিতে একবারও ইচ্ছা হইয়াছে?

তা কেন হবে?

উহাই সদ্বংশের লক্ষণ।

উঃ সদ্বংশ-সদ্বংশ করে মাথা ধরিয়ে দিলেন যে!

আচ্ছা, বিতর্কটি মুলতুবি রহিল। প্রশ্ন হইল, কণ্ঠহারটি ভাল করিয়া দেখিয়াছেন কি?

না তো! কাগজে মোড়া জিনিসটা নিয়েই তো প্যান্টের পকেটে ভরে রাখলাম।

সম্মুখে ওই যে মণ্ডপটি দেখিতেছেন উহা একটি পরিত্যক্ত স্থান। আসুন, ওইখানে রৌদ্রালোকে ভাল করিয়া জিনিসটি নিরীক্ষণ করুন।

কেন মশাই? দেখার কী আছে! অন্যের জিনিস অত দেখব কেন?

মহাশয়, আপনার কৌতূহল বলিয়া কোনও বস্তু নাই কেন? এমনও তো হইতে পারে যে, ওই গহনাটির মধ্যেও মনুষ্যচরিত্রের কোনও সংকেত লুক্কায়িত আছে!

ঠিক আছে, আপনার বাড়িতে গিয়ে দেখব।

না মহাশয়, তাহা হইবে না। সন্ধ্যার সম্মুখে আপনি কদাচ ইহা প্রদর্শন করিবেন না।

কেন বলুন তো!

নারীজাতি স্বভাবতই গহনাপ্রিয়। এই মহার্ঘ কণ্ঠহারটি দেখিলে সন্ধ্যা যদি প্রলুব্ধ হয়? প্রলুব্ধ হইলে আর নীতিজ্ঞান থাকিবে না।

আপনি কি আপনার স্ত্রীকে বিশ্বাস করেন না?

মহাশয়, আমি কাহাকেও ষোলো আনা বিশ্বাস করি না। সন্ধ্যাকে আমি কতটুকু চিনি? সে আমার স্ত্রী বটে, কিন্তু তাহাকে গভীরভাবে জানিবার অবকাশ আমার এখনও হয় নাই।

বুঝলাম।

আসুন, রৌদ্রালোকে গহনাটি অবলোকন করুন।

গাছ-গাছড়ায় আকীর্ণ জঙ্গুলে একটা ছোটো পরিসরে একটা ভাঙা মন্দিরের সামনে ভেঙে-পড়া মণ্ডপটির ধ্বংসাবশেষ।

সাপখোপের আড্ডা নেই তো!

এখন শীতকাল। সরীসৃপদের ইহা দীর্ঘ নিদ্রার কাল। ভয় নাই। আসুন।

মণ্ডপে এসে দাঁড়াল দুজন।

খবরের কাগজের ঠোঙায় গার্ডারে মোড়া গয়নাটি পকেট থেকে বের করল বলু। বেশ ভারী জিনিস। গার্ডার খুলে বের করতেই যেন সূর্যালোকের সহস্র প্রতিবিম্ব ঝলসে উঠল নেকলেসটি থেকে। ধাঁধিয়ে গেল দুজনের চোখ। গয়নার কিছুই বোঝে না বলু, তবু সেও অবাক হয়ে গেল জিনিসটার সৌন্দর্যে।

মহাশয়, ইহা অতি মূল্যবান সামগ্রী।

তাই তো মনে হচ্ছে।

অন্তত একশত হীরকখণ্ড ইহাতে সংযোজিত রহিয়াছে। মধ্যস্থলে এই যে রক্তিম প্রস্তরটি দেখিতেছেন ইহা মহার্ঘ একটি চুনি। আর তদুপরি একটি বৃহৎ পান্না রহিয়াছে।

আপনি পাথর চেনেন?

শাসন দেবশর্মার পেটে বিদ্যা নাই বটে, কিন্তু যাহা সে চিনে তাহা ভাল করিয়াই চিনে। এই কণ্ঠহারটির মূল্য কত হইবে বলিয়া আপনার অনুমান?

আমার কোনও ধারণাই নেই। গয়নাগাঁটি মেয়েদের ব্যাপার। আমি কখনও মাথাই ঘামাইনি।

আমার অনুমান ইহার মূল্য পঞ্চ লক্ষাধিক মুদ্রা।

বলেন কী? এত?

ততোধিকও হইতে পারে।

ঝুটা পাথর নয় তো!

না মহাশয়, আমার চক্ষু ভুল করিবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

তা না হয় থাকলাম। কিন্তু জিনিসটা যে এত দামি তা জেনে আমার যে ভয়-ভয় করছে।

ভয়ের চেয়েও অধিক দুশ্চিন্তা। মহাশয়, এই কণ্ঠহারটি সম্পর্কে নির্বাণ ঠাকুর যাহা বলিয়াছেন তাহা মনে আছে?

আছে। ওঁর বড়লোক শালা বা সম্বন্ধী তার ভাগ্নীকে উপহার দিয়েছিল।
ওইখানেই ফাঁক।
তার মানে?
মাতুল তাহার ভাগ্নীকে উপহার দিতেই পারে। কিন্তু কদাচ কয়েক লক্ষ মুদ্রা মূল্যের এই অনির্বচনীয় কণ্ঠহারটি দেওয়ার কথা নহে।
তাই তো! ঠিকই বলেছেন।
আরও প্রশ্ন, এই মূল্যবান কণ্ঠহারটি তিনি আপনার মতো একজন অর্ধ-পরিচিত ব্যক্তির হাত দিয়া কন্যার নিকট পাঠাইবেন কেন?
এই যে আপনি সদ্বংশের কথা বলছিলেন।
হাঁ মহাশয়, কহিয়াছি। আপনি যে সদ্বংশজাত এবং কদাচ অসাধুতা করিবেন না তাহা আমি জানিলেও নির্বাণ ঠাকুরের ততটা জানিবার কথা নহে। ভাবিতেছি, তিনি এ আবার কোন লীলা করিতেছেন।
ভয় পাইয়ে দিচ্ছেন যে মশাই! তার চেয়ে চলুন, জিনিসটা ওঁকে ফেরত দিয়ে আসি।
না মহাশয়, তাহা করিবেন না। বরং তাঁহার নির্দেশ মানিয়াই কর্তব্যকর্ম আপনি সম্পাদন করুন।
কেন?
নহিলে রহস্য ভেদ হইবে কীরূপে?
রহস্যটা কীসের? ওঁর মেয়ের গয়না একটু কৌশল করে ফেরৎ দিতে হবে, এই তো! রহস্য আবার কী?
থাকিতে পারে, নাও থাকিতে পারে। গহনাটি এবার মুড়িয়া পকেটস্থ করুন। আর প্রকাশ্য রাখা ঠিক হইবে না। বায়সেরও চক্ষু আছে।
বলু নেকলেসটা ফের ঠোঙায় মুড়ে গার্ডার লাগিয়ে পকেটে পুরতে পুরতে বলল, বায়স মানে কি বক?
না মহাশয়, বায়স শব্দের অর্থ কাক।
আপনার কাছে কিছুদিন থাকলে আমার শব্দভাণ্ডারের অনেক উন্নতি হত।
বিনয়ের সঙ্গে শাসন বলল, আমি বংশের কুলাঙ্গার, কিছুই শিক্ষা করিতে পারি নাই।
বলু একটু হাসল।
আবার পথে নেমে হাঁটতে হাঁটতে শাসন বলল, মহাশয়, নির্বাণ ঠাকুরের গৃহে লতা নাম্নী পরিচারিকাটিকে লক্ষ করিয়াছেন কি?
কেন বলুন তো?
লক্ষ করেন নাই?
যাকে লক্ষ করা বলে তা করিনি। দেখেছি মাত্র।
আপনি একজন চলচ্চিত্রগ্রহীতা, আপনার চক্ষু সর্ববিধ বস্তু লক্ষ করিবে ইহাই তো স্বাভাবিক।
তা বটে। তবে আমার বেশি মনোযোগ ছিল কানু দত্তের ওপর। লোকটা আমাকে এমন অবাক করেছে যে অন্য দিকে মন দিতে পারিনি। মেয়েটি কি ওঁর—মানে—গার্লফ্রেন্ড?
শাসন হেসে ফেলল। বলল, মহাশয়, হাসাইলেন। যাহা হউক, যে ইঙ্গিত করিতেছেন তাহা এখনও প্রকট নহে।
তাহলে কী ব্যাপার?
এই গ্রামদেশে বান্ধবী প্রথার প্রচলন নাই। তবে ব্যভিচার সর্বত্র আছে।
এদের মধ্যে কি সেকসুয়াল সম্পর্ক আছে বলছেন?
জিভ কেটে শাসন বলল, ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন, আমি তাহা বলি নাই। নির্বাণ ঠাকুর আর যাই হউন ব্যভিচারী বা কামুক নহেন।
কিন্তু একসময়ে সেই অখ্যাতি তাঁর খুবই ছিল।

অতীত লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি করিয়া কী হইবে! নির্বাণ ঠাকুর এখন আর কানু দত্ত নহেন।

আপনি লোকটার ভক্ত হয়ে পড়েছেন দেখছি।

কতকাংশে আমি তাঁহাকে পছন্দই করি।

মেয়েটি সম্পর্কে কী বলবেন?

লতার বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বৎসরের কাছাকাছি হইবে। কৃষ্ণাঙ্গী হইলেও অতীব সুন্দরী—যাহাকে আপনারা ফটোজেনিক বলেন তাহাই। কিন্তু অদ্যাপি তাহার বিবাহ হয় নাই। পল্লি অঞ্চলে এত বয়সে কেহ অনূঢ়া থাকে না।

বিয়ে করেনি কেন?

পঞ্চ বৎসর হইল সে নির্বাণ ঠাকুরের সেবা করিতেছে, সেবা অর্থে সেবাই, তাহাতে ব্যভিচারের নামগন্ধ নাই।

কী করে বুঝলেন? গোপনে গোপনে কিছু হয় কিনা কে জানে?

মহাশয়, নির্বাণ ঠাকুর কঠিন ধাতুতে গঠিত। যখন লতা তাহার পরিচারিকা নিযুক্ত হয় তখনই তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিদের ডাকিয়া প্রকাশ্যে কহিয়াছিলেন, আমি একক পুরুষ, এই যুবতীটি আমার গৃহকর্মে নিযুক্ত হইতেছে। আমি জানি এরূপ ক্ষেত্রে নানা কথা উঠিবে, কলঙ্ক লেপনের চেষ্টা চলিবে। তাই আমি কহি, আপনারা আমার ও এই যুবতীটির প্রতি লক্ষ রাখিবেন। কোনও বেচাল দেখিলে তৎক্ষণাৎ আমাকে কহিবেন। যদি কিছু ঘটে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত যাহা হয় করিব। আরও আপনাদের জ্ঞাত করিতেছি যে, পূর্বাশ্রমে আমি চরিত্রবান ছিলাম না। আমার জীবনে পদস্খলন বহু ঘটিয়াছে। কিন্তু এখন আর আমি ভোগাসক্ত নহি। তবু আপনারা লক্ষ রাখিবেন। দোষ কিছু ঘটিলে তাহা অঙ্কুরেই বিনাশ করা ভাল।

লোকটা ধূর্ত।

আজ্ঞা হাঁ মহাশয়, অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। তবে এই স্বীকারোক্তি করিতে বুকের পাটাও চাই। নির্বাণ ঠাকুর অদ্যাবধি লতার সহিত কোনও বেচাল করেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়া সম্পর্কটা নিস্পৃহ নহে।

তার মানে?

দেহের সম্পর্ক না ঘটিলেও, আমার অনুমান, লতা নির্বাণ ঠাকুরের প্রতি হদ্দমুদ্দ আসক্ত।

তার মানে?

লতা নির্বাণ ঠাকুরের প্রতি যে আসক্ত তাহা সে হয়তো নিজেও জ্ঞাত নহে।

সেটা কী করে সম্ভব? প্রেমে পড়েছে, অথচ টের পাচ্ছে না, এটা হয় নাকি?

হয় মহাশয়। প্রণয় এক অদ্ভুত ঘটনা। তাহার কতক মনের উপরিভাগে দৃশ্যমান, কতক আবার অবচেতনে ডুব দিয়া চোরা পাহাড়ের মতো বিরাজ করে। প্রণয়াসক্তরা উহাকে ভিন্ন প্রকার আবেগ বলিয়া ভ্রমে পতিত হইতে থাকে।

আর নির্বাণ ঠাকুর? তাঁর আসক্তি নেই?

তাঁহাকে বুঝা কঠিন। মনে হয় লতার প্রতি তাঁহার স্নেহ আছে, প্রণয় নাই।

তাহলে সম্পর্কটা কী দাঁড়াল?

কিছুই স্পষ্ট নহে। শুনিতেছি লতা নির্বাণ ঠাকুরের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিতে চাহে, নির্বাণ ঠাকুর তাহাকে নিরস্ত করিয়া চলিয়াছেন। এই মন্ত্র গ্রহণের ইচ্ছার মধ্যেও ওই প্রণয় রহিয়াছে, তবে বকলমে। নির্বাণ ঠাকুর তাহা বুঝিয়াছেন বলিয়াই বাড়াবাড়ি করিতে নারাজ।

মন্ত্র দিলে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হবে?

মন্ত্র দিবেন কী? তিনি যে নিজেকে সিদ্ধ বা সাধক বলিয়াও মনে করেন না।

এ তো আচ্ছা ব্যাপার।

হাঁ মহাশয়! ব্যাপারটি জটিল।

তাহলে দাঁড়াল কী?
এখনও কিছু স্থির বুঝা যায় না। তবে পরিণতির জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।
আপনার এ বিষয়ে কী মত?
কোন বিষয়ে মহাশয়?
কানু দত্ত আর লতার কি বিয়ে হওয়া উচিত?
আমি তো কোনও বাধা দেখি না।
কানু দত্তর বউ বেঁচে আছে, আইনত ডির্ভোস হয়নি।
তাহাতে কী? কানু দত্ত আর নির্বাণ ঠাকুর ভিন্ন ব্যক্তি। আর আইনের কথা আইনের পুস্তকে থাকুক, জীবন তো আর আইন বহিয়া চলে না।
আপনি ডেনজারাস লোক।
সকলেই তাহা বলে। মহাশয়, গহনাটি আপনার স্যুটকেসে গোপনে রাখিবেন এবং চাবি দিবেন।
সে তো বুঝলাম। কিন্তু কানু দত্ত তো দিব্যি ওই ভাঙা ঘরে এরকম দামি জিনিস নিয়ে কাটিয়ে দিলেন। কিছু তো হয়নি।
তাহার কারণ নির্বাণ ঠাকুরের মতো অকিঞ্চনের কাছে এত মূল্যবান কিছু থাকিবে ইহা অনুমানের অতীত।
বলু চুপ করে রইল।
অনেকক্ষণ বাদে শাসন বলল, কিছু ভাবিলেন?
কী ভাবব?
কোন উপায়ে কণ্ঠহারটি রাধাশ্রীকে দিবেন?
রাধাশ্রী কে?
নির্বাণ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠা কন্যা।
তার নাম কি রাধাশ্রী নাকি?
হ্যাঁ মহাশয়। নামটি আপনাকে বলিতে বোধকরি নির্বাণ ঠাকুর বিস্মৃত হইয়াছেন।
তা হবে। কিন্তু আমি ভাবছি, এ কাজের দায়িত্ব যখন নিয়েছি তখন তাড়াতাড়িই কলকাতা ফিরে যাওয়া ভাল।
হ্যাঁ মহাশয়।
আমি আজই রওনা হতে চাই।
না মহাশয়, আজ বৃহস্পতিবার, যাত্রা করিবার পক্ষে প্রশস্ত দিন নহে। কল্য যাইবেন।
বলু খুব আনমনা রইল। ফিরে এসে দেখল, সন্ধ্যা রান্নাঘরে। সে ঘরে গিয়ে স্যুটকেস খুলে নেকলেসটি সাবধানে রাখল। কম্বিনেশন লক আটকাল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, যা ঘটছে তা স্বাভাবিক ঘটনা নয়। সে কোনও জালে জড়িয়ে পড়ছে না তো! এটা কি সম্ভব যে, নেকলেসটি আসলে চোরাই মাল! বা অন্য কিছু? কানু দত্তর বাড়িতে আবার কোনও ফাঁদ নেই তো!
সে ঠিক করল, কলকাতায় ফিরেই সে কানু দত্তর বাড়িতে যাবে না প্রথমে। তার আগে ফাইলপত্র ঘেঁটে কানু দত্ত সম্পর্কে যথাসম্ভব খবর সংগ্রহ করবে। তৈরি থাকা ভাল।
সে স্নান-খাওয়া করতে উঠল।

।। চার ।।

খবরটা ভুল। কানু দত্তের পরিবার আর তার পৈতৃক বাড়িতে থাকে না। নিজেদের অংশ এক দেওরকে বিক্রি করে দিয়ে কানু দত্তের স্ত্রী রাণু দত্ত আনোয়ার শা রোডের কাছে লেক গার্ডেনসে একটা ফ্ল্যাট

কিনেছেন। ওই পাড়াতেই তাঁর একটা বুটিকের দোকানও আছে। এক্সক্লুসিভ শাড়ি, পটারি এবং ওইসব বিক্রি করেন। সবচেয়ে বড় কথা, কানু দত্ত জানে না, রাণু দত্ত আবার বিয়ে করেছেন। তাঁর স্বামী একজন ঝানু প্রোমোটার। রাণু দত্তের ফ্ল্যাটটা তাঁর স্বামী নবীন ঘোষেরই অবদান। আরও খবর হল, রাণু দত্ত বিবাহিত জীবনেই নবীন ঘোষের প্রেমে পড়েন এবং একটু নটঘট তাঁদের মধ্যে তখন থেকেই ছিল। কানু দত্তের মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁদের বিয়ে হয়ে যায়। মায়ের এই বিয়ে নিয়ে বড় মেয়ে রাধাশ্রীর সঙ্গে রাণু দত্তের তুমুল ঝগড়াঝাঁটি এবং অশান্তি হয়। ফলে রাধাশ্রী মাকে ছেড়ে তার এক পিসি ও পিসেমশাইয়ের আশ্রয়ে চলে যায়। ছোটো মেয়ে বনশ্রী রাণু দত্তের সঙ্গে থাকলেও রাধাশ্রী তার মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না।

এই সব খবর জোগাড় করা বলুর পক্ষে সহজ হয়নি। ফিল্মি লাইনের বিভিন্ন জনের কাছ থেকে টুকরো টুকরো খবর পেয়ে জুড়ে নিতে হল। একজন সহকারী চিত্রপরিচালক সলিল দাশগুপ্ত অন্তরঙ্গ খবরগুলো দিতে পারল। কারণ সলিল দাশগুপ্ত এক সময়ে কানু দত্তর বাড়িতে একতলায় ভাড়া থাকত।

রাধাশ্রীর ডাকনাম মানা। সে থাকে তার গরিব পিসির কাছে। পিসেমশাই স্কুল মাস্টার। এই দম্পতিটি নিঃসন্তান বলে রাধাশ্রীকে খুব আগ্রহের সঙ্গেই আশ্রয় দিয়েছে। রাধাশ্রী অথবা মানার বয়স উনিশ-কুড়ি। সে খুব সাধারণ মেয়ে নয়। কলেজের পড়াশুনোর পাশাপাশি সে নানা সমাজহিতৈষী কাজের সঙ্গে যুক্ত। সে পাড়ার গরিব ছেলেমেয়েদের পড়ায়, মেয়েদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সমিতির হয়ে কাজ করে এবং একটু বাম রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত। শোনা যায়, সে খুব তেজি মেয়ে।

এহেন রাধাশ্রীর কাছাকাছি যাওয়ার উপায় এমনিতে সহজ। যে কোনও সামাজিক সমস্যা বা সমিতির সূত্র ধরে যাওয়া যায়। কিন্তু বলু নিজেই একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ। কার্যকালে সে তেমন স্মার্ট বা বলিয়ে-কইয়ে নয়। এবং এখনও সে ভেবে পায়নি নেকলেসটির কথা কীভাবে উত্থাপন করা যাবে।

কিন্তু সবার আগে প্রয়োজন রাধাশ্রীর সঙ্গে আলাপ করা।

বলুর বাড়িঘর বলতে কিছু নেই। বিয়ের পর যে বাসা করেছিল তার ভাড়া বেশ বেশি। অত বড় বাসার দরকার আর নেই বলে সে সেলিমপুরে একটা দোতলার ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। রান্নাবান্নার পাট নেই বললেই হয়। বেশির ভাগ বাইরেই খেয়ে নেয়। ছুটিছাটায় মা-বাবার কাছে শ্যামবাজারে যায়। সেখানে তার দাদার ফ্ল্যাট। দাদা মস্ত ইনজিনিয়ার। সব সংসারেই অশান্তি থাকে, দাদার সংসারেও মা-বাবাকে নিয়ে আছে। তবে দাদা-বউদি দুজনেই চাকরি করে বলে বেবি সিটার হিসেবে মা-বাবার কিছু উপযোগ আছে। তাই অবনিবনা সত্ত্বেও দাদার সংসারে মা-বাবার স্থান মোটামুটি পাকা হয়ে গেছে। আশা, ভবিষ্যতে অবনিবনা হয়তো থাকবে না। বলুকে মা একটু পছন্দ করে বটে, কিন্তু বাবা নয়। দাদা ও বউদি আরও নয়। কারণ বলু সিনেমা করে, মদ খায়, অমতে একটা ধেড়ে মেয়ে বিয়ে করেছে এবং ডিভোর্সও। কে তাকে পছন্দ করবে?

বলু তাই সংসার-বিযুক্ত এবং লক্ষ্মীছাড়া। তার আয় অনিশ্চিত এবং মানুষ হিসেবেও সে উচ্চমানের বলে কেউ মনে করে না। তবে সে যে সৎ ছেলে এবং পরোপকারী এটা সকলে মানে। সে মিথ্যে কথা বলে না এবং দুশ্চরিত্র নয়। তবু তার প্লাস পয়েন্ট মাইনাসের তুলনায় অনেক কম।

দোতলার ঘরটি বেশ বড় এবং লাগোয়া বাথরুম আছে। রান্নাঘর না থাকলেও ব্যালকনির একটা দিক দেয়াল দিয়ে ঘেরা থাকায় রান্না করা যায়। বলু মাঝে মাঝে তা করেও।

এই ঘরে গভীর রাতে শুয়ে সে চিন্তা করছিল, স্যুটকেসের মধ্যে মহার্ঘ নেকলেসটি কী করে প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। কৌশল দরকার, নইলে প্রশ্ন উঠবে। কৌশলটাই তার মাথায় আসছিল না।

রাত দেড়টায় উঠে বলু খাতা-কলম নিয়ে প্ল্যান করতে বসল।

পরদিন বেলা এগারোটায় সে একটা ভিডিও ক্যামেরা এবং দুজন সহকারীকে নিয়ে হাজির হল নান্দনিক নামে লেক গার্ডেনসে রাণু দত্তের বুটিকের দোকানে। মিথ্যে কথা সে ভাল বলতে পারে না। কিন্তু অগত্যা না বলেও উপায় নেই।

রাণু দত্তের বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। ফিগারখানা এখনও বেশ ভাল। দীর্ঘাঙ্গী, ছিপছিপে, ফর্সা। মুখশ্রী ভাল হলে সুন্দরীই বলা যেত। কিন্তু লাবণ্যের অভাব পূরণ করতে যথেষ্ট রূপটান ব্যবহার করেছেন। দোকানটা যে খুব ছোটো তা নয়। শো-কেসে যথেষ্ট ভাল ডিজাইনের কয়েকটা দামি শাড়ি এবং ঝুটো গয়না, মাটির পুতুল, ঝিনুক ইত্যাদির তৈরি অপ্রয়োজনীয় ঘর-সাজানোর জিনিস প্রদর্শিত রয়েছে।

বলু বলল, নমস্কার, আমরা স্বাধীন বৃত্তির মেয়েদের নিয়ে একটা ডকুমেন্টারি করছি। যদি অনুমতি দেন আপনার একটা ইন্টারভিউ—

রাণু দত্তের মতো মহিলাদের কাছে এর চেয়ে বড় টোপ আর কী হতে পারে? খুব খুশি হয়ে হেসে-টেসে বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। টিভির জন্য তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ। শুনেছি, আপনি বেশ স্ট্রাগল করে দোকানটা দাঁড় করিয়েছেন। আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও যদি কিছু বলেন;

রাণু দত্ত মুখিয়েই ছিলেন। নিজের জীবনের ঘটনাবলি তাঁর লুকোনোর জিনিস নয়। নিজের দুই বিয়ে এবং দু-রকম দাম্পত্যজীবন ও তৎসহ দোকান প্রতিষ্ঠার কাহিনি তিনি সবিস্তারেই বললেন। দুই মেয়ের কথাও।

বলু বলল, কিন্তু আপনার মেয়েরা কোথায়? তাদেরও ডাকুন, ফ্যামিলি সহ ব্যাপারটা অনেক কমপ্লিট হবে।

ছোটো মেয়ে বনশ্রীকে ডাকছি, কিন্তু বড় মেয়ে রাধাশ্রী আমার কাছে থাকে না। সে থাকে তার পিসির কাছে।

কেন থাকে না?

পিসির সন্তান নেই, ওকে সন্তানের মতো দেখে।

বনশ্রীকে দোকানের একজন মেয়ে কর্মচারী গিয়ে ডেকে আনল। বেশ সুন্দর ঢলঢলে চেহারা বনশ্রীর। একটু অহঙ্কারী ভাব আছে মুখশ্রীতে। বেশ স্মার্টও। বলু তাকেই টার্গেট করল। কে জানে এ হয়তো তাকে রাধাশ্রীর কাছে নিয়ে যেতে পারে। বোনে বোনে হয়তো ভাব আছে।

বলুর অনুমান মিথ্যে হল না। দু-দিন রাণু দত্ত আর বনশ্রীর ইন্টারভিউ রেকর্ড করার পর তার সঙ্গে এদের একটু ভাবও হয়ে গেল। এবং বলু ভাবতে লাগল, ক্যামেরাবন্দি এই ইন্টারভিউয়ের সঙ্গে আরও কয়েকজন এরকম স্বনিযুক্ত মহিলার ইন্টারভিউ নিয়ে স্পনসরের মাধ্যমে টিভিতে একটা সত্যিকারের প্রোগ্রাম করানোও হয়তো সম্ভব। কিন্তু সেটা পরে। আগে রাধাশ্রী। এবং নেকলেস হস্তান্তর।

দ্বিতীয় দিন বনশ্রীকে কথায় কথায় তার দিদির প্রসঙ্গে নিয়ে যেতে পারল বলু। রাণু এবং বনশ্রী দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে রাধাশ্রীর গুণাবলির কথা বলতে লাগল। সে যে একজন ভাল ছাত্রী, সমাজকর্মী এবং তেজি মহিলা সেটাই উৎসাহের সঙ্গে বলছিল তারা।

বলু সুযোগটা ছাড়ল না। বলল, তাহলে ওঁর একটা ইন্টারভিউ তো নিতেই হয়। আপনারা যদি একটু হেলপ করেন।

রাণু আর বনশ্রী পরস্পরের দিকে একটু তাকাতাকি করে নিল। তারপর বনশ্রী বলল, আমি চেষ্টা করতে পারি। তবে দিদি একটু মুডি। প্রচার-টচার তেমন পছন্দ করে না।

চেষ্টা তো করা যাক।

সেই চেষ্টারই ফলশ্রুতিতে পরদিন রবিবার সকাল নটায় ক্যামেরা ঘাড়ে বলু কুঁদঘাটে একটা টালির চালওলা পাকা কিন্তু জীর্ণ বাড়িতে হাজির হল। দারিদ্র্যের চিহ্ন বেশ প্রকট। তবে হ্যাঁ, তার মধ্যেও বেশ লক্ষ্মীশ্রী আছে বাড়িটায়। দুখানা ঘরের একটায় রাধাশ্রী থাকে, অন্যটায় তার পিসি ও পিসেমশাই।

রাধাশ্রীর চেহারায় বনশ্রীর মতো চটক নেই। নাতিদীর্ঘ ছিপছিপে শ্যামলা চেহারা, দুখানি চোখ ভারী মায়াময়। আর চুল আছে বটে মেয়েটার। সকালের দিকটায় বোধহয় চান করেছে, চুলে চিরুনি চালাতে

চালাতে যখন দরজা খুলল, বলুর মনে হল মেয়েটার পেছনে যেন বাদলা মেঘ ঘনিয়ে আছে। না, বনশ্রীর মতো চটকদার সুন্দরী নয় রাধাশ্রী, কিন্তু তার মুখখানি খুব কমনীয় এবং ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট ছাপ।

দুই বোনে নীচু গলায় কী একটু কথা হল, বলু ভাল শুনতে পেল না। তার বুকটা কিছু ধড়ফড় করছিল ঘাবড়ে যাওয়ায়।

মানা অর্থাৎ রাধাশ্রী একটু যেন অনিচ্ছুক গলায় বলুকে বলল, আমার ছবি তুলবেন কেন বলুন তো! আমি তো কিছুই তেমন করিনি।

বলু যথেষ্ট মিনমিনে গলায় বলল, শুনেছি আপনি সোশ্যাল ওয়ার্ক করেন।

সে অনেকেই করে। আমি তেমন কিছু করিনি তো!

আমাদের প্রোগ্রামটার কথা শুনলে বুঝবেন যে, আমরা ঠিক বিখ্যাতদের নিয়ে কাজ করছি না। সম্ভাবনার কথা বলতে চাইছি।

ঠোঁট উল্টে রাধাশ্রী বলে, আমার কোনও সম্ভাবনাও নেই।

ব্যাপারটা কেঁচে যাচ্ছে দেখে বলু তড়িঘড়ি বলে, আপনি তো সমাজকে, দেশকে কিছু বলতে চাইছেন! ধরুন আপনার একটা আদর্শ আছে, একটা মিশন আছে, একটা স্বপ্ন আছে। তাই না? সেইসব কথাই আপনার মতো করে বলুন।

ওসব হাবিজাবি দিয়ে কি টিভি প্রোগ্রাম হয়?

হবে। যখন হবে তখন দেখবেন খারাপ হয়নি।

খুব অনিচ্ছার সঙ্গেই রাজি হল রাধাশ্রী। দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইট-টাইট ফিট করার পর রাধাশ্রীকে খানিকটা ফ্রি মুভমেন্ট দিল বলু। কখনও অপরিসর বারান্দায়, কখনও উঠোনে, কখনও সামনের এক চিলতে ঘাসজমিতে হাঁটতে হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে, কখনও চেয়ারে বসে রাধাশ্রী যা বলল তা অসাধারণ। অন্তত তেমনটাই শোনাল বলুর কাছে। মেয়েটা সংসারধর্ম করার চেয়ে দেশধর্ম, লোকধর্মের পথেই যেতে চায়। এই গরিব-দুঃখীর দেশে সে শেখাতে চায় মানুষকে স্বনির্ভরতার শিক্ষা। বিশেষ করে মেয়েদের।

ভাবে ঘোর এবং আবেগ থাকলেও মেয়েটা বলল বেশ। কিন্তু কথা শুনে মুগ্ধ হতে বা চা-চিঁড়েভাজা খেতে তো সে আসেনি। একটি গুরুতর কাজ যে বাকি রয়ে গেছে। এটা তার ভূমিকা মাত্র।

শুটিং-এর পর চা-চিঁড়েভাজা খেতে খেতে ঈষৎ লাজুক মানা আর বনশ্রীর মুখোমুখি বসে কথা হচ্ছিল বলুর। চূড়ান্ত ন্যাকার মতো সে হঠাৎ বলল, আচ্ছা, আপনাদের সকলের সঙ্গে আলাপ হলেও আপনাদের বাবার সঙ্গে তো হল না! উনি কি খুবই বিজি?

রাধাশ্রীর মুখটা আচমকা গম্ভীর হয়ে গেল। বনশ্রী বলল, হ্যাঁ, উনি খুবই বিজি।

কিন্তু ওঁর একটা ইন্টারভিউ নিতে পারলে প্রোগ্রামটা নিখুঁত হত। একটু অ্যারেঞ্জ করা যায় না? কী নাম যেন ওঁর?

বনশ্রী কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল, বাবার কথা থাক।

বলু হাসল, থাকবে? আপনাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে ওঁর সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক তেমন ভাল নয়।

বনশ্রী বলল, অনেকটা সেরকমই।

সরি। তাহলে প্রসঙ্গটা তোলা আমার উচিত হয়নি।

হঠাৎ রাধাশ্রী বলল, আপনি কতদিন হল ক্যামেরাম্যানের কাজ করছেন?

অনেক দিন। আঠারো বছর বয়স থেকে। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়েই এ কাজে নেমে পড়ি। সিনেমাতেই কাজ বেশি করেছি। তা ধরুন পনেরো বছর তো হয়েই গেল।

সিনেমায় কাজ করেছেন?

হ্যাঁ।

কানু দত্ত নামে কাউকে চিনতেন?

বলু প্রচণ্ড অবাক হওয়ার ভান করে বলল, কানু দত্ত মানে অভিনেতা কানু দত্ত?

হ্যাঁ, তিনিই।

কী আশ্চর্য, তাঁকে চিনব না কেন? তাঁর ছবিতে আমি যে কাজ করেছি। প্লেন ক্র্যাশে মারা যান তো?

হ্যাঁ।

হঠাৎ কানু দত্তর কথা কেন বলুন তো!

বলুর চোখে চোখ রেখে শান্ত গলায় রাধাশ্রী বলল, তিনিই আমার বাবা।

বলু খুব সুন্দর অভিনয় করল। নির্বাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল, এ যে ভাবা যায় না! আপনারা তাঁর মেয়ে! এতক্ষণ বলবেন তো!

রাধাশ্রী একটু চুপ করে থেকে বলল, আপনি একটা ডকুমেন্টারি করতে এসেছেন, আপনাকে এত কথা বলার মানেই হয় না। তবে আপনি বাবাকে চিনতেন জেনে বলছি, আমার বাবার মৃত্যুর পর আমার মা আবার বিয়ে করেছেন। সেই লোকটাকে আমরা বাবা বলে ভাবতে পারি না। তাই বাবার প্রসঙ্গ আমাদের কাছে অস্বস্তিকর।

বলু একটু বিষণ্ণ হল, অভিনয় ছাড়াই, তারপর বলল, ব্যাপারটা বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। যাকগে ও প্রসঙ্গটা আমার ডকুমেন্টারিতে থাকবে না। কিন্তু কানু দত্তকে আমি ভালই চিনতাম। তাঁর সঙ্গে আমার একটা ভাল সম্পর্ক ছিল। বড় রোল করতেন না ঠিকই, কিন্তু খুব পাওয়ারফুল অ্যাকটর ছিলেন। মানুষটাও দিলদরিয়া এবং সিমপ্যাথেটিক।

রাধাশ্রীকে এইবার একটু বিহ্বল দেখাল। একটু সিক্ত গলায় বলল, আমার বাবার মতো মানুষ হয় না। বাবা মারা যাওয়ায় আমার পৃথিবীটাই যেন অন্ধকার হয়ে গেছে।

প্রথম দিনের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে ভেবে বলু ক্যামেরা গুটিয়ে উঠল। বিদায়ের সময়ে রাধাশ্রীকে বলল, আপনার সম্পর্কে সবটুকু কিন্তু ডকুমেন্টেশন হল না। আপনার অ্যাকটিভিটিগুলো যদি একটু নিতে পারতাম।

রাধাশ্রী ঠোঁট উল্টে বলল, ও কিছু নয়।

বলু হতাশ হল। মেয়েটা তাকে আবার আসতে বলল না।

বলু তবু নিজের কার্ড দুই বোনকে দিয়ে বলল, প্রোগ্রামটা টেলিকাস্ট হলে দয়া করে জানাবেন কেমন লাগল।

এরপর কয়েকদিন বলু বাস্তবিকই ডকুমেন্টারিটা শেষ করতে নিজের গাঁটের কড়ি গচ্চা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বনিযুক্ত মেয়েদের নিয়ে একটার পর একটা ডকুমেন্টেশন করতে লাগল। দূরদর্শন তাকে উৎসাহই দিল। আশ্চর্যের বিষয়, চারজন স্পনসরও জুটে গেল তার। এতটা হবে সে ভাবেনি।

প্রায় দশ-বারো দিন কাজটা নিয়ে মত্ত থাকায় সে আর রাধাশ্রীর নেকলেসটা নিয়ে ভাববার সময় পায়নি। তবে শাসন ভট্টাচার্যকে একটা পোস্টকার্ডে জানিয়ে দিয়েছে যে, রাধাশ্রীর সঙ্গে প্রাথমিক যোগাযোগ হয়ে গেছে। জিনিসটা হস্তান্তরের কৌশল ভাবা হচ্ছে। চিন্তা নেই।

কুড়ি দিনের মাথায় তার ডকুমেন্টারি শেষ হল। পঁচিশ মিনিট করে মোট সাত দিনের প্রোগ্রাম। এডিটিং-এর পর ব্যাপারটা খুব খারাপ দাঁড়াল না। একটা মিথ্যে ব্যাপার এমন সত্যি হয়ে ওঠায় বেশ খুশিই হল বলু। আরও খুশির ব্যাপার টিভি তার ডকুমেন্টারি নিয়ে নিল। এক মাস বাদে সন্ধের স্লটও পেয়ে গেল সে।

বেশ ক্লান্ত ছিল বলু। তৃপ্তও। এক রাতে সে নেকলেসটা বের করে দেখল। অতি মূল্যবান নেকলেসটার দিকে চেয়ে তার রাধাশ্রীর মুখটা মনে পড়ল। না, এই নেকলেস রাধাশ্রীকে মানাবে না। ঝলমলে সুন্দরী হলে মানাত। রাধাশ্রী গয়নার মেয়েই নয়। যত নিরাভরণ ততই সুন্দর। এই নেকলেস নিয়ে মানা কী করবে?

পরদিন সকালে যখন বলু বেরোতে যাবে সেই সময়ে একজন লোক এসে একটা চিরকুট ধরাল তাকে।

চিরকুটটা লিখেছে বনশ্রী। তার মা রাণু দত্ত জানতে চেয়েছে ডকুমেন্টারিটা কবে টিভিতে দেখা যাবে। সেই সঙ্গে আজ বিকেলে চায়ের নিমন্ত্রণ।

রাণু দত্ত যে একটু পাবলিসিটির জন্য উন্মুখ তা বুঝতে অসুবিধে নেই। চায়ের নেমন্তন্নটা সে নিল। এই সুযোগে জেনে নিতে হবে, রাধাশ্রীকে এত দামি নেকলেস দিতে পারে এমন মামাটি কে!

সারাদিন নানা কাজে ঘোরাঘুরির পর বলু সন্ধেবেলা রাণু দত্তের ফ্ল্যাটে হাজির হয়ে দেখল, লম্বা এবং কালো রাফিয়ান চেহারার মধ্যবয়স্ক একটি মানুষও আসরে হাজির। লোকটির চোখমুখে একটা নিষ্ঠুরতার ছাপ আছে, আরও আছে বেশ সাজগোজের ঝোঁক। দেখে প্রাক্তন-গুন্ডা-অধুনা ভদ্রলোক বলে মনে হয়।

রাণু দত্ত পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি আমার স্বামী মিস্টার নবীন ঘোষ।

নবীন ঘোষের একটু তাচ্ছিল্যের কায়দায় নমস্কার করাটা বিশেষ পছন্দ হল না বলুর। এবং ড্রয়িং রুমের আবহে যে হাল্কা অ্যালকোহলের গন্ধটা ভাসছিল সেটাও না। কারণ পাঞ্জাবি কবিরাজের ওষুধ খাওয়ার পর থেকে মদের প্রতি তার যে বীতরাগ এসেছে তা এখনও বেশ প্রবল। লোকটার বোধহয় জ্যোতিষের প্রতি দুর্বলতা আছে, কারণ আঙুলে অন্তত চারটে নানা পাথরের আংটি।

বলু ঠিক করল, লোকটাকে এড়িয়ে যাবে, কথা-টথা বিশেষ বলবে না। সে রাণু দত্তের দিকে চেয়ে বলল, আচ্ছা আপনি কি খুব অভিজাত পরিবারের মেয়ে?

রাণু একটু অবাক হয়ে বলেন, কেন বলুন তো!

বলু সলজ্জ হেসে বলল, আভিজাত্য কাকে বলে ঠিক জানি না, কিন্তু অভিজাত ধনী পরিবারের কাউকে দেখলে যেন টের পাওয়া যায়।

রাণু খুব হেসে-টেসে বললেন, আপনি বেশ মজার মানুষ। তবে অনুমানটা ভুল হয়েছে। আমি নিতান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে।

রিয়েলি? দেখে কিন্তু উল্টোটা মনে হয়।

রাণু বোধহয় একটু খুশিই হলেন কথাটা শুনে। বললেন, একসময়ে অবস্থা খারাপ ছিল না। তবে আমার জন্মের পর থেকে বেশ টানাটানিরই সংসার ছিল।

আপনার ভাই-টাইরা কোথায়?

দাদা রেলে কাজ করে। বিলাসপুরে ছোট ভাই ব্যাঙ্কে। ইন ফ্যাক্ট ও-ই সংসার দেখে। বাবা মারা গেছেন।

বলু খুব চিন্তিত হল। বড়লোক মামার গপ্পোটা তাহলে গুল, এবং ওখানেই একটা ফাঁক। নেকলেসটা এল কোথা থেকে?

নবীন ঘোষ তাকে বেশ তীব্র চোখেই লক্ষ করছিল। হঠাৎ বলল, আপনার প্রোডাকশনের নাম কী?

বলু হাসল, হাজার হাজার প্রোডাকশন রোজ ব্যাঙের ছাতার মতো গজাচ্ছে আর হারিয়ে যাচ্ছে। ওসব জেনে লাভ নেই। আমি ফ্রি ল্যান্স ক্যামেরাম্যান, প্রোডাকশন কিছু তৈরি করিনি। তবে মনে হচ্ছে এবার একটা ব্যানার প্রয়োজন হবে।

সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেনের সঙ্গে কাজ করেছেন?

পাগল নাকি? ওঁদের পছন্দের ক্যামেরাম্যান থাকে।

তাহলে কাদের সঙ্গে কাজ করেছেন?

কয়েকটা নাম বলে বলু বলল, আমি ফিল্মি লাইনের খুব কৃতী লোক নই।

নবীন ঘোষ একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, ও।

চা আর খাবার একটু বিস্বাদ ঠেকল বলুর কাছে। তবে ওঠার সময়ে সে হাতজোড় করে সকলের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময়ে বিশেষ করে নবীন ঘোষের দিকে চেয়ে বলল, আমি সামান্য ক্যামেরাম্যান, আমার সম্পর্কে অকারণ কোনও উঁচু ধারণা রাখবেন না।

বলু বাড়ি ফিরল ভাবতে ভাবতে। মামাটা কে সেটা বোধগম্য হচ্ছে না। কানু দত্ত মিথ্যে কথাটা বলবেই বা কেন? তাতে লাভ কী?

সে বুঝতে পারছিল রাধাশ্রীর সঙ্গে আর একবার দেখা করা দরকার। ঠারেঠোরে ব্যাপারটা জানবার একটা চেষ্টা অন্তত করতে হবে।

দিন দুই ধরে সে কয়েকটা ফিল্মি জার্নালে গিয়ে কানু দত্তের কিছু ফটোগ্রাফ জোগাড় করল। তারপর এক সকালে গিয়ে হাজির হল রাধাশ্রীর বাড়িতে।

রাধাশ্রীকে আজও তেমনই স্নিগ্ধ, কমনীয়, লাবণ্যে টইটুম্বুর দেখাচ্ছিল। তাকে দেখে হাসল, কেমন আছেন?

ভাল। এই নিন, দেখুন পুরোনো কথা মনে পড়ে কিনা।

রাধাশ্রী ফটোগুলো দেখে বিহ্বল হয়ে গেল। বলল, উঃ, কী দারুণ ব্যাপার! দু-একটা বাদে ছবিগুলোর একটাও কখনও দেখিনি! কোথায় পেলেন?

আপনি আপনার বাবাকে কত গভীরভাবে ভালবাসতেন তা টের পেয়ে জোগাড় করে আনলাম। রেখে দিন। অ্যালবামে সেঁটে রাখবেন।

রাধাশ্রী উজ্জ্বল মুখে বলল, রাখব না? বাবার ছবি ভর্তি আমার তিনটে অ্যালবাম আছে।

বাবার কথা আপনার খুব মনে হয়, না?

হবে না? বাবাই তো ছিল আমার একমাত্র বন্ধু।

কানুবাবুর অনেক গুণ ছিল। অনেক ওপরে ওঠার কথা।

একটু ম্লান হয়ে রাধাশ্রী বলল, বাবার দোষও তো ছিল। কেন যে মানুষ মদ খায় জানি না। বাবা রাতে প্রায়ই ফিরত মদ খেয়ে। আমি বড় হয়ে বাবাকে বকাঝকা করতাম। বাবা কাঁদত। আমাকেই যা একটু ভয় পেত। ভালও বাসত খুব।

কয়েকদিন আগে আপনার মায়ের কাছে গিয়েছিলাম, চায়ের নেমন্তন্নে।

তাই বুঝি?

নবীনবাবুর সঙ্গে আলাপ হল।

রাধাশ্রী চুপ করে রইল। কিছু শুনতে চাইল না আর।

বলু একটু ফাঁক দিয়ে বলল, নবীনবাবু কি একটু রাফিয়ান টাইপের?

রাধাশ্রী ঈষৎ কঠিন গলায় বলল, ওর কথা থাক।

বলু মৃদু হেসে বলল, থাক। আমি একটু অপমানিত বোধ করেছিলাম বলেই জানতে চাইছিলাম উনি কি এরকমই?

ভ্রূ কুঁচকে রাধাশ্রী বলল, আপনাকে অপমান করেছে? কেন?

কোনও কারণ তো খুঁজে পেলাম না।

রাধাশ্রীর কঠিন মুখটা সহজ হল না বটে, কিন্তু রাধাশ্রীর মুখ ফুটল। বলল, সেটাই ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কালীঘাটে একসময়ে গুন্ডামি করে বেড়াত।

গুন্ডা! মাই গড! সে লোকটা কী করে—

রাধাশ্রী করুণ একটু হেসে বলল, আমার মাকে আমি সেইজন্যই শ্রদ্ধা করি না। ওঁর রুচি নেই।

সম্পর্কটা কতদিনের?

সেটা কি আপনার জানা দরকার?

না। এমনি জানতে চাইলাম।

রাধাশ্রী মৃদু স্বরে বলল, আপনি বাবার ছবি এনে দিয়েছেন, আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। অবশ্য আপনাকে বললেও ক্ষতি নেই। ঘটনাটা সবাই জানে। মার সঙ্গে ও লোকটার সম্পর্ক বাবা বেঁচে থাকতেই হয়েছিল।

নবীন কি কানুবাবুর বন্ধুগোছের কেউ?

হ্যাঁ। তখন গলায় গলায় ভাব। লোকটাকে বাবাই বাড়িতে আনত। বাবার সঙ্গে বসেই মদ খেত। খুব লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল, বক্সিং করে নাম করেছিল।

তারপর?

যা হয়। বাবা শুটিং আর অন্য কাজে বাইরে বাইরে বেড়াত, আর লোকটা সেই সুযোগে আসত মার কাছে।

অশান্তি হয়নি?

খুব কিছু নয়। বাবা তো জানত না। আমরা দু-বোন জেনেও ভয়ে চুপ করে থাকতাম।

নবীনকে আপনারা কী বলে ডাকতেন?

মামা। মা-ই মামা ডাকতে শিখিয়েছিল।

বলু একটু শিহরিত হল। বলল, আপনারা প্রতিবাদ করেননি?

না। সাহস পেতাম না। তখন আমরা তো ছোটো। আর লোকটা আমাদের খুব ঘুষ দিত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, খুব দামি দামি জিনিস। একবার তো আমাকে একটা জড়োয়া নেকলেসই দিয়ে ফেলল।

অ্যাঁ!

রাধাশ্রী হেসে ফেলে বলল, আমার ধারণা কোনও গয়নার দোকানে ঢুকে চুরি করেছিল।

কীরকম নেকলেস?

তখন কি অত বুঝতাম? মা বলেছিল খুব দামি জিনিস। সেটা অবশ্য আমাদের বাড়ি থেকে চুরি হয়ে যায়।

চুরি!

হ্যাঁ। বাবা মারা যাওয়ার কিছুদিন আগে। চুরি যাওয়ায় আমি বেঁচেছি।

বলু হঠাৎ বলে ফেলল, রাধাশ্রী দেবী, আমি আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

রাধাশ্রী অবাক হয়ে বলে, কী কথা?

নেকলেসটা যদি আজ থাকত তাহলে আপনি সেটা দিয়ে কী করতেন?

রাধাশ্রী নাক কুঁচকে বলল, ওটা ওকে ফেরত দিয়ে দিতাম।

ফেরত না নিলে?

কাউকে দিয়ে দিতাম। যাকগে, ব্যাপারটা তো চুকেবুকে গেছে। ও নিয়ে ভেবে আর কী হবে?

রাধাশ্রী তার চমৎকার ঝকঝকে দাঁতে হাসল। তারপর বলল, আচ্ছা, আপনার সম্পর্কে তো কিছুই তেমন জানি না। শুধু জানলাম, আপনি আমার বাবাকে চিনতেন।

বলু একটু সরল হাসি হেসে বলল, আমার মতো অপদার্থ খুব বেশি পাবেন না।

সে কী! কেন বলুন তো!

আমি ফ্রিল্যান্স ক্যামেরাম্যান, কখনও কাজ জোটে, কখনও জোটে না।

সেটা তো হতেই পারে। তাতে কী?

আমাদের লাইনটা হাইলি কম্পিটিটিভ। আমার এখন তেত্রিশ বছর বয়স, এখনও স্টেবিলিটি আসেনি। তবে চলে যায়। সংসার জীবনেও আমি সুবিধে করতে পারিনি। বিয়ে করেছিলাম, কিন্তু বউ থাকল না।

ও! থাক, ওসব বলতে হবে না।

আরে না, আমার লুকোবার কিছু নেই। আমার স্ত্রী আবার বিয়ে করে এখন সুখেই আছেন। আমি একসময়ে খুব ড্রিংক করতাম।

এখনও করেন?

না। একজন পাঞ্জাবি কবিরাজের ওষুধ খেয়ে নেশাটা ছাড়তে পেরেছি। তবে ওষুধের পার্শ্বক্রিয়ায় জন্ডিস হয়ে গিয়েছিল। আমার জীবনে একটা সময় বড্ড খারাপ গেছে। অবশ্য সবটাই নিজের দোষে।

আর এখন?

এখন! এখন একা থাকি। আমার মা-বাবা থাকে দাদার কাছে। দাদা-বউদি চাকরি করে। মা ছাড়া আমাকে কেউ বিশেষ পছন্দ করে না। তাই আলাদা থাকতে হয়।

আহা রে।

আমার জন্য সিমপ্যাথি খরচ করবেন না। অপদার্থ হলে যা হয় তাই হয়েছে।

অপদার্থ কেন বলছেন? ডকুমেন্টারি তুলছেন, কিছু কাজ তো পাচ্ছেন।

হ্যাঁ। তার পিছনেও একটা ঘটনা আছে। যাকগে, সেসব শুনে আপনার দরকার নেই। এভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেয়া যাবে। আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বিশেষ কিছু নেইও।

আপনার কোনও মিশন নেই?

না। সেইজন্য আপনাকে দেখে ভাল লাগছে। একটা পারপাস নিয়ে জীবনের পথে হাঁটছেন। খুব ভাল। আজ চলি ম্যাডাম, তবে হয়তো আবার যোগাযোগ করব কখনও।

নিশ্চয়ই করবেন।

আপনি বিরক্ত হবেন না তো!

না, বিরক্ত হব কেন?

ধন্যবাদ।

বলু ফের ধন্ধে পড়ে গেল। নেকলেসটার তাহলে কী গতি হবে? ব্যাপারটা কানু দত্তকে জানিয়ে দেওয়াই ভাল নয় কি?

কিন্তু জানানোর সময় পাচ্ছিল না বলু, গোটাকয়েক অ্যাড ফিল্মের কাজ করতে হল। একটা ফিচার ফিল্মের বরাত পেয়ে চারদিন বীরভূমে শুটিং করতে যেতে হল। ফিরে এসে লাগতে হল একটা ভিডিও সিরিয়ালের কাজে। হঠাৎ তার বাজারটা একটু ঊর্ধ্বমুখী হওয়াতে সে নিজেও একটু অবাক। বড় কথা হচ্ছে, আজকাল শরীর বেগড়বাঁই করছে না এবং কাজে মন দিতে পারছে। মাঝে মাঝে সে নেকলেসটা বের করে দেখতে ভোলে না। এবং কৌশলও ভাবে। মাথায় কিছু আসে না।

এক মাস বাদে স্বনির্ভরা নামে তার সিরিয়ালটা সত্যিই শুরু হল টিভিতে। সপ্তাহে দু-দিন দুপুরবেলায় দেখাচ্ছিল। রিপোর্ট খুব একটা খারাপ নয়। প্রথম এবং দ্বিতীয় দুটো পার্টে রাণু, বনশ্রী আর রাধাশ্রী ছিল। দেখে ওদের কেমন লাগল সেটা জানারও ফুরসৎ পাচ্ছিল না বলু। ওই সময়ে তাকে যেতে হল আরও কয়েকটা অ্যাড ফিল্মের লোকেশনে। হঠাৎ হাতে কাজ আসতে শুরু করেছে। টাকা আসছে।

বলু ভেবে দেখল, সে খুব বেশি কিছু চায় না। এইভাবে চললেই তার হয়ে যাবে। বড়লোক হওয়ার তার কোনো ইচ্ছে নেই। বিবাহিত জীবনের ঝামেলাগুলো না থাকায় সে বেশ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে।

একটা ছবির কাজ করছিল সে। ফিচার ফিল্মি। বাংলা ফিচার ফিল্মি-এরসংখ্যা কমে গেছে। অনেক ছবি শুরু হয়, শেষ হয় না। অনেক সময়ে ন্যায্য টাকা পাওয়া যায় না। এ ছবির প্রযোজকটি মোটা টাকার মালিক। ছবিটা হয়তো শেষ হবে। ডিরেক্টর পিনাকেশ ঘোষাল গ্রামের লোকেশন খুঁজছিল, বলু তাকে একটু ভজিয়ে শাসনদের গাঁয়ের কাছে শুটিং করাতে রাজি করাল।

সেই সূত্রেই শাসন আর কানু দত্তের সঙ্গে আর একবার যোগাযোগ হল তার।

।।পাঁচ।।

শাসন ভট্টাচার্য সব শুনে বলল, মহাশয়, হতাশ হইতেছেন কেন? আপনি তো আশাতীত অগ্রসর হইয়াছেন। এতটা যখন পারিয়াছেন বাকিটুকুও পারিবেন।

বাকিটুকুই যে শক্ত কাজ।

কেন মহাশয়?

নেকলেসটা যে ওর সৎ বাপের দেওয়া সেটাতেই মুশকিল হয়েছে। কানু দত্ত আমাকে সত্যি কথাটা বলেনি।

মহাশয়, নির্বাণ ঠাকুর প্রয়োজনে মিথ্যা বলেন ঠিকই, তবে তাহার পিছনে অস্তিবাচক কারণ থাকে।

কী কারণ থাকতে পারে? লোকটা যে রাণু দত্তকে বিয়ে করেছে এটা কি উনি জানেন?

কীরূপে জানিবেন? উনি তো আর সর্বজ্ঞ যোগীপুরুষ নহেন।

কিন্তু পরিস্থিতিটা এমন যে নেকলেসটা দিলেও রাধাশ্রী তা নেবে না।

চেষ্টা করিয়া দেখিবেন। নিতান্তই না গ্রহণ করিলে নির্বাণ ঠাকুরকে প্রত্যর্পণ করিবেন।

আমি ওঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

বাধা কী? গেলেই হয়। কল্য প্রাতঃকালে যাইবেন। অদ্য বিশ্রাম করুন।

পরদিন সকালে নির্বাণানন্দের কাছে যেতেই নির্বাণ ওরফে কানু দত্ত সহাস্যে বলল, কী খবর?

একটু সংক্ষেপে ঘটনাটা বিবৃত করে বলু বলল, এখন কী করা যায় বলুন তো!

কানু দত্ত মৃদু হেসে বলল, এতটা যে পেরেছেন তাইতেই অবাক হচ্ছি। আপনি বাহাদুর ছেলে।

বলু লজ্জা পেয়ে বলল, বাহাদুরির কিছু করিনি। কিন্তু শেষ ব্যাপারটায় আটকাচ্ছে।

কানু দত্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চুপ করে থেকে বলল, নেকলেসটা যে মানা নিতে চাইবে না তা আমি জানি। আমার মেয়েটা খুব ব্যক্তিত্বময়ী।

সে এখনও আপনার স্মৃতি নিয়ে বাস করে। বিভোর। কানুবাবু, অন্তত এ মেয়েটির কাছে নিজেকে প্রকাশ করা আপনার উচিত।

কানু দত্ত মাথা নেড়ে বলে, না, যেমন আছে তেমনি সব থাকুক।

কেন?

মানা আমি বেঁচে আছি জানলে আনন্দে আত্মহারা হবে বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে ওর মায়ের ওপর ঘেন্না বাড়বে।

আপনি রাণু দত্তের খবরটা শুনে একটুও অবাক হলেন না। কেন বলুন তো?

কানু দত্ত হেসে বলল, এক কথা হল, এখন আমি আর কোনো কিছুতেই অবাক হই না। দু-নম্বর হল, এটা আন্দাজ করা ছিল।

নবীন ঘোষ আপনার বন্ধু ছিল?

হ্যাঁ, ভীষণ বন্ধু।

রাণুদেবীর সঙ্গে ওর গোপন সম্পর্কের কথা আপনি জানতেন?

অনুমান করতাম। তবে রাণুর সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে যাওয়ায় ঈর্ষা বোধ করতাম না। একটু বীতরাগ আসত মাত্র।

এখন কী করব বলে দিন। নেকলেসটা আমি সঙ্গে নিয়েই এসেছি।

কেন, ফেরত দিতে? না মশাই, ওটা আর আমার কাছে রাখব না। আপনি নিয়ে যান। মানা যদি না-ই নেয় তাহলে ওটা আপনার কাছেই থাকবে।

পাগল নাকি? এসব দায়িত্ব নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কানুবাবু। আমি আজকাল বড্ড কাজে ব্যস্ত। ঘরে থাকতে পারি না। ফলে নেকলেসটা আনকেয়ারড ফর পড়ে থাকে।

সে গেলেও কেউ আপনাকে দায়ী করবে না। নিশ্চিন্ত থাকুন।

আপনি বড্ড মুশকিলে ফেললেন আমাকে।

কিছু নয়। নেকলেসটাকে নিয়ে ভাববেন না।

কানু দত্তকে বড্ড হেঁয়ালির মতো লাগে বলুর। মানুষটাকে ঘিরে একটা যেন রহস্যের ঘেরাটোপ। ভেদ করা অসম্ভব।

ফেরার পথে শাসন হঠাৎ বলল, মহাশয়, আপনার কি সম্প্রতি উন্নতি হইতেছে?
তার মানে?
জানিতে চাহিতেছি, অকস্মাৎ আপনার ভাগ্যোদয় হইতেছে কিনা।
না না মশাই, ভাগ্যোদয়-ফাগ্যোদয় আবার কী? তবে কিছু কিছু কাজকর্ম পাচ্ছি।
অর্থাগম হইতেছে তো?
তাও হচ্ছে। তবে তেমন কিছু নয়। হঠাৎ একথা কেন?
আপনার মুখশ্রীতে পূর্বেকার ক্লিষ্ট ভাবটা আর নাই। আপনার শরীরে কর্মঠ ব্যক্তির রুক্ষতা প্রকাশ পাইতেছে।
বলু হেসে ফেলে, আপনাকে নিয়ে আর পারি না। আপনি গোয়েন্দা হলে উন্নতি করতেন।
অল্পবিস্তর আমরা সকলেই গোয়েন্দা।
কিন্তু এখন নেকলেসটা নিয়ে কী করি বলুন তো!
ব্যস্ত হইতেছেন কেন? সবুরে মেওয়া ফলে। কণ্ঠহারটি এখন একপ্রকার বেওয়ারিশ। সযত্নে রক্ষা করুন। পরে উহার গতি যাহা হইবার হইবে।
পরের জিনিস—বিশেষ করে দামি গয়না—কাছে রাখতে যে অস্বস্তি হয়।
জানি মহাশয়। তবু বলি, ব্যস্ত হইবেন না। অপেক্ষা করুন, ঈশ্বরপ্রসাদাৎ সুযোগ আসিবে।
কীসের সুযোগ?
শাসন কথাটার জবাব দিল না। হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে লাফ দিল। বলল, মহাশয়, আপনার অর্থাগম হইতেছে, অর্থাগম আরও বৃদ্ধি পাইবে। তখন কী করিবেন?
টাকার চিন্তা তো করি না। কাজের চিন্তা করি। কাজ করে আনন্দ পাই। টাকা আসছে আসুক। কী করব তা দিয়ে ভাবছি না। তবে ইচ্ছে আছে একটা ভিডিও অ্যাড স্টুডিও করব। গোটা দুই ক্যামেরা কেনারও ইচ্ছে আছে।
ভাল মহাশয়, উন্নতি করিতে থাকুন।
বলু ভ্রূ কুঁচকে ভাবছিল। বলল, কানু দত্ত একজন মিস্টিরিয়াস মানুষ, তাই না?
হাঁ মহাশয়, নির্বাণ ঠাকুর কিছু রহস্যময় মানুষই বটে।
শাসনবাবু, আমার খুব ইচ্ছে হয় রাধাশ্রীকে ওর বাবা যে বেঁচে আছে সেটা জানিয়ে দিই।
কেন মহাশয়?
রাধাশ্রী তার বাবাকে ভীষণ ভালবাসে।
কন্যা তাহার পিতাকে স্নেহ করিবে ইহাই তো স্বাভাবিক।
মেয়েটা যে জানলে ভীষণ খুশি হবে।
শাসন গম্ভীর হয়ে বলে, মহাশয়, যাহা করিবেন তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া করিবেন। অবিবেচকের মতো কিছু করিবেন না। হঠকারিতার পরিণাম অনেক সময়ে ভয়াবহ হইতে পারে।
এতে ভয়াবহ কী হবে?
নির্বাণ ঠাকুরের এই অজ্ঞাতবাসের পশ্চাতে সংসার-বৈরাগ্য ব্যতিরেকে অন্য কারণও থাকিতে পারে।
বলু একটু সচকিত হয়ে বলে, উনি অ্যাবসকন্ডার নন তো!
শাসন হাসল, তাহা আমার জ্ঞাত নহে।
ওঁর লুকিয়ে থাকটা যদি এত জরুরিই হবে তাহলে উনি নিজের পরিচয় আপনাকে দিতেন না এবং ধরা পড়তে পারেন জেনেও আমার সঙ্গে দেখা করতেন না।
এমন হইতে পারে যে, নির্বাণ ঠাকুর আপনাকে এবং আমাকে বিশ্বাস করেন। তাহা ব্যতীত অতীতের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত আর কোনো সূত্র পান নাই বলিয়াই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন।

বলু মাথা নেড়ে বলল, না মশাই, আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে।

অনর্থক নির্বাণ ঠাকুরকে লইয়া চিত্ত আলোড়িত করিবেন না। নিদ্রাচ্ছন্ন সারমেয়কে জাগরিত করার প্রয়োজন কী?

আপনি আমাকে আরও চিন্তায় ফেলে দিলেন। ঠিক আছে, আপাতত নাহয় ভাবব না। তা ছাড়া ভাববার সময়ও নেই। দিনরাত এখন কেবল কাজ আর কাজ। রাতে দু-চার ঘণ্টা যা সময় পাই মোষের মতো ঘুমোই।

মহাশয় অদ্য আমার দীন কুটিরে বিশ্রাম গ্রহণ করুন।

পাগল নাকি? আজ বেলা এগারোটা থেকে শুটিং। হিরোইন আসছে। আমাকে এখনই রওনা হতে হবে।

বলু দিন তিনেক হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর কলকাতায় ফিরে এল। সত্য কথা, তার কাজ বাড়ছে। ভিডিও এবং মুভি দুটো ক্যামেরার কাজেই এখন তার বেশ নাম হয়েছে। গ্র্যাফিক্স এবং অ্যানিমেশনের কাজেও তার ডাক পড়ছে।

সাধারণত ডাকবাক্সে দেখার কিছু থাকে না বলুর। তার ব্যক্তিগত চিঠি আসে না। ইলেকট্রিক বিল বা ওই জাতীয় কিছু আসে। আসে কিছু পত্রপত্রিকা। দু-একদিন বাদে সে ডাকবাক্স খুলে দেখে। কলকাতায় ফিরে আসার পর ডাকবাক্সে একটা খাম পেল সে।

রাধাশ্রী লিখেছে : মাননীয়েষু, আপনার স্বনির্ভরা দেখেছি। খুব একটা ভাল লাগেনি। এটা যেন যাদের ইন্টারভিউ নিয়েছেন তাদের বিজ্ঞাপনের মতো হয়ে গেছে। আর একটা কথা, এই প্রোগ্রামে আমাকে না রাখলেও পারতেন। আমার তো কোনো ভূমিকাই ছিল না, খানিকটা নিজের কথা বলা ছাড়া। যাকগে, চিঠিটা এসব কারণে লেখা নয়। আপনার সঙ্গে কবে, কোথায় দেখা হতে পারে বলুন তো! একটু দরকার আছে। আমার এক বন্ধুর টেলিফোন নম্বর দিলাম। ওকে জানালেই খবর পেয়ে যাবো।

ভ্রূ কুঁচকে বলু একটু ভাবল। রাধাশ্রীর তাকে কী দরকার হতে পারে! যাই হোক। দেখা করার অনুরোধটা পেয়ে বলুর মনটা প্রসন্ন হল।

কিন্তু সামনে ঠাসা ব্যস্ত শিডিউল। সময় বের করাই কঠিন। সে রাধাশ্রীর বন্ধুকে চার দিন পরের একটা তারিখ জানিয়ে দিল।

তারপর যথারীতি ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। সময়টা তার বড্ড ভাল যাচ্ছে আজকাল। কাজ থাকলেই ভাল লাগে।

।।ছয়।।

কুঁদঘাটের বাড়িতে শীতের সকালের স্নিগ্ধ আলোয় ফের দেখা হল রাধাশ্রীর সঙ্গে। সেই হাস্যময় মুখের কমনীয় শ্রী। অভ্যর্থনার মধ্যে একটুও কৃত্রিমতা নেই।

রাধাশ্রীর ঘরটি তার নিজস্ব। বলুকে চেয়ারে বসিয়ে রাধাশ্রী মুখোমুখি তার চৌকির বিছানায় বসে বলল, আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ, জানি। এভাবে দেখা করতে চেয়ে বিরক্তই করলাম নাকি?

আরে না। ইট ইজ এ প্লেজার। কিন্তু ইদানীং আমার কাজ হঠাৎ একটু বেড়ে গেছে, তাই দেখা করতে দেরি হল। গত দু-বছর তো প্রায় বেকার বসে বসে কেটেছে। কাজ পেয়ে তাই একটু হিমশিম খাচ্ছি। বলুন কী করতে পারি আপনার জন্য।

রাধাশ্রী একটু রহস্যময় হাসি হেসে বলল, আচ্ছা, আপনি কেমন লোক বলুন তো! ভাল, না খারাপ?

বলু প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে, আমি! কেন বলুন তো!

বলুন না! নিজের সম্পর্কে আপনার অ্যাসেসমেন্ট কী?

বলু হেসে ফেলল। বলল, নিজেকে কেউ খারাপ বলে, না ভাবে? আমি কেমন লোক তা জানতে হলে আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গ যারা করেছে তাদের কাছে। আমার প্রাক্তন স্ত্রী বা প্রফেশন্যাল

রাইভ্যালরাই আপনাকে বলতে পারে আমি কিরকম।
আপনি নিজে কী বলেন সেটাই আমি জানতে চাইছি।
কোনো কারণ আছে কি?
আছে। সেটা পরে বলছি।
আমি কি আপনাকে বলেছি যে, আমি একসময়ে মদ খেতাম?
বলেছেন। মদ তো অনেকেই খায়।
মদ খেতাম, সেটা যদি খারাপ ধরেন তো ধরতে পারেন। আর আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার বনিবনা হত না। ঝগড়াঝাঁটি হত। আমি তাঁকে সময় দিতে পারতাম না বলেই অভিযোগ বেশি ছিল। তা ছাড়া তিনি আমাকে আরও নানা দোষে দোষী করতেন। উড়নচণ্ডী, ভ্যাগাবন্ড, ব্যক্তিত্বহীন, ছোটোলোক, ইতর ইত্যাদি। সেগুলোও আমার স্বপক্ষে যায় না।
আর কিছু?
আরও ভেবে দেখলে হয়তো বেরোবে। তবে আমার মহিলাঘটিত দোষ ছিল না, বা নেই। আমি ডিজঅনেস্ট নই। মর‍্যালিস্ট কিনা বলতে পারব না। কিন্তু আমাকে এভাবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছেন কেন বলুন তো! আমি কোনো অপরাধ করেছি কি?
রাধাশ্রী ফের অকপট হাসি হাসল। তারপর বলল, দোষ দেখলে আপনাকে অ্যাভয়েড করতাম। ডেকে এভাবে জিজ্ঞেস করতাম না।
ব্যাপারটা কী?
রাধাশ্রী ঘরের কোণে তার টেবিল থেকে একটা খামের চিঠি নিয়ে এসে তার হাতে দিয়ে বলল, এটা পড়ে দেখুন।
অবাক হয়ে বলু চিঠিটা খুলে দেখল, গোটা গোটা হস্তাক্ষরে লেখা একখানা চিঠি। লেখাটা মেয়েলি ছাঁদের এবং কাঁচা। বোঝা যায় চিঠির লেখক বা লেখিকা তেমন শিক্ষিত বা শিক্ষিতা নয়। চিঠিটা এরকম: মাননীয়া মহাশয়া, আপনি বলেন্দ্র ভৌমিক সম্পর্কে সাবধান থাকিবেন। লোকটি বিশ্বাসযোগ্য নয়। তাহার চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ আছে। সে হয়তো আপনার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করিবে। তাহাকে কদাচ প্রশ্রয় দিবেন না।
পরিশেষে লিখি, আপনার একটি মূল্যবান সামগ্রী এই বলু ভৌমিকের নিকটে গচ্ছিত আছে। অচিরাৎ উহা আদায় করিয়া লইবেন। নচেৎ পরে পস্তাইতে হইবে। নমস্কার জানিবেন। ইতি।
চিঠির শেষে কোনো নাম বা ঠিকানা নেই।
বলু চিঠিটা দুবার পড়ল। তারপর বলল, আশ্চর্য!
আশ্চর্য কেন?
এই চিঠির সবটুকুই মিথ্যে নয়।
তার মানে?
বলু একটু হেসে বলল, আমার সম্পর্কে যা লিখেছে তা নিয়ে আমার বলার কিছু নেই। কিন্তু একথা ঠিক, আমার কাছে আপনার একটা জিনিস আছে।
রাধাশ্রী আকাশ থেকে পড়ল যেন। ভীষণ অবাক হয়ে বলল, আমার কী জিনিস আপনার কাছে আছে?
আছে।
আমার জিনিস! আপনার কাছে? কী করে হয় সেটা? আমার তো দামি জিনিস নেই, ছিল না।
ছিল।
কী জিনিস বলুন তো!

বলু হাসল। করুণ হাসি। বলল, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই, কিন্তু সেটা কলকাতায় বলে লাভ হবে না। আপনি আমার সঙ্গে একটা জায়গায় যেতে পারবেন?

কোথায়?

বাঁকুড়ার একটা গ্রামে।

কেন বলুন তো!

একা যেতে হবে না, সঙ্গে চেনা বা আত্মীয় কাউকে নিন। কিন্তু তবু চলুন। আপনার একটা ঘটনা জানা দরকার।

আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

বুঝবেন। সাত দিন আমার কিছু কাজ আছে। পরের শনি আর রবি আমি ছুটি নিতে পারব। আমার ইউনিটের একটা গাড়িও ম্যানেজ করা যাবে। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়লে রাতে ফিরে আসা কঠিন হবে না। বরং আপনার পিসি আর পিসেমশাইকেও সঙ্গে নিন।

দূর! কী যে সব বলছেন! আমার ভয় করছে।

ভয় পাবেন না। হয়তো ঘটনাটা আনন্দেরই হবে। প্লিজ, অমত করবেন না।

ঠিক আছে, যাবো। কিন্তু একটু আভাস দেবেন তো!

তাও দেবো না। দিলে সব মাটি হবে। আমি শনিবার সকালে গাড়ি নিয়ে আসব। ছটায়।

কাজটা ঠিক হবে কিনা বলু বুঝতে পারছে না, কিন্তু আর উপায়ও নেই। উড়ো চিঠি আরও আসতে থাকবে। একবার যখন এসেছে তখন অন্য কেউও খবর পেয়ে গেছে। রহস্যটা এই বেলা ভেঙে না দিলে সে সন্দেহভাজন হয়ে থেকে যাবে। তা ছাড়া তার মন বলছে, বাপ আর মেয়ের মধ্যে রহস্যের পর্দাটা সরুক। মেয়েটা বড্ড খুশি হবে। কানু দত্ত হয়তো হবে না। না হোক।

সাতদিন বাদে বলু যখন গাড়ি নিয়ে হাজির হল তখন প্রস্তুত হয়ে বেরিয়ে এল রাধাশ্রী একাই।

এ কী? আপনার পিসি-পিসেমশাই কই?

রাধাশ্রী একটু গম্ভীর হয়ে বলে, আমি একাই যাবো।

একা! একা কি যাওয়া ভাল হবে?

আপনি কতটা খারাপ তা আমার জানা চাই।

বলু হাসল, সেটা জানা এমন কিছু জরুরি ব্যাপার কি? দুনিয়ায় যত খারাপ লোক আছে, সবাইকে জানতে হবে এমন কোনো কথা নেই।

দুনিয়ার খারাপ লোকদের নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।

বলু বলতে পারত, তাহলে আমাকে নিয়েই বা মাথাব্যথা কেন? কিন্তু কথাটা তার এল না। মনে হল ঠিক এরকম কথা বলাটা ঠিক হবে না। এ প্রশ্ন সে করতে চায় না। বরং রাধাশ্রীর কথাটা তার ভিতরে একটা কোমল আলো ছড়িয়ে দিল।

আপনার ড্রাইভার নেই?

না। ড্রাইভারের আজ ছুটি। আমি গাড়ি খারাপ চালাই না। ড্রাইভার থাকলে কি আপনি আর একটু সেফ ফিল করতেন?

মোটেই না। বরং আর একটা লোক থাকলে আমার অস্বস্তি হত। আমি কি সামনে বসব?

যেখানে খুশি।

তাহলে সামনেই বসি।

তার পাশেই বসল রাধাশ্রী। বলু গাড়ি ছেড়ে দিল।

পিসি আর পিসেমশাইকে কী বলে এসেছেন?

আমি মিথ্যে কথা বলি না। বলে এসেছি আমি আপনার সঙ্গে বাঁকুড়া যাচ্ছি।

ওঁরা মত দিলেন?

দেবেন না কেন? আমাকে নিয়ে ওঁদের কোনো ভয় নেই। কতক্ষণের রাস্তা?

ফাঁকা পেলে ঘণ্টা তিনেক, বড় জোর চার ঘণ্টা। তবে ওখানে বেশিক্ষণ স্টে করা যাবে না। বিকেলের আগেই রওনা হতে হবে।

আমি যে আজই ফিরব এমন কথা পিসি আর পিসেমশাইকে বলে আসিনি।

সর্বনাশ! ওঁরা চিন্তা করবেন যে!

চিন্তা যাতে না করেন তার জন্যই বলেছি, আজই ফিরব, না হয় কাল। কেন বললাম জানেন?

কেন?

রাস্তায় তো গাড়ির গণ্ডগোলও হতে পারে।

তা ঠিক! গাড়িকে বিশ্বাস কী? তবে গাড়ি খারাপ হলেও আপনাকে আমি এক্সপ্রেস বাসে তুলে দিতাম। না হলে দুর্গাপুরে বিকেলের কোলফিল্ড এক্সপ্রেস ধরিয়ে দিতাম।

খোঁপাটা ঠিক করতে করতে রাধাশ্রী বলল, গাড়ি চালানোর সময় কথা বলার দরকার কী?

কথা বললে কোনো অসুবিধে হয় না। গাড়ি তো অভ্যাসেই চালানো যায়।

এটা আপনার গাড়ি নয়?

না। আমি বড়লোক নই।

চিঠিটা পড়ে আপনি একটু ভয় পেয়েছেন কি?

বলু বলল, ভয় পাওয়ারই কথা।

চিঠিটা কার লেখা আন্দাজ করতে পারেন কি?

না। আর সেইটেই আরও বেশি ভয়ের।

বাঁকুড়ায় কি কোনো ঘটনা ঘটবে?

ঘটবে।

তাতে কি আপনার ভয় ঘুচবে?

ঘুচবে। সব দায় এড়ানো যাবে।

তার মানে?

আমার ওপর একজন একটা গুরুদায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেটা আমি সুষ্ঠুভাবে মেটাতে পারছিলাম না। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি হয়তো হবে না। কিন্তু আমি দায়মুক্ত হব।

আমার কাছে সব হেঁয়ালির মতো লাগছে।

লাগবারই কথা। তবে ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর আপনি হয়তো সুখী হবেন।

আর আপনি?

আমি! আমি দায়মুক্ত হয়ে যাবো। মনের সুখে ক্যামেরা ঘাড়ে করে কুলির মতো পরিশ্রম করে যাবো। কোনো কাঁটা আর মনে খচখচ করবে না। শুনুন পিছনের সিটে খাবারের প্যাকেট, জল আর কোল্ড ড্রিংকস আছে। খিদে-তেষ্টা পেলে বলবেন। লজ্জা করবেন না।

আমার খিদে-তেষ্টা বড় একটা পায় না।

পিছনের সিটটায় জিনিসগুলো একবার মুখ ফিরিয়ে দেখে নিয়ে রাধাশ্রী বলল, ও বাবা, এ তো পিকনিকের আয়োজন।

না না, তেমন কিছু নয়। আমি আবার একটু পেটুক গোছের। খুব খেতে ভালবাসি। কিন্তু জোটে না তেমন।

কেন জোটে না?

কাজের চাপে অর্ধেক দিন খাওয়াই হয় না। বাসায় যখন ফিরি তখন রাঁধতে ইচ্ছেও করে না। শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ি।

এত সময়ের অভাব?

হ্যাঁ। ফুরনের কাজ তো। লোকে যত পারে খাটিয়ে নেয়। আর কাজটা আমি ভালও বাসি।

যখন আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে থাকতেন তখন কী হত?

তখন! তখন খাবার জুটত। তবে আমার স্ত্রী খুব ঘরকন্না করার লোক ছিলেন না। সাদামাটা রান্না করতেন। ঢাকা দেওয়া থাকত। তবে অভিযোগ করছি না। আমার তো রুটিন নেই। ওর আর কী করার ছিল?

উনি কি এখন সুখে আছেন?

খুব। ওর স্বামী একজন দায়িত্ববান মানুষ। আমার মতো নয়।

আপনি আত্মনিন্দা করতে খুব ভালবাসেন, না?

না তো! আত্মনিন্দা নয়। আমি আত্মস্তুতিও পছন্দ করি না। যা সত্যি তা স্বীকার করি মাত্র।

রাধাশ্রী একটু হাসল।

বলু বলল, আমার সম্পর্কে যে একদিন এত কথা উঠবে এবং এত জবাবদিহি করতে হবে তা জানতাম না।

বিরক্ত হলেন?

না, বরং মজাই লাগছে। আমি তো নিজের কাছ থেকেই হারিয়ে গিয়েছিলাম। এখন যেন হারানো বলু ফিরে আসছে। সামান্য একজন ক্যামেরাম্যানের এলিটি বলেই তো কিছু নেই।

তাই বুঝি?

আপনার তা মনে হয় না?

না। কত মানুষ কত কষ্টে বেঁচে আছে!

তা ঠিক। মানুষকে নিয়ে আপনি খুব ভাবেন, তাই না?

তা ভাবি।

অথচ আপনার বয়স কত কম! এই বয়সের মেয়েদের সামাজিক চেতনা কমই থাকে।

আমার প্রশংসা করতে হবে না।

যার যেটা ভাল সেটা না বলাটাও অন্যায়। আমি তো একটা স্বার্থপর মানুষ, নিজের ধান্ধায় ঘুরি। আপনার মতো কাউকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। আপনি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোটো, তবু হয়।

জ্যাঠামশাই সাজতে চাইছেন নাকি?

প্রায় তা-ই।

আপনি বললেই তো আর হবে না। আপনি আত্মনিন্দুক।

বলু একটু হাসল। তারপর বলল, গ্রামটা আরামবাগের কাছে। কখনও গেছেন ওসব জায়গায়?

না। আমি প্রায় কোথাও যাইনি। বাবা থাকতে বেড়াতে নিয়ে যেত। তখন খুব ঘুরেছি। বাবা যাওয়ার পর আর হয়নি।

আপনার মায়ের সঙ্গে কি আপনার আর কোনো সম্পর্ক নেই?

সম্পর্ক নেই। তবে উনি ব্যাপারটা মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি।

স্যাড কেস।

না, স্যাড কীসের? আমি ওঁকে মিস করি না। আমার বাবা ছিল আমার ভুবন। মায়ের সঙ্গে সম্পর্ক আলগা হয়ে যায়, যখন বাবা থাকতেই মা এই লোকটাকে প্রশ্রয় দিত।

এরকম কেন হল?

জানি না। কেউ কেউ থাকে ওরকম।

আমার কাছে খোলাখুলি আপনারা সব বলে দিয়েছেন। একটু অবাক হয়েছি তাতে।

না বললে কী লাভ হত? সবই জানতে পারতেন।

সে কথা ঠিক।
আচ্ছা, আপনি এত জোরে গাড়ি চালান কেন?
ভয় করছে আপনার?
করছেই তো।
দূরের পাল্লা বলে তাড়াতাড়ি করছি। আবার ফিরতে হবে তো!
না ফিরলে কিছু হবে না। ওখানে কারও বাড়িতে থাকা যাবে না? গাঁয়ের লোকেরা অতিথিবৎসল হয়।
সেই গ্রাম আর কি আছে? তবে এই গাঁয়ে থাকার জায়গা নিশ্চয়ই পাবেন, কিন্তু থাকার দরকার হবে না। আজই ফিরিয়ে আনব আপনাকে।
রাধাশ্রী বলল, কেমন গ্রাম?
হারানো গ্রাম। ভালই।
আপনি সেখানে কেন যান? কেউ আছে বুঝি?
হ্যাঁ, একজন মজার মানুষ আছে। তার নাম শাসন ভট্টাচার্য। সাধু ভাষায় কথা বলে। লোকটা খুব বুদ্ধিমান।
সাধু ভাষায় কথা বলে কেন?
ওর দাদু নাকি সংস্কৃতে কথা বলত। শাসন অতটা পারে না, তবে সাধু ভাষায় বলে।
রাধাশ্রী হাসল। বলল, তাঁর কাছেই কি আমরা যাচ্ছি?
তার কাছেও। তবে আর একজনও আছেন।
তিনি কে?
একজন সাধুবাবা।
ভ্রূ কুঁচকে রাধাশ্রী বলে, সাধুবাবা? তাঁর কাছে কেন?
গেলেই বুঝতে পারবেন।
আপনি কিন্তু ভীষণ দুষ্টু।
না না, আমি সিরিয়াস।
ডানকুনির ভিতর দিয়ে আরামবাগ রোড ধরে গাড়িটা বেশ জোরেই চালাচ্ছিল বলু।
রাধাশ্রী বলল, এত জোরে নয়। একটু আস্তে চালান।
ভয় পাবেন না। আমি নিরাপদ চালক। আপনার খিদে পাচ্ছে না?
না তো! তবে আপনার পেয়ে থাকলে খেতে পারেন।
আমার হল ইচ্ছে খিদে। যখন-তখন খেতে পারি। তবে আপনার যখন খিদে পাবে তখনই খাবো।
এ মা! তা কেন?
আমার খাওয়ার তাড়া নেই।
শুনুন, আমাকে আমার পিসি সকালে ফ্যানাভাত খাইয়ে দিয়েছেন। আমার এখন খিদে পাবে না।
আমারও পাচ্ছে না।
কী মুশকিল!
বলু হাসল, ব্যস্ত হবেন না। আমার অনুমান, আমরা নটার মধ্যেই পৌঁছে যাবো। রাস্তা ফাঁকা পাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি এসে গেছি। গিয়েই খাওয়া যাবে।
আপনি খুব জেদি টাইপের।
কে জানে আমি কীরকম! নিজেকে নিয়ে ভাবিই না।
আপনি খারাপ।
বলু হাসে, হ্যাঁ, উড়ো চিঠি তো তাই বলছে।
ঠিক পৌনে নটায় তারা গাঁয়ে ঢুকে পড়ল।

এই আপনার সেই গ্রাম?
হ্যাঁ। থ্রিল হচ্ছে না?
না তো!
আপনি বয়সের তুলনায় বেশ পরিণত।
বারবার বয়সের কথা কেন? কুড়ি বছর মেয়েদের অনেক বয়স।
তাই বুঝি?
বয়সের তুলনায় আপনিই বরং ছেলেমানুষ।
তা হবে হয়তো।
শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করাল বলু। মেয়েটাকে এরকম আচমকা নিয়ে আসায় শাসন যে রেগে যাবে তাতে সন্দেহ নেই বলুর। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য এটা না করেও উপায় ছিল না তার।
এখানেই নামতে হবে?
হ্যাঁ ম্যাডাম। এটাই শাসন ভট্টাচার্যের বাড়ি। আগেই বলে রাখি, এ বাড়িতে চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা নেই। একটু অসুবিধে হবে আপনার।
মোটেই হবে না।
শাসন বাড়িতেই ছিল। তাদের দেখে বিস্ফারিত চোখে এক পলক চেয়েই সামলে নিয়ে বলল, আসিতে আজ্ঞা হউক।
শাসনের বউ সন্ধ্যা বেরিয়ে এসে রাধাশ্রীকে দেখে হাঁ করে চেয়ে রইল। শহুরে মেয়ে তার কাছে একটা প্রবল দ্রষ্টব্য বস্তু।
বলু শাসনের কানে কানে বলল, কানু দত্তর মেয়ে।
মহাশয়, করিয়াছেন কী?
জানি আপনি খুশি হবেন না, কিন্তু আমি ফ্যাসাদে পড়ে গেছি।
মহাশয়, নির্বাণ ঠাকুর হয়তো খুশি হইবেন না।
তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাকে খুশি করতে গিয়ে চোরের অপবাদ নেবো নাকি? মেয়েটার কাছে উড়ো চিঠি গেছে। জানাজানি হয়ে গেছে বলেই মনে হচ্ছে। আমি আর দায়িত্ব নিতে পারব না।
মহাশয়, উত্তেজিত হইবেন না। চা পান করুন, খাদ্য গ্রহণ করুন। মস্তিষ্ক শীতল হউক, তাহার পর ভাবা যাইবে।
ভাববার হলে আপনারা ভাবুন। আমি আজই মেয়েটার কাছে সব বলে দেবো।
মহাশয়, একটু সময় প্রদান করুন।
সন্ধ্যা রাধাশ্রীকে বারান্দার রোদে মাদুর পেতে বসিয়েছে। রাধাশ্রী তার সঙ্গে খুব সহজভাবে কথা বলছে। সন্ধ্যা আপ্লুত হয়ে যাচ্ছে। দৃশ্যটা দূর থেকে দেখল বলু।
কী একটা পত্রের কথা কহিতেছিলেন মহাশয়?
উড়ো চিঠি। তাতে লেখা হয়েছে যে আমি খুব খারাপ লোক এবং আমার কাছে রাধাশ্রীর একটা দামি জিনিস আছে। সেটা ওকে আদায় করে নিতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে।
শাসনের মুখ হাসিতে উদভাসিত হয়ে গেল। বলল, ইহাতেই আপনি এত উত্তেজিত হইলেন? উড়ো পত্রের মূল্য কী?
আপনার বেলায় হলে বুঝতেন।
আর একটা মাদুরে রাধাশ্রীর মুখোমুখি বলু আর শাসন বসল। সন্ধ্যা গেল চা করতে। বলু খাবারের প্যাকেটগুলো নামিয়ে নিয়ে এসেছে।

শাসন রাধাশ্রীকে বলল, এই পল্লিগ্রামে আপনার যথাযথ আপ্যায়ন হইতেছে না বলিয়া ক্ষমা করিবেন। আমি নিতান্ত দরিদ্র হতভাগ্য।

রাধাশ্রী হেসে বলল, আমিও আমার গরিব পিসির কাছে থাকি। আমাকেও কষ্ট করে বড় হতে হয়েছে। আপ্যায়ন আবার কীসের? আচ্ছা আপনি কি আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও এই ভাষায় কথা বলেন?

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়া। সকলের সহিতই কহি।

আমার কাছে কিন্তু আপনার ভাষাটা ভারী মিষ্টি শোনাচ্ছে।

আপনার মঙ্গল হউক।

আপনারও হোক।

।। সাত।।

পিতা-পুত্রীর মিলনটা হল। যেমনটা আশা করা গিয়েছিল তেমনই। বিস্ময়, চিৎকার এবং তারপর রক্তের টানের জোয়ারে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরে সে কী কান্না! কানু দত্তর সাধুর বৈরাগ্য ভেসে গেল অকুণ্ঠ চোখের জলে। রাধাশ্রী কাঁদতে কাঁদতে পুলকে আহ্লাদে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগল দুজনের। রাধাশ্রী ধরা গলায় অবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, বাবা, তুমি বেঁচে আছো। অথচ আমাকে একবারও দেখতে ইচ্ছে করল না, এ কি হতে পারে?

মা গো, অনেক কষ্টে বুকটা পাথর করে রেখেছিলাম। আজ সব প্রতিরোধ ভেঙে দিলি। মনটা যে বড্ড নরম হয়ে গেল রে!

দৃশ্যটা নীরবে দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে দেখল দুজন। শাসন আর বলু।

বলু বলল, চলুন মশাই, বাপ-বেটিতে একটু নিরালায় কথা হোক। ওদের অনেক কথা বলার আছে।

আজ্ঞা হ্যাঁ মহাশয়, ইহা উত্তম প্রস্তাব।

গাঁয়ের রাস্তা ধরে হেঁটেই ফিরছিল দুজন।

মহাশয়, আপনি কি অদ্যই প্রত্যাবর্তন করিবেন?

হ্যাঁ, এখানে আর কাজ কী?

নির্বাণ ঠাকুরের কন্যাও কি আপনার সহিত যাইবেন?

বলু হাসল, মনে তো হচ্ছে না। তাঁর যাওয়ার দরকার কী? বাপের কাছে কয়েকদিন থাকুক, আমি বরং ওর পিসিকে জানিয়ে দেবো।

কী জানাইবেন মহাশয়? উহার পিতার জীবিত থাকিবার কথা?

তাই তো! কী জানাবো তা তো ভেবে দেখিনি।

আমি কহি কি, অসুবিধা না থাকিলে আজ এই পল্লিতেই অবস্থান করুন।

লাভ কি? বাপ-মেয়ে মিলে গেছে, আমার তো আর কোনো কাজ নেই। মেয়ে যদি বাপের কাছে কয়েকদিন থাকতে চায় তো থাকুক। বরং রাধাশ্রী আমার হাত দিয়ে ওর পিসিকে একটা হাতচিঠি পাঠাতে পারে।

এখন দ্বিপ্রহর। স্নানাহারান্তে একটু বিশ্রাম করুন। ভাবিবার সময় আছে।

না মশাই, সময় নেই। নেকলেসটা কানু দত্তকে ফিরিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন সে যা করার করুক। আমার কাজ শেষ। খেয়েদেয়েই রওনা হবো। খুব খাটুনি যাচ্ছে। ফিরে গিয়ে একটা লম্বা ঘুম দেবো।

মহাশয়, আপনার কি বৈষয়িক উন্নতি ঘটিতেছে?

এ কথা আগেও জিজ্ঞেস করেছেন। হ্যাঁ, কিছুটা হচ্ছে ঠিক।

ভাল। আপনার মতো সচ্চরিত্র ব্যক্তির উন্নতি হওয়াই স্বাভাবিক।

সচ্চরিত্র কিনা জানি না। তবে কাজ করতে ভালবাসি।

রাধাশ্রী দেবী কীরূপে প্রত্যাবর্তন করিবেন? আপনি তো আপনার শকটটি লইয়া চলিয়া যাইবেন, নির্বাণ ঠাকুরের কন্যার কথাও তো ভাবিবেন!

কেন ভাববো? এবার দায়িত্ব কানু দত্তর। তবে যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমি দিন সাতেক বাদে গাড়ি করে এসে নিয়ে যেতে পারি। সাত দিনের আগে হবে না।

ভাল কথা। অগ্রে স্নানাহার করুন, তৎপর রাধাশ্রী দেবীকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করা যাইবে।

বলু খুব অন্যমনস্কভাবেই স্নানাহার সারল। তারপর বলল, এবার চলুন, রাধাশ্রীকে বলে রওনা হয়ে পড়ি। গাড়িটা নিয়েই একেবারে যাবো।

গাড়িতে উঠে শাসন বলল, মহাশয়, একটা প্রশ্ন করিব কি?

করুন।

যাহা সকলে বুঝিতে পারিতেছে, এমন কি সরল পল্লিবধূ বা গ্রাম্য লোক, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না কেন?

কী বুঝতে পারছি না বলুন তো!

আপনাকে বুদ্ধিমান বলিয়া জানিতাম।

না মশাই, আমার বুদ্ধি তত কাজ করছে না। ব্যাপারটা কী?

শাসন শুধু রহস্যময় একটু হাসল।

বাপ আর মেয়ে সদ্য খেয়ে উঠেছে। রাধাশ্রীর মুখচোখ এক অপার্থিব আলোয় যেন ঝলমল করছিল। মেয়েটা বহুকাল পরে যেন সত্যিকারের প্রাণের জোয়ারে ভাসছে। তার গলায় ঝলমল করছিল নেকলেসটিও।

আর কানু দত্ত? তার মুখচোখে যেন চাপা আনন্দের দীপ্তি। বলুর দিকে চেয়ে কানু দত্ত বলল, আপনি কাজটা অন্যায় করেছেন ঠিকই, কিন্তু বোধহয় তত খারাপ করেননি। মেয়েটাকে দেখে অনেকদিন পরে আবার যেন বেঁচে উঠলাম। মায়ার বন্ধন ঠিকই, কিন্তু মায়াও তো ভগবানেরই সৃষ্টি।

বলু একটু অপরাধী হেসে রাধাশ্রীর দিকে চেয়ে বলল, এবার আমাকে বিদায় দিন। আপনি তো নিশ্চয়ই এখন ফিরবেন না! বাবাকে পেয়েছেন এতদিন পর!

রাধাশ্রীর মুখটায় ঈষৎ রক্তাভা দেখা দিল। একটু ঝংকৃত গলায় বলল, কেন, আপনি এখনই ফিরবেন কেন? কাল তো ছুটি!

কাল ভাবছি সারাদিন ঘুমোবো।

অত ঘুমোতে হবে না। কাল যাবেন।

থেকে লাভ কি বলুন তো! আমার কাজ তো শেষ!

হঠাৎ শাসন তার কানে কানে বলল, মহাশয়, এখনও কি বুঝিতে পারিতেছেন না?

কী বুঝবো?

যাহা সকলে বুঝিতেছে?

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহাশয়, ভাল করিয়া চতুর্দিক অবলোকন করুন, বুঝিবেন।

বলু মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। শাসন যে কীসের ইঙ্গিত করছে তা সে একদমই বুঝতে পারছে না কেন?

বলু রাধাশ্রীর দিকে চেয়ে বলল, থাকতে বলছেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কি আপনি কালই ফিরবেন?

কানু দত্ত হঠাৎ বলল, না। মানা আমার কাছে কয়েকদিন থাকবে।

বলু বলল, সেটাই অনুমান ছিল। তাই বলছিলাম আমার আর থেকে লাভ কি?

রাধাশ্রী বলল, আজ রাতে আপনি, শাসনবাবু আর সন্ধ্যাবউদি এখানে খাবেন। আমি আয়োজন করছি।

শাসন ফের চাপা স্বরে বলল, মহাশয়, কিছু বুঝিতেছেন কি?
না। উঃ, জ্বালালেন তো!
শাসন বলল, আশ্চর্য মহাশয়। অত্যাশ্চর্য!
কীসের আশ্চর্য?
আপনি যে বুঝিতেছেন না ইহাই আশ্চর্য!
ওঃ শাসনবাবু, আপনি আমার মাথাটাই খারাপ করে দেবেন দেখছি!
শাসন খুব বিস্ময়াবিষ্ট মুখে ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, বুঝিতেছেন না, না বুঝিতে চাহিতেছেন না?
বলু হতাশ হয়ে মাথা নাড়ল। কিছু বলল না।
মহাশয়, কী স্থির করিলেন?
কী ঠিক করব?
অদ্যই কলিকাতায় ফিরিবেন?
না, কী করে যাবো?
কেন যাইবেন না?
যাই কী করে? নেমন্তন্ন করল না?
আশ্চর্য! অতি আশ্চর্য!
লতা চা করে নিয়ে এল। তার পরনে আজ ফর্সা কাপড়, মুখে হাসি। চা দিতে দিতে বলল, আজ যেন এ বাড়ির গোমড়ামুখো ভাবটা কাটল।
বলু চা খেতে খেতে একবার চোখ তুলল। রাধাশ্রী তার দিকেই চেয়ে ছিল একদৃষ্টে। চোখে চোখ পড়তেই মুখটা নামিয়ে নিয়ে বলল, এই নেকলেসটা আপনার কাছে ছিল?
হ্যাঁ। যতদিন ছিল ততদিন দুশ্চিন্তায় কাঁটা হয়ে ছিলাম। বড্ড দামি জিনিস বলে শুনেছি।
সলজ্জ হেসে রাধাশ্রী বলল, নেকলেসটা কেন নিলাম তা জানেন?
না। বলেছিলেন নেবেন না।
নিলাম। তার কারণ, আমাদের পরিবারকে ও লোকটা যেভাবে তছনছ করেছে তার একটা ক্ষতিপূরণ ওর দেওয়ার কথা। আমি সেভাবেই এটাকে দেখছি।
বলু একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ, ওভাবেও দেখা যায়।
ঠিক করেছি কলকাতায় গিয়ে এটা বিক্রি করে যা পাবো তাই দিয়ে কিছু গরিব-দুঃখীর কাজ হবে।
বলু একটু হাসল, আপনি যে তা-ই করবেন তা আমার জানা ছিল।
খুব চিনেছেন বুঝি আমাকে!
খুব।
শাসন চাপা স্বরে বলল, আশ্চর্য! আশ্চর্য!
রাধাশ্রী বলল, শাসনবাবু, আপনি সন্ধ্যাবউদিকে নিয়ে আসুন।
শাসনের সঙ্গে সঙ্গে বলুও উঠতে যাচ্ছিল, রাধাশ্রী একটা ধমক দিয়ে বলল, আপনি কোথায় যাচ্ছেন! বসুন।
বলু বসে পড়ল।
জানলা দিয়ে একটা অদ্ভুত আলো এসে পড়েছে ঘরে। দিনশেষের আলো। সেই আলোর আভায় হঠাৎ রাধাশ্রীর চোখ দুখানা দেখতে পেল বলু। এক গভীর সম্মোহন দুখানি চোখের ভিতর দিয়ে তাকে স্পর্শ করল।
শাসন হঠাৎ কানের কাছে মুখ এনে বলল, মহাশয়, বুঝিতেছেন?

বলু মুখটা নামিয়ে নিয়ে সলজ্জ গলায় বলল, বুঝেছি।

আচমকা রাধাশ্রীর মুখে রক্তাভা এসে পড়ল। মুখ লুকোতেই বোধহয় সে অস্ফুট 'আসছি' বলে উঠে ছুট-পায়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

—

[পৌষ ১৪০৩]

গল্প

ত্রিকোণ

ব্যায়ামবীর নাকি হে?

আজ্ঞে, তা একরকম বলতে পারেন। তবে ঠিক শরীর বাগানোর মতলব ছিল না মশাই। মতলব ছিল চাকরি বাগানোর।

বটে! কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক পরিষ্কার হল না বাপু, একটু খোলসা করে বলা যায় না!

নিত্যানন্দবাবু বলেছিলেন, খেলোয়াড়, ব্যায়ামবীর এদের চাকরির বাজার বেশ ভাল। ফুটবল, ক্রিকেটে নাম করতে পারলে চাকরির জন্য নাকি লোকে টানাটানি করে। তা খেলাধুলোয় তেমন সুবিধে হল না। তাই পাড়ার ব্যায়ামাগারে নাম লিখিয়ে কসরতে নেমে গেলুম।

তা বাপু, সত্যি বলতে কি, শরীরখানা তোমার দিব্যি তাগড়াই হয়েছে বটে। গুলি-টুলি ফুলে যেন জামা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। তা শরীর তো হল, চাকরির কিছু সুরাহা হল নাকি?

না মশাই, মাসল ফুলিয়ে বিস্তর জায়গায় হানা দিলাম, সবাই মুখ ফিরিয়ে নেয়। পুলিশ, রেল, কাস্টমস সব জায়গাতেই বলল, শুধু চেহারায় চাকরি হওয়ার নয়। লেখাপড়া চাই, কমপিউটার জানা চাই, আরও সব কী কী যেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, আজকাল চাকরির অনেক বায়নাক্কা হয়েছে বটে। কমপিউটার যন্তরটাই তো আমি আজ অবধি বুঝে উঠতে পারলাম না। তাহলে চাকরি জুটল না বুঝি তোমার?

একেবারে জুটল না বললে মিথ্যে বলা হবে। চেহারা দেখে একটা হাউজিং কমপ্লেক্স আমাকে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি দিয়েছিল।

চাকরির বাজার দেখছি খুবই খারাপ! ব্যায়ামবীরকে দারোয়ান রাখা মোটেই ভাল ব্যাপার নয়।

আজ্ঞে, আমারও খুব প্রেস্টিজে লেগেছিল প্রথমে। কিন্তু তখন সংসারে বড় টানাটানি বলে নিয়েই ফেললাম চাকরিটা। তিন-চার মাস দিব্যি চাকরি করেও ফেললাম। একটু আত্মগ্লানি হত বটে। বি. এসসিটা টেনেমেনে পাশ করেছিলাম। কমপিউটার ভাল না জানলেও ডাটা এন্ট্রি-টেন্ট্রি করতে পারি। ইন্টারনেটও জানি। তারপর ধরুন ব্যাঁটরাশ্রী, জুনিয়ার বডি বিল্ডিং-এ রানার্স, ওয়েট লিফটিং-এ তিনটে জোনাল কনটেস্ট জিতেছি।

তারপর সিকিউরিটি গার্ডের বেশি কিছু হতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে চোখে জল আসত।

আসবারই কথা কিনা। তবে কিনা ওইরকম পেল্লায় বাহারে শরীরখানা নিয়ে পুরুষমানুষ হয়ে কান্নাও কি শোভা পায়?

তা বটে। চেহারাটা যাই হোক, আমি বড় নরম মনের মানুষ। তবে দুঃখের কথা হল সেই চাকরিটাও কপালের দোষে রাখতে পারলাম না। মণিকা সরকারই তাড়িয়ে ছাড়লেন।

মণিকা সরকারটা আবার কে? কেওকেটা নাকি?

না না, কেওকেটা নন, তবে ওই বলাকা হাউজিং-এ ওঁর খুব দাপট। রাহুল সরকারের নাম শুনেছেন কি? বউবাজার আর খিদিরপুরে দু-দুটো গয়নার দোকান। ফুড প্রসেসিং-এর কারখানা খুলেছে রাজারহাটে। পয়সার লেখাজোখা নেই। কমপ্লেক্স-এর জমিটাও তো ওরই শ্বশুরের। তাই মণিকা সরকারের খুব দাপট।

তা তোমাকে কি তার অপছন্দ হল নাকি?

যে আজ্ঞে। ওই পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারটার কোনো মাথামুন্ডু নেই। দেখবেন একটা লোক খুব ফর্সা বলেই তাকে কেউ কেউ অপছন্দ করে। আমি চুপচাপ টুলে বসে থাকি, ভিজিটার এলে নাম টুকে রাখি, যেই ফ্ল্যাটে যাবে সেখানে ফোন করে তবে ঢুকতে দিই। রাতে চারদিকে ঘুরে ঘুরে পাহারা দিই। কোনো ত্রুটি ছিল

না। হঠাৎ একদিন মণিকা সরকার নীচে নেমে গাড়িতে উঠতে গিয়ে আমার দিকে চেয়ে ভ্রূ কোঁচকালেন। তারপর তাঁর পেয়ারের ড্রাইভার রঞ্জনকে জিজ্ঞেস করলেন, ওই গুন্ডার মতো চেহারার ছেলেটা কে রে?

মণিকা সরকারের দোষ নেই বাপু, তোমাকে দেখতে একটু গুন্ডা-গুন্ডা লাগে বটে।

শরীরটা মজবুত বলে বলছেন? আজকাল গুন্ডা হতে গেলে শরীর লাগে না। যত ডাকাত বা গুন্ডা দেখবেন বেশির ভাগেরই তাগড়াই শরীর নেই। শরীর বা গায়ের জোর দিয়ে হবেই বা কি বলুন, পকেটে পিস্তল বা ঝোলায় বোমা, কোমরে ভোজালি বা রামপুরিয়া থাকলেই হল। আর মায়া দয়া হৃদয়দৌর্বল্যগুলো গঙ্গায় বিসর্জন দিয়ে দিলেই গুন্ডা বনে গেলেন আর কী।

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে সেই আমলে গুন্ডাদের বেশ তাকতের দরকার হত।

আজকাল হয় না। একটা খুদে পিস্তলের সামনে একজন বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন বক্সারকেও হাঁটু গেড়ে বসতে হয়। ঠিক কিনা বলুন।

সে তো বটেই।

তবু মণিকা সরকার আমাকে গুন্ডা বলে দেগে রাখলেন। তারপর কমিটির মিটিং ডেকে শুধু চেহারার জন্যই আমাকে বরখাস্ত করার ব্যবস্থা করে ফেললেন।

তুমি প্রতিবাদ করলে না?

প্রতিবাদ! বাপ রে! সামান্য সিকিউরিটি গার্ডের কি আর সেই বুকের পাটা আছে! তবে মণিকা সরকারের প্রায় হাতে-পায়ে ধরে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম।

তাতে কাজ হল?

আজ্ঞে না। উনি বললেন, এই বাড়িতে অনেক ইয়ং মেয়ে থাকে। তাদের সঙ্গে তুমি ঠাট্টা-ইয়ার্কি করেছ, আমার কাছে খবর আছে।

করেছিলে নাকি?

আপনি বয়স্ক গুরুজন মানুষ, মিথ্যে কথা বলব না। আমার চেহারাখানা এরকম বলেই টিনএজার বা ইয়ং মেয়েরা একটু-আধটু নজর দিত আমার দিকে। অনেকে এসে কথা-টথা কইত। ইশারা-ইংগিতও ছিল। আর শুধু ছুকরিরাই বা কেন, বউ-ঝিরাও একটু-আধটু প্রশ্রয় দিতে শুরু করেছিল।

তবে তো মণিকা সরকারের সন্দেহ মিছে নয়।

আজ্ঞে না। আর সিকিউরিটি গার্ডের সঙ্গে বাড়ির বাসিন্দা মেয়েদের নানা কাণ্ডের কথা অনেকবার খবরও হয়েছে।

সে কথা ঠিক। খবরের কাগজে বেশ কয়েকটা ঘটনার কথা পড়েছি বটে।

ওটাই তো কাল হল কিনা।

তোমার নিশ্চয়ই মণিকা সরকারের ওপর খুব রাগ হল!

তা হয়েছিল একটু। তবে আমি কিন্তু আদতে ভীতু মানুষ। লড়াই-টড়াই করতে পারি না, ঝগড়া-কাজিয়াকে ভয় পাই। তা ছাড়া আমার সহায়-সম্বলই বা কী বলুন।

তারপর কী করলে?

তা ওঁরা দয়া করে সাত দিনের সময় দিয়েছিলেন। সেক্রেটারি মদন রায় আমাকে অপছন্দ করতেন না। ডেকে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে বললেন, দেখ, তোমার ওপর যে একটা অবিচার হচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু কমিটির মিটিঙে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে, তাই আমার কিছু করার নেই। সাত দিন সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে একটা কাজ খুঁজে নাও। আর এই সাত দিন মণিকা সরকারের চোখের আড়ালে থেকো। কী বলব মশাই, ওই সাত দিনের মেয়াদই আমার কাল হল।

কেন বলো তো!

আমার বরখাস্তের নোটিশ জারির তিন দিনের মাথায় মণিকা সরকার খুন হয়ে গেলেন।

খুন! বলো কী? এ যে সবেবানেশে ব্যাপার!

যে আজ্ঞে। মণিকা সরকারের ছেলেপুলে বলতে একটা মাত্র মেয়ে। সে বিলেতে পড়াশোনা করে। রাহুল সরকারও প্রায়ই ব্যবসার কাজে বিদেশে যান। ঘটনার দিন তিনি জার্মানিতে ছিলেন। ফ্ল্যাটে শুধু মণিকা সরকার, তাঁর তিনটে কুকুর আর একটা চব্বিশ ঘণ্টার কাজের মেয়ে ছিল। ঘটনাটা ঘটল মাঝরাতে। কেউ কিছু টেরও পায়নি। সকালে ড্রাইভার এসে ডাকাডাকি করায় পুলিশে খবর দেওয়া হল। দরজা ভেঙে ঢুকে দেখা গেল, তিনটে কুকুর, মণিকা সরকার, কাজের মেয়ে সবাইকে গলা কেটে খুন করে রেখে গেছে কেউ।

এ তো বীভৎস ঘটনা।

বীভৎস বলে বীভৎস! সে চোখে দেখা যায় না।

তারপর?

যথা নিয়মে পুলিশ প্রথমেই আমাকে ধরল। কারণ আমাকে চাকরি থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। দ্বিতীয় কারণ আমার চেহারা গুন্ডার মতো। পুলিশ নিয়ে গিয়ে থানায় জবর পেটাল স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্য। ব্যায়াম-ট্যায়াম করলেও মারধর বিশেষ খাইনি কখনও। তাই মারের চোটে মাঝে মাঝে ইচ্ছে হচ্ছিল খুনের দায়টা স্বীকার করেই নিই, তাতে যদি মারধর বন্ধ হয়।

খুনটা কি তুমি করোনি?

কেন, আপনার কি আমাকে সন্দেহ হচ্ছে?

আরে না। নিশ্চিন্ত হতে চাইছি আর কী।

না মশাই, খুনের কথা আমার মনে কখনও উদয়ই হয়নি। আর চাকরিটাও তো বিশেষ সম্মানজনক বা লোভনীয় নয়। পাঁচ হাজার টাকা বেতনের চাকরির জন্য খুন করে নাকি কেউ?

তা বটে। তা শেষে কী হল?

আমার বরাত এমনিতে মোটেই ভাল নয়, কিন্তু এই ঘটনার পর যখন খুব ফেঁসে গেছি তখন আমার ভাগ্য একবার চিড়িক দিল।

কীরকম?

কমপ্লেক্সের তিনতলায় থাকেন পারুল গাঙ্গুলি। বয়স পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর। মোটাসোটা মানুষ, তার ওপর হাঁটুর ব্যথায় কাতর। তিনতলা থেকে নামতে-উঠতে তাঁর বড় কষ্ট।

কেন, বাড়িতে লিফট নেই?

তা কেন থাকবে না? তবে পারুল মাসিমার কস্ট্রোভোবিয়া, লিফটে উঠতে পারেন না, দম আটকে আসে। তাই হেঁটেই ওঠেন, কিন্তু একতলা থেকে তিনতলায় উঠতে তাঁর প্রায় আধঘণ্টা থেকে চল্লিশ মিনিট সময় লাগে। ব্যথায় কাতরাতে কাতরাতে কষ্ট করে উঠতে হয়। সেই দেখে আমি একদিন মাসিমাকে বললাম, আমি আপনাকে পাঁজাকোলা করে তুলে দিচ্ছি, আসুন। উনি আঁতকে উঠে বললেন, ও বাবা, তুমি আমাকে ফেলে দেবে বাপু। এই বয়সে হাত-পা-মেরুদণ্ড ভাঙলে রক্ষে নেই। আমার ওজন তো কম নয়। উনি রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু একদিন শরীরটা বোধহয় খারাপ ছিল। সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে খুব হতাশ চোখে ওপরের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেদিন আর আমি ওঁর আপত্তি শুনিনি। গিয়ে বললাম, যদি আপনাকে ফেলে দিই তাহলে ছাদে উঠে ঝাঁপ দেবো। জোরাজুরি করেই সেদিন পারুল মাসিমাকে পাঁজাকোলে তুলে নিয়ে তরতরিয়ে সিঁড়ি ভেঙে উঠে তিনতলায় নামিয়ে দিলাম। মাসিমা অবাক হয়ে বললেন, কী করে তুললি বাবা, একটুও টের পেলুম না তো! ঘরে ডেকে নিয়ে সেদিন মিষ্টি-টিষ্টি খাওয়ালেন। তারপর থেকে রোজ একবার করে মাসিমাকে তুলে দিতাম।

বকশিশ দিলেন না?

বকশিশ কী বলছেন? উনি তো মাসিক তিন হাজার টাকায় আমার সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে চেয়েছিলেন। আমি বললুম, মাসিমা, টাকায় আমি কোনো আনন্দ পাই না। আপনার হাসিমুখ দেখলেই আমি খুশি।

তাহলে টাকাটা নিলে না?

দূর! টাকা নিলে সেটা চাকরির মতো হয়ে দাঁড়াবে। তাতে দায়বদ্ধতা থাকবে, রুটিন হয়ে যাবে, আনন্দ থাকবে না। তবে মাসিমা আমাকে মাঝে মাঝে ডেকে ভালোমন্দ খাওয়াতেন। একটা ভাল মোবাইল ফোন আর ফুলহাতা সোয়েটার দিয়েছিলেন। কিন্তু আমার জানা ছিল না যে মাসিমার স্বামী ছিলেন মুম্বই হাইকোর্টের একজন জজ, এক ছেলে উইং কমান্ডার, আর এক ছেলে বিদেশে বড় কাজ করে। মাসিমা একাই থাকেন, সবসময়ের একটা কাজের মেয়ে আছে। আর সম্পর্কে এক নাতনি মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যায়। পরে জেনেছি মাসিমা নিজেও একসময়ে ওকালতি করতেন। তা আমাকে পুলিশে ধরার পর যখন চোখে অন্ধকার দেখছি তখন ওই পারুল মাসিমাই আমাকে উদ্ধার করলেন। তিনি থানায় এসে এজাহার দিলেন, ঘটনার দিন বাথরুমে পড়ে গিয়ে তাঁর গোড়ালি মচকে গিয়েছিল। আমি গিয়ে তাঁর গোড়ালি মাসাজ করি এবং সারারাত তাঁর ব্যথা কমানোর জন্য সেঁকতাপ দিই।

সত্যি নাকি হে?

আজ্ঞে একেবারেই না। নীচেই ডিউটি ছিল আমার। তবে চাকরি চলে যাচ্ছে বলে আমি মনের দুঃখে সেদিন ডিউটি না করে মিটার ঘরে শুয়ে ঘুম দিচ্ছিলাম।

ভদ্রমহিলা তাহলে তোমাকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যে কথা বলেছিলেন?

যে আজ্ঞে। খুনটা হয়েছিল রাত দুটো থেকে তিনটের মধ্যে। পারুল মাসিমা জোরের সঙ্গে পুলিশকে জানিয়ে দেন যে, সে রাতে গোড়ালির ব্যথায় তাঁর ঘুম হয়নি। এবং আমি সারাক্ষণ তাঁর চোখের আড়াল হইনি। তাঁর কাজের মেয়ে কাজলও পুলিশকে একই কথা বলেছিল। সলিড অ্যালিবাই থাকায় এবং পারুল গাঙ্গুলির মতো অভিজাত মহিলা সাক্ষী দেওয়ায় পুলিশ আমাকে রেহাই দিল।

যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে তাহলে!

গল্পের আরও একটু বাকি আছে।

তাই নাকি? বলো তো বাপু, শুনি।

ছাড়া পাওয়ার পর হাউজিং-এ আমার জিনিসপত্র নিয়ে কেটে পড়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ভারী অবাক কাণ্ড। সিকিউরিটির প্রিয়তোষ আমার খুব বন্ধু। সে আমাকে একটা রেজিস্ট্রি চিঠি দিল। খুলে দেখি একটা কোম্পানি আমাকে তাদের নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেটরের চাকরি দিয়েছে। বেতন চল্লিশ হাজার টাকা।

বলো কী হে? কোন কোম্পানি?

র‍্যান্ডম রাইটস। জন্মে নামই শুনিনি, দরখাস্তও করিনি।

বটে! এ তো আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ হে!

অনেকটা সেইরকমই বটে। ওদিকে পারুল মাসিমা আমাকে ডেকে পাঠিয়ে সামনে বসিয়ে গোল গোল চোখ করে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁ রে, তোর সঙ্গে মণিকার কী সম্পর্ক ছিল? আমি তো হাঁ। সম্পর্কের তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু মাসিমা নানারকম কথা জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। ঘরে ডেকে পাঠাত কি না, গোপনে দেখা করতে বলত কি না, এইসব। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। অবশেষে মাসিমা বলেই ফেললেন, মণিকা সরকার নাকি আমার প্রেমে পড়েছিল। আমি বজ্রাহত। আমার বয়স মাত্র পঁচিশ আর মণিকা সরকারের বিয়াল্লিশ। মাসিমা বললেন, ওরে বয়সটা বড় কথা নয়। ওর হল শরীরের খিদে। আমাকে তো প্রায়ই তোর কথা জিজ্ঞেস করত। তখনই বুঝতে পেরেছিলাম, ওর মতলব ভাল নয়। রাহুল তো একটা ভেড়া। টাকা রোজগার করা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সেই ভুঁড়ি, মাথায় টাক, ব্লাড সুগার, হাই প্রেশার। তাই মণিকার দরকার পড়েছিল তোর মতো কাঁচা বয়সের জোয়ান ছেলের। হ্যাঁ রে, তুই সত্যিই ওকে খুন করিসনি তো? শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। বললুম, না মাসিমা, আপনার পা ছুঁয়ে বলতে পারি।

তারপর কী হল? সেই চাকরিটা?

যে আজ্ঞে। র‍্যান্ডম রাইটসের অফিস পার্ক স্ট্রিটে। গিয়ে খোঁজখবর নিতেই জানা গেল, ওটা মণিকা সরকারের কোম্পানি।

বলো কী? মণিকা তোমাকে চাকরি দিয়েছিল?

হ্যাঁ। মতলবটা পরিষ্কার। হাউজিং থেকে আমাকে হটানো, নিজের অফিসে চাকরি দিয়ে হাতে রাখা এবং ইত্যাদি। বুঝতেই পারছেন।

তবে খুনটা করল কে?

পুলিশ ঢুঁড়ে বের করল। খুনি মণিকার লাভার, ওরই অফিসের আর এক পার্টনার বাচ্চু সিং। বাচ্চু স্বীকার করেছে, মণিকা অন্য পুরুষে আসক্ত হয়েছে টের পেয়ে—

বুঝেছি। তা তুমি এখন করছটা কী?

সেই চাকরিটাই করছি মশাই। র‍্যান্ডম রাইটসে। নেটওয়ার্ক কো-অর্ডিনেটর। চল্লিশ হাজার টাকা মাইনে।

—

[পৌষ ১৪১৯]

একা দোকা

আপনার সিঁথিতে সিঁদুর দেখছি। তার মানে আপনি বিবাহিতা।

না। সিঁদুরটা আমার ক্যামোফ্লেজ।

তার মানে?

সিঁদুর থাকলে লোভী পুরুষরা বড় একটা ছোঁক ছোঁক করে না।

তাই বুঝি? কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা তো সে কথা বলে না। বিবাহিতা বা কুমারী কোনো মহিলাই খুব একটা নিরাপদ নয়।

সে কথা অস্বীকার করছি না। তবু মুষ্টিমেয় কিছু পুরুষ লম্পট আছে যারা সিঁদুর দেখলে তফাতে থাকে। তার ওপর বিয়ের প্রস্তাব পেয়ে পেয়ে আমি ক্লান্ত। তাই একদিন সিঁদুর পরে ব্যাপারটা ঠেকিয়ে রাখলাম।

আপনি কি বিবাহে আগ্রহী নন?

ঠিক তাও নয়। কিন্তু একটা মুশকিল হল, আমাদের আর্থিক অবস্থা ভাল এবং আমি নিজে একটি বড় ফ্যাশন হাউস কাম বিউটি পার্লার চালাই বলে বিস্তর মানুষ জ্বালাতন করে খায়। একসময়ে তো দিনে দুটো-তিনটে করে প্রস্তাব আসত।

খানিকটা বুঝলাম। আমি এই জায়গায় নতুন, আপনার সোশ্যাল স্ট্যাটাস জানি না। তাই ভাবছিলাম আমি কি আজ এই শহরের কোনো গণ্যমান্য মহিলাকে লিফট দিচ্ছি!

গণ্যমান্য বললে বাড়াবাড়ি হবে। আমি নিজের কাজ নিয়ে থাকি। তবে আমার বাবাকে শহরের সবাই চেনে। মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। তা ছাড়া বাবা একজন সাকসেসফুল বিজনেসম্যানও বটে। অমল চ্যাটার্জি বললে সবাই চিনবে।

মাই গড! অমল চ্যাটার্জির নাম আমিও জানি।

আপনি এই শহরে কতদিন হল এসেছেন?

আজকের দিন ধরলে মোটে সাতদিন।

কী করেন বলুন তো!

আমি খুব সামান্য একটা কাজ করি। ইনসিওর‍্যান্স-এর অ্যাসেসর। বিমাকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করাই আমার কাজ।

ওঃ, তার মানে আপনি কাজে এসেছেন এবং কাজ সেরে চলে যাবেন!

আজ্ঞে হ্যাঁ। আমি হোটেলে আছি।

কাদের অ্যাসেসমেন্ট করছেন বলুন তো!

বিদ্যুৎ পটেল নামে একজন মার্চেন্টের!

পটেল সাহেব বিশাল মার্চেন্ট। চারটে ওয়্যার হাউস।

হ্যাঁ। তারই একটা মাস দুয়েক আগে পুড়ে যায়। উনি বহু টাকা ক্লেম করেছেন।

কত টাকা?

চল্লিশ কোটি।

আপনারা দেবেন?

সেইটে অ্যাসেস করার জন্যই আসা।

পটেল সাহেব আপনাকে পারসেন্টেজ দেবেন না?

হাসালেন ম্যাডাম। আমার কাজে পারসেন্টেজ তো আছেই। তা ছাড়া অনেক সময়ে প্রাণের ঝুঁকিও থাকে। অ্যাসেসমেন্ট ক্লেম্যান্টের মনঃপূত না হলে প্রাণের ভয়ও দেখায়।

তার মানে আপনার রোজগার খুবই ভাল। তাই না?

খারাপ নয়। কোম্পানি আমাকে ভদ্রস্থ বেতন দেয়। ফলে আমি এই ছোটো ন্যানো গাড়িটা কিনতে পেরেছি।

ন্যানো কেন, আপনার যা রোজগার তাতে মার্সিডিস কেনা উচিত।

ম্যাডাম, মার্সিডিস কিনতে গেলে যে হাত নোংরা করতে হয়। বলছি না যে আমি শুচিবায়ুগ্রস্ত লোক। তবে মা-বাবার শিক্ষাটাও তো উপেক্ষা করতে পারি না। যা আমার পরিশ্রমের অর্জন নয় তা না নিতেই আমাকে তাঁরা শিখিয়েছেন।

সংসার চালাতে হলে শুধু বেতনের টাকাতে কি হয়?

হয়ে যায়। একটু বুদ্ধি করে চলতে হয় এই যা। আর আমার সংসারও তেমন কিছু বড় নয়। মা, বাবা, এক বোন আর ছোটো ভাই। মোটামুটি সকলেই রোজগেরে। শুধু ভাই পড়ছে, আই আই টি-তে ফাইন্যাল ইয়ার।

তার মানে বিদ্যুৎ পটেলের কপাল খারাপ। ওয়্যার হাউসের ক্ষতিপূরণ বাবদ লোকটা যা পেতে পারত তা বোধহয় পাবে না, তাই না?

প্রকৃত ক্ষতিপূরণ অবশ্যই পাবে।

আপনি বেশ স্টাবোর্ন, তাই না?

একদম না। স্টাবোর্ন মানে যদি জেদি বলেন তবে আমি তা নই। খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন আমি কারও সঙ্গে ঝামেলা পাকাই না। বোঝানোর চেষ্টা করি। এবং বিনীতভাবে অক্ষমতা জানিয়ে দিই। কিন্তু এসব কথা আমরা আলোচনা করছি কেন? বরং আপনার কথা বলুন। আপনার গাড়ি খারাপ না হলে এবং বাই চান্স আমি অকুস্থলে হাজির না হলে আপনার সঙ্গে পরিচয়ই হত না।

হত। এত ছোটো শহরে পরিচয় না হলে কি উপায় আছে?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার মেয়াদ তো আর মাত্র কয়েকদিনের।

এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ?

আমাদের টিম বেশ বড়সড়। সকলেই অভিজ্ঞ, দক্ষ। কিন্তু এসব অফিসিয়াল কথাবার্তা বড্ড আন-ইন্টারেস্টিং।

আমার কাছে আন-ইন্টারেস্টিং লাগছে না। আমার বাবা এবং আমিও ব্যবসা করি। ইনসিওরেন্সের কাছে আমাদেরও টিকি বাঁধা। আর পটেলকাকু আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ। ওয়্যার হাউসে অনেক সফিস্টিকেটেড মেশিন্যারিজ ছিল বলে শুনেছি। উনি খুব টেনসড হয়ে আছেন।

হ্যাঁ। হসপিট্যাল ইকুইপমেন্টস। ওঁর উদ্বেগের কিছু নেই। আমরা ওঁর ইমপোর্টের কাগজপত্র দেখছি, পোড়া মেশিনগুলোও দেখা হচ্ছে। রুটিন ওয়ার্ক, অ্যাসেসমেন্ট যথার্থ হবে বলেই মনে করি। আপনি অযথা পটেলবাবুর কথা ভেবে টেনশন নেবেন না।

টেনশন! না আমার টেনশন কেন হবে? শুধু ভাবছি পটেলকাকুর দুটো হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেছে তো—।

হাসালেন। বিদ্যুৎ পটেলের বংশানুক্রমিক ব্যবসা। কত ধাক্কা খেয়ে ওঁরা পোক্ত হয়েছেন তা ভাবতেও পারবেন না। সামান্য কমপেনসেশনের জন্য ওঁর হার্ট অ্যাটাক হবে বলে মনে হয় না। চল্লিশ কোটি আমাদের কাছে যতটা বিগ মানি, ওঁদের কাছে ততটা নয়। কিন্তু এটা আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে কেন একটু বলবেন? আপনি যে সম্ভাব্য বদমাশদের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে সিঁদুর পরেন, এটা বরং একটা আলোচ্য বিষয় হতে পারে। বাই দি বাই, আপনাদের এই শহরে কি সমাজবিরোধীদের একটু বাড়াবাড়ি আছে?

আছে। এটা খনি অঞ্চল। নানারকম বাজে লোকের আড্ডা। নেশাভাঙেরও খুব বাড়াবাড়ি।

রেপ কেস?
রেট ইজ হাই।
কিন্তু আপনি তো স্বয়ং মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের মেয়ে। আপনার ভয়টা কিসের?
ভয়টা আমার নয়, আমার মায়ের। তিনি ভীষণ ভীতু মানুষ।
তাই বুঝি?
হ্যাঁ।
আপনার গাড়ি কি সবসময়ে আপনি নিজেই চালান?
গাড়ি চালাতে আমি ভালবাসি।
বেশ দামি গাড়ি আপনার।
গাড়ির বড্ড শখ। মাঝে মাঝে ধারকর্জ করে কিনে ফেলি।
কোথায় গিয়েছিলেন? লং ড্রাইভে?
সেরকমই ধরে নিন।
লং ড্রাইভে একা তো কেউ যায় না। সঙ্গী থাকে।
আমার কোনো সঙ্গী নেই।
আপনি, বলতে নেই—বেশ সুন্দরী, স্মার্ট অ্যান্ড কোয়াইট অ্যাডোরেবল। সঙ্গী নেই কেন?
জোটেনি। ব্যবসা করতে গিয়ে সব ফাইনার ফিলিংস হারিয়ে গেছে।
আপনি একটু অদ্ভুত আছেন কিন্তু।
তা হবে। অদ্ভুত কি আপনিও নন?
আমি অদ্ভুত কেন হব?
যে এক কোটি টাকার অফার ফিরিয়ে দেয় সে কি অদ্ভুত নয়?
জানেন দেখছি।
জানি। এক কোটি আপনার, আরও এক কোটি আপনার টিমের। টাকাটা কি খুব কম?
না। অনেক বেশি। কোনো কিছুরই বাড়াবাড়ি ভাল নয়।
কী বলব বুঝতে পারছি না। আসলে—
আসল কথাটা আমি আন্দাজ করতে পারি। আপনার মিৎসুবিশি গাড়িটা খারাপ হয়নি। প্ল্যানমাফিক আপনি আমার গাড়িতে লিফট নিয়ে উঠেছেন। আপনার উদ্দেশ্য পটেলবাবুর কমপেনসেশন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা এবং সম্ভব হলে আমাকে কড়কে দেওয়া। তাতে কাজ না হলে বিদ্যুৎ পটেলের গুন্ডারা তৈরি আছে। ঠিক তো!
ঠিক। কী করে বুঝতে পারলেন জানি না। আপনি পালাচ্ছেন না কেন?
পালাবো কেন? এ কাজে বিপদ আছে জেনেই তো কাজে নেমেছি!
গুন্ডাদের ভয় পান না?
কে না পায়?
তবু পালাতে চান না?
আমি গেলে আর একজন আসবে।
আসুক। সে ঘুষ খেয়ে চল্লিশ কোটি অ্যাপ্রুভ করে দেবে।
তা হয়তো দেবে।
তাহলে দয়া করে পালান। প্লিজ! পায়ে পড়ি।
পালাবো! একা!
একা নয় তো দোকা কোথায় পাবেন?

ভাবছি। দোকা হলে ভেবে দেখতে পারি।

—

[পৌষ ১৪২০]

অপেক্ষা

আপনি কিন্তু স্যার, আর আগের মতো নেই।

সে তো তুমিও আর আগের মতো নেই। কেউই আগের মতো থাকতে পারে না নবু, তাদের বয়স বাড়ে, নানা অভিজ্ঞতা হয়, পদোন্নতি বা ফ্রাস্ট্রেশন ঘটে। পাল্টে যাওয়াই নিয়ম।

সে তো ঠিক কথা স্যার। আমারও দু-একটা চুল পেকেছে, ওজন বেড়েছে, আর লজ্জার সঙ্গে বলি, একটা প্রোমোশনও হয়েছে।

তবে?

তবু এই পাঁচ বছরে আপনার পরিবর্তনটা একটু অন্যরকম।

কীরকম বলো তো! আমি খুব একটা মোটা হয়েছি নাকি?

না স্যার, তেমন কিছু নয়। দুই-এক কেজি গেন করেছেন হয়তো।

হুইস্কি খেলে, সুখে থাকলে, একসারসাইজ না করলে দু-চার কেজি ওজন তো বাড়তেই পারে। খুব বেঢপ আর আনফিট না হলেই হল।

তা তো বটেই। না স্যার, আপনি একদম বেঢপ নন। বরং দিব্যি টান চেহারা। মাঝখানটা যা একটু সামনের দিকে ঠেলে এসেছে।

পেট তো! বাঙালি তার পেটটাকে কোনোদিনই তেমন বাগে আনতে পারেনি, বুঝলে? তাদের শরীরের ধাতটাই ওরকম। তবে হ্যাঁ, ভাল কথা, আজ রাত্রে তোমাদের ডাকবাংলোয় কী রান্না হচ্ছে বলো তো!

মুর্গি স্যার। সঙ্গে ছোলার ডাল আর বেগুন ভর্তা। শেষ পাতে ফ্রুট স্যালাড আর এখানকার বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা।

ধুস! সেই একঘেয়ে মুর্গি। মুর্গি খেতে খেতে জিভে চড়া পড়ে গেল। শোনো, রাত আটটায় আমার দুজন বন্ধু আসবে। রইস লোক। মৃদঙ্গ মিত্র আর বিপুল সমাদ্দার, চেনো তো।

আরিববাস! চিনবো না? বলেন কী? এই শহরের ওরাই তো দণ্ডমুণ্ডের কর্তা!

একটু ককটেল হবে। তাই সঙ্গে চিজ পকোড়া, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই আর পেঁয়াজি থাকলে ভাল হয়।

ওসব বন্দোবস্ত আছে স্যার। ফ্রেঞ্চ ফ্রাইয়ের জায়গায় ফিশ ফিঙ্গার চলবে তো স্যার? আর কুড়মুড়ে বেবি কর্ন।

তোফা। দিব্যি চলবে। হ্যাঁ, তুমি তোমার প্রোমোশনের কথা কী যেন বলছিলে?

ও কিছু না স্যার। লোয়ার থেকে আপার ডিভিশন। চাকরিটা আপনিই দিয়েছিলেন কিনা, তাই বললাম।

আরে, আমি চাকরি দেওয়ার কে? তুমি তো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেই চাকরি পেয়েছো। আমি শুধু রেকমেন্ড করেছি।

সেটাও তো কম নয় স্যার। রেকমেন্ড ব্যাপারটা তো আর তুচ্ছ জিনিস নয়। বিশেষ করে আপনার মতো ভি আই পি যখন করে।

কৃতজ্ঞতা এক মস্ত দায়। ওটা থেকে মুক্ত হও, নইলে শিরদাঁড়া কখনও সোজা হবে না।

শিরদাঁড়ার ব্যাপারটা আমাদের জাতীয় রোগ স্যার। তবে স্যার, আমি তো আর অকৃতজ্ঞ নই।

তুমি ভাল ছেলে নবু। ব্রাইট বয়। আমার সুপারিশ ছাড়াই এই চাকরি তুমি ঠিক পেয়ে যেতে।

দিদিমণিও তাই বলেন স্যার।

দিদিমণি! দিদিমণি মানে?

দিদিমণি মানে অধরা দিদিমণি স্যার।

মাই গড! অধরা! সে কী বলেছে তোমাকে?

বলেছেন, চাকরি নাকি আমার এমনিই হত। সেটা উনি বাড়িয়ে বলেছেন স্যার। ক্যান্ডিডেটদের মধ্যে এমন তিনজন ছিল যাদের বি. এ., বি. কমে আমার চেয়ে ভাল রেজাল্ট।

শুধু রেজাল্টে কি সব কিছু হয়? তাহলে মার্কশিট দেখেই চাকরি দিয়ে দেওয়া যেত। সে কথা থাক। অধরা এখন কোথায় আছে?

কেন স্যার, সেই গাঁয়ের বাড়িতেই।

গাঁয়ের বাড়িতে! সেটা কেন?

তা কী করবেন তিনি বলুন।

কিছু করছে না?

হ্যাঁ স্যার, করছেন বৈকি!

কী করছে অধরা?

বাবা মারা যাওয়ার পর বড্ড কষ্টে পড়েছিলেন ওঁরা। যদিও সংসারে শুধু উনি আর ওঁর মা। তবু, ওঁর বাবা তো কিছু রেখে যাননি। শুধু ওই বাড়িটা ছাড়া। কয়েক বছর খুব কষ্টে কেটেছে। তারপর একটু একটু করে—

দুঃখের কাহিনি তো! ওগুলো সব একইরকম।

হ্যাঁ স্যার, তা ঠিক। দুঃখের কাহিনিতে খুব একটা ভ্যারিয়েশন থাকে না।

দুঃখ কি এখনও চলছে?

স্যার, মানুষের নানারকম দুঃখ থাকে। গরিব হওয়ার দুঃখ ছাড়াও আরও কত দুঃখ আছে।

ঘড়ির দিকে একটু খেয়াল রেখো নবু। কটা বাজে?

শীতকালে টক করে অন্ধকার হয়ে যায় স্যার, এখন মাত্র পৌনে ছটা। মৃগাঙ্কবাবু আর বিপুলবাবু দুজনেরই আসতে দেরি আছে স্যার। আজ এক মিনিস্টার এসেছেন। সাতটা থেকে মিটিং।

কে মিনিস্টার? আমি জানতাম না তো!

আমিও ঠিক জানি না। বোধহয় প্রতিমন্ত্রী-টন্ত্রী হবেন। তবে হেভি ভি আই পি স্যার। ওঁদের আসতে রাত হবে।

ভাল জ্বালা হল তো! মিনিস্টার আবার এই ডাকবাংলোয়—?

না স্যার। উনি আজ রাতের ট্রেন ধরে ফিরে যাবেন। রাত এগারোটায় ট্রেন।

বাঁচালে। আখাম্বা এক মিনিস্টার এসে জুটে গেলে ভারী অসোয়াস্তি হয়। হ্যাঁ, কী যেন কথা হচ্ছিল।

অধরা দিদিমণিকে নিয়ে কথা হচ্ছিল স্যার।

অধরা! হ্যাঁ, অধরার কী কথা যেন?

আজ্ঞে তেমন কিছুই না। দুঃখেরই কাহিনি স্যার। তবে কিনা—

তবে কিনা?

ভাবছি, বললে আবার আপনি চটে যাবেন কিনা। দিদিমণিকে তো আপনি তেমন পছন্দ করতেন না স্যার।

না, না, ব্যাপারটা ঠিক তা নয় নবু। অধরাকে আমি একটু বেশিই তো পছন্দ করতাম। কিন্তু কোনো কারণে সম্পর্কটা বিটার হয়েছিল।

হ্যাঁ স্যার। জানি।

কতটা জানো?

বেশি কিছু নয় স্যার। কানাঘুষো যা শুনেছি।

কানাঘুষো? ভেরি ব্যাড। কী-রকম কানাঘুষো?

আপনাদের ইগো ক্ল্যাশ করে যায়। দিদিমণির বাবা আপনাকে খুব অপমান করেছিলেন, আর দিদিমণি তাঁর বাবাকেই সাপোর্ট করেছিলেন।

হুঁ। ওইরকমই কিছু।

কানাঘুষো বলতে এটুকুই স্যার, আর কিছু নয়। তবে দিদিমণি বিয়ে করলেন না কিন্তু। কুমারীই রয়ে গেলেন। এখন তো বোধহয় আটত্রিশ বা ঊনচল্লিশ বছর বয়স।

বিয়ে করেনি কেন জানো?

জানি না স্যার। তবে ওঁর বিয়ে করার সময়ই বা কোথায় বলুন! অত বড় কারবার চালাচ্ছেন তো!

কারবার! কিসের কারবার?

আপনি জানেন না বুঝি স্যার?

না তো!

ওঁর কারখানার নাম বেবিজ ডে অ্যান্ড নাইট। বাচ্চাদের পোশাক তৈরি হয়। তৈরি করে গাঁ-গঞ্জের মেয়ে আর ছেলেরা। নানা জায়গা থেকে ফেব্রিক আসে, বিদেশ থেকেও। টপ কোয়ালিটি মেটেরিয়াল স্যার। ডিজাইনও চমৎকার। উনি নিজেই করেন, আরও ডিজাইনার রেখেছেন। মাল পড়তে পারে না। শুনি কয়েক কোটি টাকা টার্নওভার।

বলো কী হে?

আজ্ঞে। মিনিস্টার তো এসেছিলেন ওঁকে ভিজিট করতেই।

অধরাকে? অবিশ্বাস্য!

কারখানা দেখলে আপনি আরও অবাক হবেন। দশ একরের ওপর জমি, মডার্ন গোডাউন, সফিস্টিকেটেড ফরেন মেশিন। আবার হাতের কাজও আছে। সারা দেশে চালান যায়।

আমার মাইনে কত জানো নবু?

না স্যার।

না জানলেও চলবে।

টাকা তো ওঁর মিশন নয় স্যার। দিদিমণি আসলে নতুন কিছু করতে চাইতেন। বাচ্চাদের তো খুব ভালবাসেন, ওই প্যাশনটা দিয়েই শুরু করলেন। তারপর যা ঘটল তাকে আমরা বলি ভাগ্য।

বোকারা তাই বলবে।

আপনি কী বলেন স্যার?

আমি বলি ককটেলটা ক্যানসেল করে দাও।

কেন স্যার?

আমি আজ একটু সিরিয়াসলি ভাবব। মদ খেলে চিন্তাটা কনসেন্ট্রিক হয় না। বাবুরা এলে বলে দিও, আমি আজ ভাল বোধ করছি না বলে কারও সঙ্গে দেখা করব না।

ঠিক আছে স্যার।

আর নবু!

হ্যাঁ স্যার।

কাল আমি অধরার সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই। একটা ব্যবস্থা করে দেবে?

নিশ্চয়ই স্যার। হয়ে যাবে।

ও হয়তো দেখা করতে চাইবে না। না?

উনি দেখা করবেন স্যার।

কী করে বুঝলে?

ওই দেখাটুকুর জন্যই যে পাঁচ বছর অপেক্ষা করছেন!

—

[পৌষ ১৪২১]

বয়স

শুনুন! আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

রূপ রায় দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে চেয়ে একটি অল্পবয়সি ছিপছিপে মেয়েকে দেখতে পেলেন। ছিপছিপে না বলে রোগাই বলা ভাল। রংটা ফর্সা, মুখখানা বেশ ধারালো, চোখে বুদ্ধির ঝিকিমিকি আছে। খুব সুন্দরী কিছু নয়, তবে খারাপও নয়। রূপ মহিলাদের সাহচর্য বিশেষ পছন্দ করেন।

বললেন, কী কথা বলো তো!

মেয়েটা কাছে এসে বলল, শুনলে আবার রেগে যাবেন না তো!

তুমি কি আমার নিন্দেমন্দ করবে? তা করতে পারো। ওতে আমার তেমন রাগ হয় না।

না, এটা ঠিক আপনার নিন্দে নয়। তবে বলবো, আপনি একটা ভুল করেছেন। বিচ্ছিরি ভুল। আর তার জন্য আমি সাফার করছি।

কী আশ্চর্য! তোমাকে তো আমি জীবনে এই প্রথম দেখলাম! আমার ভুলের জন্য তুমি সাফার করবে কেন?

আপনি তো আর সবজান্তা নন, বুঝিয়ে না বললে ব্যাপারটা আপনার মগজে ঢুকবে কী করে? আর কবিরা যে বাস্তব জগতে একটু বোকা হয় তা সবাই জানে।

তাই বুঝি! তোমার কবিদের সম্পর্কে তো অদ্ভুত ধারণা। সব কবিই কিন্তু একরকম হয় না। আমার তো বাস্তববোধ বেশ টনটনে। বলে রূপ রায় একটু হাসলেন। ফচকে মেয়েটার কথায় তাঁর তেমন রাগ হচ্ছিল না। মেয়েটা, হতে পারে, একটু পাগলি ধরনের। কথায় আঁটবাঁধ নেই, যা খুশি বলে দেয়। এ ধরনের মানুষকে রূপ রায় খুব একটা অপছন্দ করেন না। তিনি নিজেও খানিকটা এরকমই। এই তো দিন চারেক আগে তাঁর এক সম্পাদক বন্ধু তাঁর বাড়িতে সস্ত্রীক বেড়াতে এসে অনেক রাত পর্যন্ত ভ্যাজর ভ্যাজর করছিল। তাঁর তেমন ভাল লাগছিল না। হঠাৎ সটান বলে দিলেন, আপনি এবার বাড়ি যান তো, আমি এখন খাওয়া-দাওয়া করবো। অনেক রাত হয়েছে। বন্ধুটি অপ্রস্তুত হয়ে ক্ষমা-টমা চেয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। তাঁর বউটির তো লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে উঠেছিল। ওরা আর আসেনি। যোগাযোগও করছে না।

মেয়েটা বলল, আপনার সম্পর্কে আমি জানি মশাই। কিন্তু অত কথার তো দরকার নেই। আপনার ভুলটার কথাই বরং বলি। বলবো?

হ্যাঁ হ্যাঁ, গো অ্যাহেড।

আমার হিসেবমতো আপনার বয়স এখন পঁচাত্তর।

হ্যাঁ, তাতে ভুলটা কোথায়?

ওটাই তো ভুল।

তার মানে?

তার মানে আপনি ভুল করে পঞ্চাশ বছর আগে জন্মেছেন। আপনার আরও পঞ্চাশ বছর পরে জন্মানো উচিত ছিল।

তার মানেটা কী হল, বুঝলাম না তো!

বুঝিয়ে বলার জন্যই তো আপনাকে আটকেছি। শুনেছি, আপনি বেশ রাগি মানুষ। কথাটা বললে আবার থাপ্পড় মেরে বসবেন না তো!

রূপ রায় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, তোমাকে কে বলেছে যে আমি লোককে মারধর করি!

বাজারে গুজব তো তাই।

ওসব গুজবে কান দিও না।

সবাই বলে আপনি খুব অ্যাগ্রেসিভ মানুষ।

অ্যাগ্রেশন ইজ এ কাইন্ড অফ ডিফেন্স। আমার মারধর করার অভ্যাস নেই, তবে মাঝে মাঝে স্পষ্ট করে মনের ভাব জানিয়ে দিই, নইলে অনেক কমপ্লিকেশন তৈরি হয়। এবার তোমার সমস্যার কথাটা বলে ফেল।

আমার বয়স কত বলুন তো।

কত আর! ষোলো-সতেরো হবে বোধহয়!

তাই। আমি সতেরো। চোদ্দো বছর বয়সে আমি প্রথমে আপনার কবিতার এবং তার পরেই কবিরও প্রেমে পড়ে যাই। ঠিক করে ফেলি, কবি রূপ রায় ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতেই পারা যাবে না। কী কাণ্ড বলুন তো? তখনও রূপ রায়ের বয়স সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না। আপনার নামটাও যথেষ্ট ভুবিয়াস। রূপ রায় তো ছেলে-ছোকরার নাম। পরে যখন জানলাম আপনার বয়স সত্তরের ওপর তখন ভীষণ রাগ হল আপনার ওপর। কেন বুড়ো হতে গেলেন বলুন তো!

রূপ রায় মেয়েদের, বিশেষ করে তরুণী আর কিশোরীদের আগ্রহ পছন্দ করেন। তাঁর বেশ কয়েকটা অ্যাফেয়ার ছিল। তবে অল্প বয়সে। এখন আর তেমন জোটে না, বয়সটাই যত বাধা। কিন্তু ভিতরের প্রেমিকটা এখনও বুড়ো হয়ে যায়নি।

রূপ রায় ভ্রূ তুলে স্মিত মুখে বললেন, ও! তাই বুঝি!

শুনুন, আমি বলছি, পরের জন্মে আর এরকম ভুল করবেন না। এত্ত বেশি আগেভাগে জন্মাবেন না। ঠিক সময়মতো জন্ম নেবেন, যাতে আমি আপনার নাগাল পেতে পারি।

কিন্তু আমি তো জন্মান্তরে বিশ্বাস করি না।

সে তো আমিও করি না। জন্মান্তর যদি থাকেও, তাতে কী লাভ বলুন! আমি তো পরের জন্মে বুঝতেও পারবো না যে আমি আগের জন্মের নন্দিনী, আর আপনাকেও রূপ রায় বলে চিনতে পারবো না।

ঠিক কথা। কিন্তু জন্মান্তর ব্যাপারটাই ধাপ্পা।

ঠিক জানেন?

জানি বলেই তো বলছি।

নাস্তিকদের একটা দোষ কী জানেন? তারা বড্ড সবজান্তা হয়।

সবজান্তা না হলেও জন্মান্তর ব্যাপারটার লজিক নেই।

আমি যতদূর জানি আপনি বি. কম পাশ। লজিক কি পড়েছেন?

জীবনের সব যৌক্তিকতা কি কলেজপাঠ্য লজিকেই পাওয়া যায়? আমাদের বাস্তববোধ কি আমাদের যুক্তিসিদ্ধ পারস্পরিকতা শেখায় না?

ওসব শক্ত কথা আমি বুঝি না। শুধু বলতে চাই, নাস্তিকদের যেহেতু সব কিছু জানা নেই, তাই তাদের বলা উচিত, ঈশ্বর আছেন কি নেই, জন্মান্তর আছে কি নেই তা আমি জানি না। আর জানি না যা তা মানতে যাবো কেন?

তুমি তো ভালোবাসার কথা বলতে এসেছিলে! ঝগড়া করতে তো আসোনি নিশ্চয়ই!

বিরক্ত হলেন? এই জন্যই বলেছিলাম, আপনি রাগ করবেন।

আরে না। রাগ করবো কেন? একজন সপ্তদশী আমার কবিতা পড়ে আমার প্রেমে পড়েছিল এটা ভাবতেই তো এই বয়সেও রোমাঞ্চ হয়। তোমার নাম বুঝি নন্দিনী?

হ্যাঁ। একটু পুরোনো নাম, তাই না?

পুরোনো তো কী? নন্দিনী ভারী সুন্দর নাম।

থ্যাংক ইউ। আপনি রক্তকরবীর রেফারেন্স দিলেন না বলে। সবাই নন্দিনী শুনলেই রক্তকরবীর রেফারেন্স দেয়।

তুমি পছন্দ করো না বুঝি?

না। কারণ আমি তো রক্তকরবীর নন্দিনী নই। হ্যাঁ, যা বললাম তা মনে থাকবে?

কোন কথাটার কথা বলছো?

সামনের জন্মের কথাটা।

মনে নিশ্চয়ই থাকবে, তবে ফের জন্মানোটা বোধহয় সম্ভব নয়। আর থাকলেও, সেটা আমার হাতে নেই।

চেষ্টা করবেন তো!

পরজন্মের জন্য অপেক্ষা না করে এই জন্মেই আমাকে একটু ভালোবেসো, তাহলেই হবে।

সে তো বাসিই। আপনার কবিতা আমার শিয়রের কাছে থাকে। কিন্তু মুশকিল হল, আমার বাবার বয়স ছেচল্লিশ, আর আমার দাদুর চুয়াত্তর। আমার দাদু আপনার চেয়ে এক বছরের ছোটো। কী কাণ্ড বলুন!

রূপ রায় হেসে ফেললেন। তারপর বললেন, তুমি বেশ মজার মেয়ে। আমি যে বুড়ো হয়েছি তা কিন্তু আমি জানি। বুড়ো হওয়াটা তো ন্যাচারাল। কী করা যাবে বলো।

সে জন্যই তো পরজন্মের কথা বলছি।

পরজন্মে আমি তো কবি নাও হতে পারি। আর তুমিও হয়তো পরজন্মে কবিতা-বিমুখ হয়ে গেলে।

নন্দিনী হঠাৎ ভারী উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে, আচ্ছা, পরজন্মে আপনি মাঝি হবেন?

মাঝি? হঠাৎ মাঝি কেন?

মাঝি শব্দটাই ভীষণ অ্যাট্র্যাকটিভ। আর কাজটাও কীরকম রোম্যান্টিক বলুন। জলের ঢেউয়ে ছপ ছপ করে বইঠা ফেলে নৌকো বেয়ে যাওয়া। অন্ধকার রাত হলে তো আরও চমৎকার। নৌকোর গলুইতে একটা লণ্ঠন জ্বলবে আর সামনে দিশাহীন অন্ধকার। মাঝি জানবেও না যে কোন অকূল পাথারে ভেসে চলেছে তার নৌকোয়।

ওরে বাবা! সে যে খুব ভয়ের কথা! মাঝির খিদে পাবে, ঘুম পাবে, নিজের বাচ্চা ছেলেমেয়ের আর বউয়ের মুখ মনে পড়বে, ভাতের গন্ধের কথা মনে হবে। অকূল দরিয়ায় ভেসে যাওয়া কি ভালো?

কথাটা আপনার মুখে মানায় না, মাঝি কবিতাটা তো আপনিই লিখেছিলেন মশাই।

লিখেছিলাম নাকি? ওঃ হ্যাঁ, ঠিক বলেছো; ওরকম একটা ইমেজ ছিল বটে সেই কবিতাটায়! তখন অবশ্য আমার বোধহয় চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স।

তার মানে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আপনি বদলে গেছেন। এখন অনেক সাবধানী আর ভীতু হয়েছেন! তাই না?

এ আর নতুন কথা কী? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সব মানুষই তো পাল্টে যায়।

কিন্তু খ্যাতি, প্রতিপত্তি, মর্যাদা, পুরস্কারের সংখ্যা তো অনেক বেড়েছে, তাই না?

ওটাও বয়সের জন্য। পঁচিশ বছর বয়সে আমাকে কোনো পাঠক বা পাঠিকা প্রণাম করত না। এখন যেখানেই যাই বেশির ভাগ লোকই ঢিব ঢিপ করে প্রণাম করে। কেউ অটোগ্রাফ নিত না, এখন সই করতে করতে বিরক্তি এসে যায়।

আপনি কিন্তু আর আগের মতো রোমান্টিক নেই, অনেক হিসেবি হয়েছেন। বয়স হলেই কি সবাই তাই হয়?

সকলের কথা তো বলতে পারবো না। আমি শুধু আমার কথা বলতে পারি। আমার বয়স হয়েছে এবং আমি বদলে গেছি।

খুব মুশকিল ফেলে দিলেন আমাকে। আপনাকে নিয়ে আমার যে কত রোম্যান্টিক চিন্তা ছিল! মহুয়াকে নিয়ে আপনি আঠাশটা কবিতা লিখেছিলেন, তারপর সেই আশ্চর্য মেয়েটিকে বিয়ে করেন। বিয়ের পাঁচ বছরের মাথায় আপনাদের ডিভোর্স হয়ে যায়। কিন্তু সেই আঠাশটা আশ্চর্য প্রেমের কবিতা এখনও আবৃত্তিকাররা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। আপনার অদ্ভুত লাগে না?

লাগে, আবার লাগেও না। বয়োধর্মে লেখা ওই কবিতাগুলি কিন্তু তা বলে মিথ্যেও না। আপেক্ষিকভাবে সত্য।

আমার তো অত শক্ত কথা মাথায় ঢোকে না। আমার কিন্তু খারাপ লাগে, যখন মনে পড়ে যে, মহুয়ার সঙ্গে আপনি একটা জীবন কাটাতে পারলেন না। কেন পারলেন না?

মহুয়াও একজন কবি ছিল যে!

তাতে কী হল?

কী যে হল তা কি আর এতদিন পরে বলবার মানে হয়? মনে হয় কবিতার মহুয়া একরকম সত্য আর বাস্তবের মহুয়া আর একরকম সত্য।

তার মানে কি কবিতার সব কথা মিথ্যে? একজাজারেশন?

হ্যাঁ, ওই একজাজারেশন কথাটাই ঠিক। মিথ্যে নয়, তবে একটু বাড়িয়ে, একটু ঘুরিয়ে, একটু ঘষা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা। আবছা মহুয়া যত ভাল, স্পষ্ট মহুয়া ঠিক ততটা নয়।

তা বলে ত্যাগ? ডিভোর্স!

কী জানি কেন, তোমার কথা শুনে আজ আমার নিজেকে অপরাধী মনে হচ্ছে। তুমি একটু দুষ্টু মেয়ে আছো, নন্দিনী!

এটা কি আদর, না ভর্ৎসনা?

আদর কি না জানি না, তবে ভর্ৎসনা নয়।

ধন্যবাদ। এত পারসোনাল প্রশ্ন করার জন্য আমার বকুনিই পাওনা ছিল। আপনি আমাকে তবু বকেননি বলে ধন্যবাদ।

আরে ধন্যবাদের কী আছে? আমি খোলামেলা মানুষ। আমার ডিভোর্সের কথা সবাই জানে। একসময়ে ব্যাপারটা নিয়ে অনেক চর্চা এবং লেখালেখিও হয়েছে।

আপনার দ্বিতীয়া স্ত্রী অঞ্জনা বোধহয় কবি নন!

আরে না না। সে কলেজে বোটানি পড়ায়, আমার চেয়ে প্রায় বারো বছরের ছোটো। কিছুদিন আগে রিটায়ার করে এখন একটা এন জি ও খুলে চাষিদের কম জমিতে বেশি ফলন শেখাচ্ছে। তার কবিতার সঙ্গে তেমন সম্পর্ক নেই। তবে শি ইজ এ গুড হাউসকিপার, এ গুড মাদার অ্যান্ড এ ভেরি লাভিং পারসন।

আপনি কি এখন একজন সুখী মানুষ?

না, তবে এখন আমার অস্থিরতা কম, জ্বালা কম।

চিন্তাও কম?

একথা কেন বলছো?

বাই দি ওয়ে, আপনাকে একটা কথা জানাবার ছিল।

বলো।

মহুয়ার গর্ভে আপনার কোনো সন্তান ছিল কি?

না। মহুয়া সন্তান চাইত না।

ঠিক কথা। মহুয়ার কোনও খবর রাখেন?

না। সে শিলচর না কোথায় যেন চলে গিয়েছিল। বিয়ে করেছে জানি।

হ্যাঁ। আমি মহুয়ার নাতনি। তা বলে আপনি কিন্তু আমার দাদু নন। আপনি রূপ রায়। চিরকাল তাই থাকবেন। চলি, পরজন্মে হয়তো দেখা হবে।

—

[পৌষ ১৪২২]

বহরমপুরের বাড়ি

তুমি তো জানোই আমি সতী নই! আমার অনেক ছেলে বন্ধু আছে। আমি হুল্লোড়বাজ, মদ সিগারেট গাঁজাও খাই ইচ্ছে হলে। আমি তো ভাল মেয়ে নই শানুদা! বউগিরি কি আমার কাজ? তুমি একটা ভাল মেয়ে খুঁজে নাও।

আমি কি তোমার কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি মিলি?

তবে কী জন্যে এসেছো? এর আগে দু-বার তো বিয়ের কথাই বলতে এসেছিলে! শেষবার গত ডিসেম্বরে। ক্রিসমাস ছিল সেদিন।

হ্যাঁ। কিন্তু আজ বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসা নয়।

কিন্তু আমাকে উপদেশ দিতে আসোনি তো? উপদেশ আমার একদম সহ্য হয় না। উপদেশ শুনলে শরীর খারাপ লাগে।

তোমাকে উপদেশ দেওয়ার মতো আহাম্মক আমি নই। কারণ, ভাল-মন্দ সম্পর্কে তুমি তো কম জানো না। আজকাল ভাল বা খারাপ যে যাই করুক তা জেনে-বুঝেই করে।

তবে এই ছুটির সকালবেলায় সেই বহরমপুর থেকে এসে হাজির হয়েছ কেন তা দয়া করে বলবে?

তুমি ভীষণ ব্যস্ত মানুষ তা আমি জানি মিলি। তবু দু-একটা বৈষয়িক কথা একটু ধৈর্য ধরে শুনলে ভাল হয়। পনেরো মিনিট বড়জোর।

আহা, অত তাড়াহুড়ো করতে বলিনি তোমায়। এমন ভাব করছো যেন আমি তোমাকে ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিতে পারলে বাঁচি। তুমি বোসো তো, চা-টা খাও। ধীরে-সুস্থে শোনা যাবে। আমি এবেলা কোথাও বেরোবো না।

ঠিক আছে। বসতে বললে বলে ধন্যবাদ। কিন্তু আমার বক্তব্য খুব সংক্ষিপ্ত। এক বছর হল তোমার বাবা মারা গেছেন। তারপর থেকে তুমি আর বহরমপুরে যাওনি। তোমাদের বাড়িটা খালি পড়ে আছে বলে সেটার ওপর অনেকের নজর পড়েছে। বুঝতে পারছো, রিয়াল এস্টেটের গুরুত্ব এখন কতটা বেড়েছে।

শানুদা, বাড়িটা দেখাশোনা করার ভার বাবা তো তোমাকেই দিয়ে গেছেন।

সেটা তো অনন্তকালের জন্য নয়। আমাকেও তো রুজি-রোজগারের জন্য ব্যস্ত থাকতে হয়। বাড়ি আগলে বসে থাকলে তো আমার চলবে না।

তুমি কী করতে বলছো?

ভাল দাম পেলে বিক্রি করে দিতে পারো।

এমা! বিক্রি করবো কেন? ওই বাড়িতে আমার জন্ম, বড় হয়ে ওঠা। ওই বাড়িতে আমার কত গল্প আর স্বপ্ন লুকিয়ে রয়েছে! আমার তো ঠিক করাই আছে, বুড়ো হলে আমি ফের ওই বাড়িতে ফিরে যাবো।

সে তো ভাল কথা। কিন্তু ততদিন বাড়িটা রক্ষা করবে কে?

কেন, তুমি করবে! বরং একজন কেয়ারটেকার রেখে দাও। আমি প্রতিমাসে তার মাইনে পাঠিয়ে দেবো।

সেটা ভাল প্রস্তাব। কিন্তু বিশ্বাসী লোক না হলে মুশকিল। কেয়ারটেকার হয়তো মদের ঠেক বা জুয়ার আড্ডা বসাবে। রিস্ক আছে কিন্তু।

কেন, খুঁজলে ভাল লোক পাওয়া যাবে না? দেশে তো শুনি লাখো লাখো বেকার।

বেশির ভাগ বেকারই খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখে তো! তাই রিস্ক থাকে। তুমি তো জানোই বাড়িটা বিশাল বড়। একতলা-দোতলা মিলিয়ে বারোখানা শোওয়ার ঘর, হলঘর, গেস্টরুম, বৈঠকখানা, তার ওপর প্রায় দু-বিঘের বাগান। রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ নয়। আর তুমি একথাও ভুলে গেছো

যে, অলরেডি একজন কেয়ারটেকার গত দশ বছর ধরে আছে। তোমার বাবাই তাকে রেখেছিলেন। তবে সে এখন বুড়ো হয়েছে, সামলাতে পারছে না। অত বড় বাড়ি ঝাড়পোঁছ করে রাখা কি সোজা কাজ?

সত্যিই তো! আমি বিশুদার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম! কেন বলো তো! আমি অবশ্য বিশুদাকে খুব বেশি দেখিনি। বহরমপুর ছেড়েছিও বারো বছর হয়ে গেল! তখন আমার ষোলো বছর বয়স ছিল। কলকাতায় পড়তে চলে এসেছিলাম। হ্যাঁ, বিশুদার কথা কী বলছিলে?

যাক, বিশুকে তাহলে তোমার মনে পড়েছে?

হ্যাঁ পড়েছে। কেন যে ভুলে গিয়েছিলাম বুঝতে পারছি না।

বিশু অবশ্য মনে রাখার মতো গুরুতর মানুষ নয়। সামান্য মানুষদের কে আর মনে রাখে বলো। তবে বিশু অত বড় বাড়ি সামাল দিতে পারছে না। পাড়ার একটা ক্লাব তোমাদের আউট হাউসটা দখল করতে চাইছে। প্রোমোটাররা প্রায় রোজই এসে হানা দিচ্ছে। সকলেরই প্রশ্ন এত বড় বাড়ি আর এতটা জায়গা বেকার পড়ে থাকবে কেন?

বাঃ রে, আমার বাড়ি আমি ফেলে রাখলে কার কী? এটা কি মগের মুলুক?

হ্যাঁ মিলি, তুমি হয়তো জানো না যে, এটা মগেরই মুলুক। সংবিধান দেখিয়ে এখানে কোনো কাজ হয় না। এখানে কাজ হয় অর্থবল আর বাহুবলে।

আচ্ছা, তুমিও তো শুনি ওখানকার একজন প্রভাবশালী মানুষ, তাই না? তোমারও তো ফুটবল ক্লাব আছে, জিমন্যাসিয়াম আছে।

তাতে কী হল?

ধরো, বাড়িটা যদি তোমার হত তাহলে তো তুমি নিশ্চয়ই বাড়ি প্রোমোটার বা ক্লাবের হাতে ছেড়ে দিতে না।

বাড়িটা আমার হলে আমি সেখানে বসবাস করতাম। সেক্ষেত্রে কোনো ঝামেলা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তোমাদের বাড়িটা এমনি পড়ে আছে, অব্যবহৃত। বাড়িতে লোকজন না থাকলেই মুশকিল।

তুমি কি বলতে চাও, বাড়িটা বাঁচানোর জন্য আমি এখন কলকাতা ছেড়ে বহরমপুরে গিয়ে থাকি? কলকাতায় তো আমি এমনি বসে নেই। ভাল একটা চাকরি করি, গান গাই, একটা এন জি ও-র সঙ্গেও আছি।

সেটা আমি জানি মিলি, কলকাতায় তোমার অনেক কাজ। আর এটাও জানি যে, কোনোদিনই তুমি আর বহরমপুরে ফিরে যেতে পারবে না। বুড়ো বয়সেও নয়। তোমার জনশূন্য বাড়িকে এতদিন কে আগলে রাখবে বলো? বিশেষ করে এখন যখন অনেক লোভী লোকের নজর পড়েছে?

আচ্ছা, ধরো যদি একটা-দুটো ঘর নিজের জন্য রেখে বাকিটা যদি অনাথ আশ্রম বা বৃদ্ধাবাস করে দিই?

সেটা তোমার ইচ্ছে। তবে বৃদ্ধাবাস বা অনাথ আশ্রম চালাতে গেলে একটা সিস্টেমেরও দরকার হয়। রিমোট কন্ট্রোলে তো চলবে না। এবং তার পরেও কথা আছে। বাড়িটা হয়তো বাঁচল, কিন্তু অতটা জমিও ফাঁকা পড়ে আছে! কোনো এক প্রাইভেট পার্টি কিছুদিন আগে জমিটা মাপজোক করেছে বলেও খবর পেয়েছি।

উঃ, তুমি আজ আমার সুন্দর দিনটাই নষ্ট করে দিলে! নতুন একটা টেনশন ঢুকিয়ে দিয়ে গেলে তো মাথায়! আমার পক্ষে যে আর বহরমপুরে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয় তা আমিও জানি। আমার বাড়িটা বেচে দিতেও মন চাইছে না। কী করবো বলো তো!

সেটা জানবার জন্যই সাতসকালে ছুটে এসেছি। আরও একটা কথা। তোমাদের বাড়িতে অনেক দামি জিনিসপত্র আছে। দামি আসবাব, বাসনপত্র, এসি, ফ্রিজ, টিভি, মিউজিক সিস্টেম। চোর-ডাকাত কেন হানা দেয়নি সেটাই ভাববার কথা। দিলে ঠেকাবারও কেউ নেই কিন্তু।

চোর-ডাকাত কেন আসে না তা আন্দাজ করতে পারছি। তোমার জন্য। তোমাকে সবাই ভয় পায়।

ব্যাপারটা কিন্তু হালকা করে দিও না। আমি কোনো গুন্ডা-মস্তান নই যে, আমাকে চোর-ডাকাতরা ভয় পাবে।

আমি তো তোমাকে গুন্ডা-মস্তান বলিনি। তবে জানি, ওই শহরের সবাই তোমাকে সমঝে চলে। সেটা কেন, তা জানি না।

আমার তোমাকে যা বলার ছিল বলেছি। তোমার বিষয়-সম্পত্তির দায়িত্ব এখন থেকে তুমিই নাও। বিশু থাকতে চাইছে না, বয়স হয়েছে, আমারও অনেক কাজ আছে।

তুমি কি আমার ওপর প্রতিশোধ নিচ্ছো?

প্রতিশোধ! প্রতিশোধের কথা উঠছে কেন? কিসের প্রতিশোধ?

তোমার বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছি বলে!

না মিলি, আমি ওসব মনে রাখিনি। একসময়ে তোমার প্রেমে পড়েছিলাম ঠিকই। কিন্তু তুমি বদলে গেছো। তোমার সঙ্গে আমার বনিবনা হবে না কখনও।

আচ্ছা, একটা কাজ করলে কেমন হয়?

কী কাজ?

বাড়িটা তুমিই কিনে নাও না কেন? আমার জন্য দুটো ঘর রেখো, তাহলেই হবে।

আমি কিনবো! কেন বলো তো? আমারও তো একটা বাড়ি আছে।

লোকের বুঝি একটার বেশি বাড়ি থাকতে নেই?

লোকের হয়তো অনেকের অনেক কিছু আছে। কিন্তু আমার পৈতৃক বাড়িটা আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমার বেশি কিছুর দরকার হয় না। আর আমার সাধ্যও নেই তোমার বাড়ি কেনার।

তোমার কাছে কি বাড়ির দাম চেয়েছি?

তুমি তো স্পষ্টই বললে যে, বাড়িটা যেন আমি কিনে নিই।

বলেছি তো। কিন্তু টাকা দিয়ে কেনার কথা বলিনি।

তাহলে কোন নতুন পদ্ধতিতে তা কিনতে হবে?

বিনা পয়সায় কাউকে কিছু বিক্রি করা যায় না?

না। বিনা পয়সায় হস্তান্তর করলে সেটা দান হয়ে যায়।

ও, তুমি তো বোধহয় আমার দানও নেবে না!

প্রশ্নই ওঠে না। দান করতে চাইলে দানের অনেক পাত্র পাবে। ওই বাড়ির জন্য অনেকেই ওত পেতে আছে।

কিন্তু তাদের মধ্যে তুমি তো নেই!

না মিলি। তুমি হয়তো ব্যাপারটা নিয়ে ইয়ার্কি মারছো, হয়তো বহরমপুরের বাড়িটার প্রয়োজনও তোমার ফুরিয়েছে, এবং হয়তো তোমার টাকার লোভও নেই। যদি তাই হয় তবে তুমি ইচ্ছে করলে তোমার সম্পত্তি বিলিয়েও দিতে পারো।

আর তুমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে, তাই না?

হ্যাঁ। মেসোমশাই দায়িত্বটা দেওয়ার সময় দুঃখ করে বলেছিলেন, মিলির বহরমপুরের পাট তো বোধহয় চুকেই গেল রে। শুধু ফোন করে খবর নেয়, কখনও আসে না। আমি চলে গেলে এ বাড়িটার কী হবে কে জানে! তুই একটু দেখিস যেন দেখভালের অভাবে বাড়িটা হাতছাড়া না হয়ে যায়।

ও কথা থাক। তুমি কটার ট্রেন ধরেছো আজ?

হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

বলোই না।

ভোর রাতের ট্রেন।

তার মানে এখনও সকালের জলখাবারটাও খাওনি।

আমার জলখাবার নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। আমি মাত্র পনেরো মিনিট সময় চেয়েছিলাম। চোদ্দো মিনিট পার হয়ে গেছে। এবার আমি যাবো মিলি। তোমার ডিসিশনটা ফোনে বা ই-মেল করে জানিয়ে দিও।

অত রাগ করছো কেন শানুদা? আসলে তুমি অপমানটা ভোলোনি বলে ঘুরিয়ে প্রতিশোধ নিচ্ছো।

বললাম তো, প্রতিশোধের কিছু নেই।

তোমার মুখ, তোমার চোখ, তোমার সমস্ত শরীরে একটা আক্রোশ ফুটে বেরোচ্ছে।

না মিলি, তোমার ওপর আমার কোনো আক্রোশ নেই।

আছে। আর আক্রোশ থাকার যথেষ্ট কারণও আছে। বিয়ের আগে পুরুষেরা পজেটিভ হয়, আর বিয়ের পর মেয়েরা।

মিলি, আজ কলকাতায় আমার অনেকগুলো অ্যাসাইনমেন্ট আছে। আমাকে বেরোতে হবে।

এক কাপ চা খাওয়ার সময় তোমার হাতে নেই, এটা আমি বিশ্বাস করি না। তাহলে ধরে নিতেই হবে তুমি আমার ওপর রেগে আছো।

চা খাওয়ানোর এত তাড়া কিসের? কলকাতায় এক কাপ চা তো রাস্তায়-ঘাটেও জুটে যায়। তোমার এই আপ্যায়নের জবরদস্তিটার কি কোনো মানে হয়? এখন প্রায় সাড়ে দশটা বাজে, আমাকে এগারোটার মধ্যে এক জায়গায় পৌঁছোতে হবে।

তুমি বড্ড কাজের লোক তাই না? আর এর জন্যই তোমাকে আমার কোনোদিন পছন্দ হয়নি। কাজের লোকদের রোমান্টিক দিকগুলো সুইচ অফ থাকে। আমার খুব ইচ্ছে করছে, তোমার মুখোমুখি বসে এক কাপ চা খাই। বসবে একটু?

ঠিক আছে। এক কাপ চা-ই যদি কোনো ব্যাপার হয়ে থাকে তবে তাই সই।

আমি জানি তুমি খারাপ চা খেতে পারো না।

হ্যাঁ। চা সম্পর্কে আমি একটু চুজি। কিন্তু সেটা তো তোমার জানার কথা নয়।

তবু তো জানি। এবার বোসো তো। না না, সোফায় বসতে হবে না। তোমার কোমরে সেই ফুটবল মাঠের চোটটার পর নরম গদিতে বসতে তোমার কষ্ট হয়। এই যে, এই কাঠের চেয়ারটায় বোসো। অমন অবাক হয়ে হাঁ করে থাকার কিছু নেই। তোমাকে পছন্দ করি না বলেই কি খোঁজখবরও রাখবো না?

তাই দেখছি।

রাগ কোরো না, একটা কথা বলবো?

বলে ফেল।

শুভময়ীকে কি তুমি সত্যিই পছন্দ করলে না? নাকি জেদ করে রিজেক্ট করলে?

তার মানে কী মিলি? এসব খবর তোমাকে কে দিল?

আমার পোষা ভূতেরা। তুমি কি জানো যে, শুভময়ীর মতো সুন্দরীর সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে শুনে আমি একজন ঘোর নাস্তিক হয়েও কালীঘাটে মানত করেছিলাম যেন তুমি শুভময়ীকে অপছন্দ করো।

কেন করেছিলে? এসব আচরণের একটা মানে থাকবে তো!

কী জানি। মানে হয়তো একটা আছে। সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছি। ওরকম গুম মেরে গেলে কেন হঠাৎ?

তুমি আমাকে বাড়িটা বিনি পয়সায় বিক্রি করতে চেয়েছিলে কেন মিলি?

সেটা বুঝতে বোকাদের একটু বেশি সময় তো লাগবেই।

—

[বৈশাখ ১৪২৩]